শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী

Appearance
02.09.1838

Disappearance
23.06.1914

SACCHIDANANDA SRILA
BHAKTI VINODE THAKUR
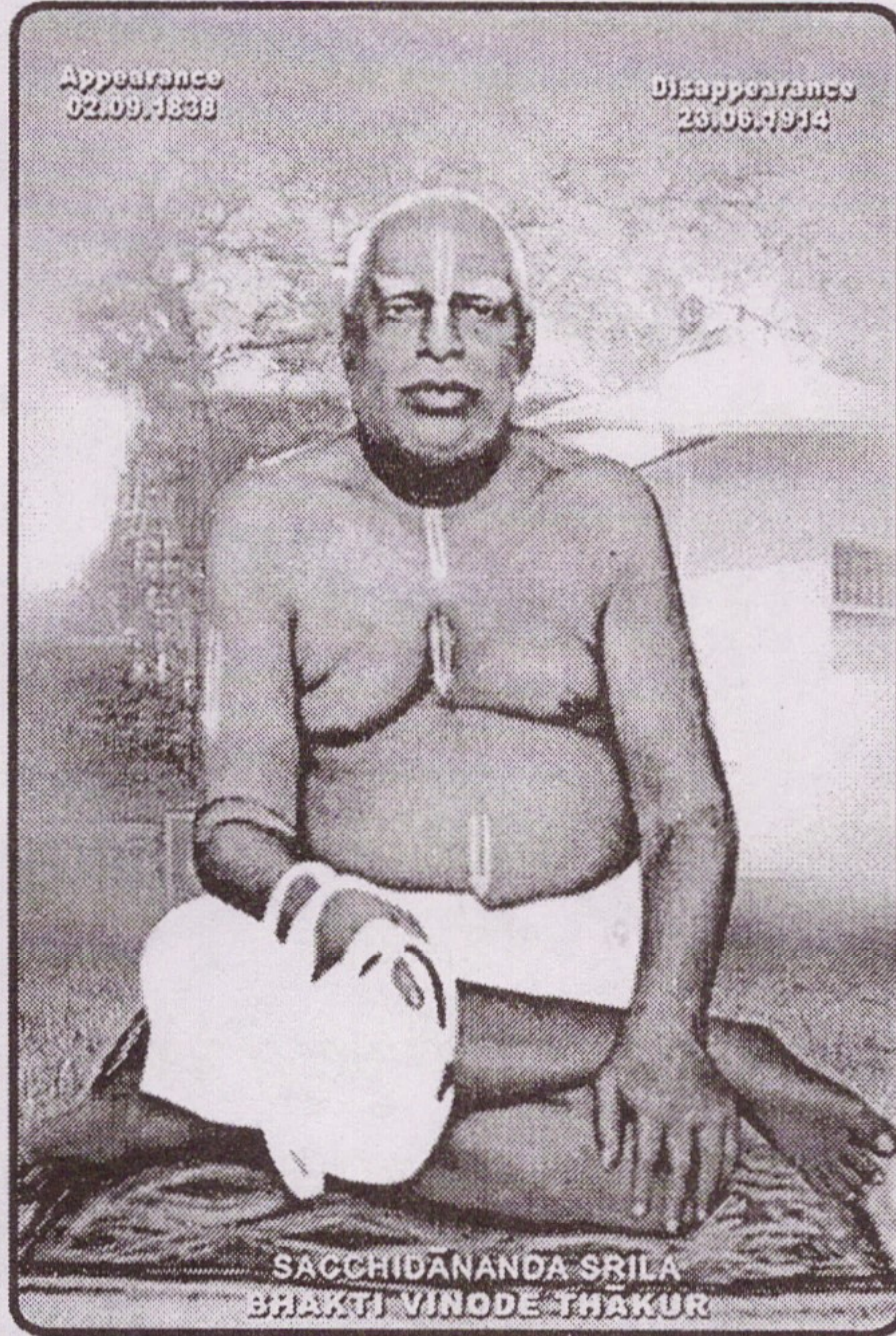
শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের বর্তমান আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ

সম্পাদিত

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

প্রকাশক ঃ—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

দ্বিতীয়-সংস্করণ
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ১৭৮তম আবির্ভাব তিথিপূজা
২৮ হৃষীকেশ ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ
৮ আশ্বিন ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান
গ্রন্থবিভাগ
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ-শ্রীমায়াপুর, জেলা-নদীয়া, পঃ বঃ।
পিন-৭৪১৩১৩ ☎(০৩৪৭২) ২৪৫২১৬
শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কোলকাতা-২৬
☎(০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষা ঃ —১০০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সম্বন্ধ তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিধেয় তত্ত্ব

তৃতীয় অধ্যায়

প্রয়োজন তত্ত্ব

মুখবন্ধ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বহু গ্রন্থ মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন 'গৌড়ীয়ে' শ্রীল ঠাকুরের বেশ কিছু মুদ্রিত প্রবন্ধাবলী এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ বহু প্রযত্নে ঐ সমস্ত প্রবন্ধাবলী তর্জমা করে মঠের কম্পিউটারে কম্পোজ করে। উহা **'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়'** ও **'প্রয়োজন'** —এই তিনটি ভাগে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল।

শ্রীঅনাথবন্ধু দাসাধিকারী বিশেষ ধৈর্য্যের সহিত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। আমাদের মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে এই গ্রন্থটির প্রকাশনে সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য করেছে।

অতি অবশ্যই সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থটি পাঠ করে পারমার্থিক জীবনে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা-২৬
শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, ১৩ নভেম্বর, ২০০৪ খৃষ্টাব্দ

—ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি

প্রথম অধ্যায়

সম্বন্ধ তত্ত্ব

শৈশব হইতেই হরিভজন কর্তব্য

ভ্রমজনিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্তসকল যে কৃষ্ণভক্তিতে পর্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতেছি।

জগতে তিনটী পদার্থ লক্ষিত হয়। পদার্থ তিনটীর নাম—ঈশ্বর, চেতন ও জড়। যে সকল বস্তুর ইচ্ছা-শক্তি নাই, তাহারা জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, বন, শস্য, বস্ত্র, শরীর প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে আমরা জড় বলি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—ইহারা চেতন। ইহাদের বিচার-শক্তি ও ইচ্ছা শক্তি আছে। মনুষ্যের যেরূপ বিচার-শক্তি আছে, সেরূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই। তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার জড় শরীর না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ-চেতন-পদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পাতা ও নিয়ন্তা। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্বনাশ হয়। তিনি ভগবৎস্বরূপে নিয়ত বৈকুণ্ঠ-ধামে রাজত্ব করিতেছেন। তিনি সমস্ত রাজার রাজা। তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত জগতের কার্য চলিতেছে।

জড় পদার্থের যেরূপ একটি স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই জন্যই বেদে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। সকল পদার্থেরই এক একটি স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরেরও একটি স্বরূপ আছে। জড়বস্তু মাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চেতন-পদার্থের স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতন পদার্থ

বটে, কিন্তু আমরা জড়শরীরবিশিষ্ট। অতএব আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনময়। অতএব তাঁহার চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। সেই চেতনময় স্বরূপটী তাঁহার আকার। সেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চেতনময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তিচক্ষে দেখিতে পাই---জড়চক্ষে দেখিতে পাই না।

কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্যের আলোক উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর-বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে। স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে?

বৈকুণ্ঠ-ধাম বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নহে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশ্মীর, কলিকাতা, লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি স্থানসকল জড়ময়। তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলপথে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে। জড়শরীরের পদচালন করিয়া যাইতে হয়; কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপ স্থানীয় প্রদেশ নহে। সমস্ত জড়জগতের অতীত একটী অবস্থানবিশেষ। তাহা চিন্ময় নিত্য ও নির্দোষ। তাহা চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্যধামে পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে আমরাও তথায় যাইয়া নিত্যকাল পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারিব। এখানে আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা নিত্য নয়, অল্পক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে সমস্তই দুঃখময়। জন্মপ্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহারাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহারাদির অভাব ক্লেশজনক। পীড়া সর্বদাই আছে। শীত, উষ্ণ ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। ঐ সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে হয়। গৃহ-নির্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদির উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভাল

বোধ হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি কার্যে অনেক যন্ত্রণা লাভ হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ, সংসারে 'অমিশ্র সুখ' বলিয়া পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাবসকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। এরূপ সংসারে বর্তমান থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। পরমেশ্বরের বৈকুণ্ঠধাম পাইলে আর অনিত্য সুখ-দুঃখ কিছুই থাকিবে না। অজস্র নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করাই আমাদের কর্তব্য।

যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আপাততঃ আমরা সংসারে সুখ-ভোগ করি, পরে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টি-সাধন করিব, এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবে না। সময় অতি দুর্লভ। যেদিন হইতে কর্তব্য জ্ঞান হয়, সেই দিন হইতে তাহা সাধন করিতে যত্ন পাওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ মানবজীবন অত্যন্ত দূর্লভ ও অস্থির। কোন দিন মৃত্যু হইবে তাহা বলা যায় না। বাল্যকালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ভাগবতে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানবমাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে। (অতএব শৈশব হইতেই হরিভজন কর্তব্য—"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ"—শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৬।১)

মানব সমাজ

যাহাকে পবিত্র জৈব-ধর্ম্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীবের নিত্য-ধর্ম্মের নামই 'জৈবধর্ম্ম'। জীব যখন উপাধি শূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময় তখন তাহার নিত্যধর্ম্ম কি? —নিরুপাধিক প্রেম। যখন (জীব) জড়গ্রন্থি-রূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্মবিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধজীবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধজীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যতপ্রকার বিধি আছে, সকলই জড়-বিনিময়। জড় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলে ও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড় শরীরে অবস্থিত হইয়াই জীবকে জড়-ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল নয় বলিয়া জড়দেহ নাশ করিলে কোন লাভ-হইবে না; বরং আত্মঘাতী-পাপে অধিকতর বন্ধন লাভের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরপ লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহ রক্ষার কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কেবল দেহরক্ষা নয়-দেহের পুষ্টি, বর্দ্ধন ও নানাবিধ দৈহিক অভাব নিবৃত্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক।

উত্তমরূপে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থ উপার্জ্জনের একটি উপায় অবলম্বন করাও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা যাহাতে নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য একটি আশ্রম ও সংসার করা কর্তব্য। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন, বা অবিবাহিত অবস্থায় বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস গ্রহণই করুন, একটি আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রমের উপযোগী একটি সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত—সকলেরই এক একটি সমাজ আছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না। এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমজনক। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। জীবের স্বভাবই সামাজিক; জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধভক্ত সমাজ অনিবার্য্য। অতএব বনেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, জীব সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব জীব ও ইতর জীবের

ভেদ এই যে, বৈষ্ণব জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর জীবের ইতর-সমাজ। এইস্থলে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইবে যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবসমাজে কোন ভেদ নাই।

বৈষ্ণবসমাজ ও ইতর সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরমোদ্দেশ্য ভগবৎ-প্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নীতি ও জড়ীয় বিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়-জড়ীয়-ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব নাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়দুঃখ নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎ প্রীতি-অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন। যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম--ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না, বরং তৎ সাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই জীবের বদ্ধদশার একমাত্র সমাজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি প্রকার, তাহা শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এস্থলে পুনরালোচিত হইল না; কেবল এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে, মনুষ্য নিজের স্বভাববশতঃ একটি বর্ণ এবং অবস্থাবশতঃ একটি আশ্রম স্বীকার করিয়া জীবননির্ব্বাহপূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা কর্ম্ম ও ঘটনার দ্বারা স্বভাব নির্ম্মিত হয়; তন্মধ্যে জন্ম ও একটি ঘটনাবিশেষ।

ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সেই ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে এই প্রকার ব্যক্তিগণের দৃষ্টি করিয়া অনেক সহৃদয় লোক ভারতের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাস হইয়া পড়িয়াছেন, এই জন্যই কৃতবিদ্য ভারতবাসীগণ বর্ণধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন-কল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, বর্ণধর্ম্মের বিনাশ-দ্বারা জগতের উন্নতি

হইতে পারে না। বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব 'পুনর্মুষিক ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যে কল্মষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়।

১। কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

২। বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞানসংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

৩। বর্ণ নির্ণয়কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে।

৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুল-পুরোহিত, ভূস্বামী, পিতামাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

৫। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ-পিতৃবর্ণ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

৬। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ হইবে।

৮। প্রতিগ্রামে একটি সমাজসংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বাস্তবিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক।

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদতিক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক যে, এই প্রকার সমাজ সংস্কার আজকাল হইতে পারে কিনা; আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য্য হইবার সুবিধা নাই। আদৌ রাজসাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজসাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়, যেহেতু রাজা যে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সরল সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ সংস্কার কোনক্রমেই ঘটিতে পারে না। ভারত-বাসীদিগেরও এ বিষয়ে সম্যক্ সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতাক্রমে অনেকেই এই প্রার্থনীয় পরিবর্ত্তনে মত দিবেন না। বরং সংস্কার সময়ে অনেকপ্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্নবর্ণের লোকেরা মূর্খতা ও অজ্ঞানবশতঃ বর্ত্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বৃহৎ কার্য্য সহসা ঘটনীয় নহে। যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

এখন, দেখুন দুই দিকেই বিপদ্। একদিকে কুসংস্কারটী আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্যবংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্যসন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এসকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন। অন্য দিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ্ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না। যেহেতু বৈজ্ঞানিকসমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণস্থলে দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধসমাজ, জৈনসমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারত-ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধসমাজ ও জৈন্য-সমাজ পর্ব্বতগুহামধ্যে লুক্কায়িত হইল। দেশীয় খৃষ্টানসমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল। ব্রাহ্মসমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে আবার কাহারাও সামাজিক কুটীরস্থ হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা

কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞান-পীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না। যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সংকার আরম্ভ করি, তবে আরও হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিদানস্বরূপ ভগবান্ই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

পুরাণ অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি, এই কলি-যুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাত্মাগণ 'ধন্যকলি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগেই কেবল কলিকালের অবসানে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। ধন্য কলিযুগে পরিপূর্ণ শক্তিমান্ পরম কারুণিক, পরমপ্রেম মূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন; সে কলিযুগের আর কথা কি? সেই করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমভাবে সেই মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, পরমার্থের জন্য ভগবান্কে ভজন করিবে। কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃত ফলের জন্য অন্যান্য দেবতার উপাসনা-পদ্ধতি। যাঁহারা এইরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারা সনিষ্ঠ বর্ণাশ্রমী এবং বহু দেবতা ও কর্ম্মাশ্রয়ী। যদি সংসারে বর্ত্তমান হইয়া অন্য দেবতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল একমাত্র অচ্যুতাশ্রিত হইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরিনিষ্ঠিত নাম লাভ করা যায়। তাঁহাদের লক্ষণ শ্রীভাগবতে ঐ স্থলেই কৃত হইয়াছে; যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।

(ভাঃ ২।৩।১০)

সংসারী লোকমাত্রেই সর্ব্বকাম। সর্ব্বকাম সত্ত্বেও যদি সেই সেই কামের জন্য কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত বহুদেবতা ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র পরম পুরুষকেই যজন করা যায়, তবে সনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ শ্রেণীর পক্ষে একটি কঠিন ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। 'তীব্রেণ ভক্তিযোগেন' এই শব্দদ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, তীব্র ভক্তিযোগাভাবে অচ্যুত-গোত্রত্ব সম্ভব হয় না। অনাদি-বেদসম্মত যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা, তাহাতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বর্ত্তমান হইলে মানব-সমাজ নির্দ্দোষ। কিন্তু অচ্যুতগোত্র লাভ করতঃ তীব্র ভক্তির অভাব হইলে উভয়-পদচ্যুত হয়। তীব্র ভক্তিই একমাত্র অচ্যুত-কুলের জীবন। আমাদের বক্তব্য এই যে, 'গৃহস্থ বৈষ্ণব' বলিলে বর্ণাশ্রমী ও সংযোগী উভয় বৈষ্ণবই গৃহীত হইবেন; কিন্তু সংযোগীর পক্ষে কঠিন এই যে, যে সংযোগীর তীব্রভক্তি দেখা যায় না, তিনি উভয়কুলচ্যুত। কৃষ্ণভক্তির জন্য বর্ণাশ্রম-পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ নাই। কিন্তু বর্ণাশ্রমত্যাগীর যদি কৃষ্ণভক্তি দূর হয়, তবে তাহাকে কি বলা যাইবে? সে অবশ্য বর্ণাশ্রম-ত্যাগের জন্য দোষ এবং অপকৃষ্টফলভোগী হইবে। তাহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া আদর করা যাইবে না।

সমাজসম্বন্ধে বৈষ্ণব তিন প্রকার (১) সনিষ্ঠ অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অথচ কৃষ্ণভক্ত, (২) পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডত্যাগী অচ্যুতাশ্রিত ব্যক্তিবিশেষ। উভয়েই গৃহস্থ। (৩) নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বরূপতঃ স্বধর্ম্মত্যাগী। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অগৃহস্থ। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ-লক্ষণ-বিশিষ্ঠ বৈষ্ণব। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তিন জনেরই জীবন। উত্তরোত্তর কৃষ্ণভক্তির উন্নতিই প্রয়োজন। যে স্থলে পরিনিষ্ঠিত বা নিরপেক্ষের কৃষ্ণভক্তি লঘু হয়, সেস্থলে তদনুসারে তাঁহাদের পতন স্বীকার করা যায়।

বর্ণাশ্রম-স্বীকার, বর্ণাশ্রম-ত্যাগ বা ভেকাদি-গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়, একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে পরিমাণ কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা চাই।

ইহাতে আর একটি নিগূঢ় কথা এই যে, সনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত উভয়েই গৃহস্থ, অতএব কৌপীন-গ্রহণে অনধিকারী। অধিকার না থাকিলে যাহা করা যায়, তাহা দোষ বই গুণ নয়। সনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কৃষ্ণমন্ত্র-গ্রহণ পর্য্যন্তই বৈষ্ণবতার পরিচয়। পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির পঞ্চসংস্কার-স্থলে বর্ণাশ্রমান্তর্গত নামান্তর হইতে পারে না। নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে কৌপীন-গ্রহণই বৈষ্ণবতার

বাহ্য পরিচয়। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ। পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কৌপীনগ্রহণে অপরাধ হয়। কৌপীন-গ্রহীতা আর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারিবে না। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব সংযোগী বৈষ্ণবদিগের যে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। একথা অদ্য আমরা সংক্ষেপে বলিলাম।

পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের পরিবার-পোষণের জন্য অর্থ-সঞ্চয় আবশ্যক। সেই অর্থসঞ্চয় সম্বন্ধেও অনেকগুলি বিচার আছে। এই স্থলে সপ্তমস্কন্ধোক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ স্বীকার না করিলে তাহাদের ভিক্ষাদ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করার যত্ন সুতরাং সংঘটনীয়। তদ্দ্বারা তাঁহারা পতিত হইবেন, যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যতীত কাহারও ভিক্ষাধিকার নাই। অতএব পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের স্বভাবানুসারে একটি একটি বর্ণ নিরূপণপূর্ব্বক তদ্বৃত্তি-দ্বারা জীবনযাত্রার নির্ব্বাহ করিবেন।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।

(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

—মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে যে লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেখানে দেখা যাইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিদ্দিষ্ট হইবে না।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

চিৎ ও জড়ে সমন্বয় অসম্ভব

কোন খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিত একখানি ইংরাজী পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সহিত ধর্ম্মভাবের সামঞ্জস্য যে প্রকার উচ্চজীবন-প্রার্থীদিগের নিকট গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে এমন আর কিছুই নহে। সদসৎ নির্দ্ধারিণী বুদ্ধি কি প্রকারে মানবের জড়মূলক সিদ্ধান্তের সহিত একত্রাবস্থান করিতে পারে এবং কিরূপেই বা মনুষ্যের উচ্চ অর্থাৎ অপ্রাকৃত জীব জড়বিজ্ঞান-নির্দ্ধারিত মানবের জড়মূলত্বসাধক সিদ্ধান্তের সহিত যুগপৎ স্বীকৃত হইতে পারে এই দুইটি প্রমেয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের হৃদয়কে অবশ্য উদ্বিগ্ন করিতে থাকিবে। পারমার্থিক-বুদ্ধি এবং জড়বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি এতদুভয়ের মধ্যে একটী বিবদমান ভাব আছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জীবননির্ণয়স্থলে এই বিবদমান ভাবটী নিত্যবর্ত্তমান, প্রেমচেষ্টাস্থলে জ্ঞানচেষ্টাকে স্থাপন করিবার বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়।

জীব জড়বস্তু হইতে পৃথক্ ও ইচ্ছাশক্তি চালনে সমর্থ

নরজীবনের জড়মূলত্ব সাধকভাবে সদসৎ বিচার এবং ধর্ম্মভাবের সহিত তাহার কতদূর সম্বন্ধ ইহা স্থির করিতে গেলে যে কোন-প্রকার লাভ হইবে না, তাহা নয়। বরং সমস্ত মানবের পক্ষে এই অনুসন্ধানটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে একাল পর্য্যন্ত যত প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা হইয়াছে সে সমুদয়ই একটী বিশ্বাসের উপর অবস্থিত। বিশ্বাসটী এই যে, মানব একটি আধ্যাত্মিক পদার্থ এবং তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে মানসিক ও শারীরিক শক্তি চালন করিতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান এই বিশ্বাসকে দূর করিয়া তাহার স্থলে সেই বিশ্বাস হইতে বিলক্ষণ আর একটি বিশ্বাসকে আনিয়া স্থাপন করিতে চান।

জড় হইতে চেতনের সৃষ্টি অত্যন্ত অসম্ভব

তাঁহার প্রস্তাবিত ভাব এই যে, মন এবং শরীরের শক্তিসমূহ হইতে একটী জড়যন্ত্রের ন্যায় মানব সৃষ্ট হইয়াছে। এই দুইটী ভাবের অত্যন্ত পার্থক্য লক্ষিত হইবে। শেষোক্ত ভাবটী স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম্ম ও সৎকারের প্রাচীন মন্দির

কেবল ভগ্ন করিয়া ফেলা হয় এমত নয়, কিন্তু তাহাদের প্রতীতি অমূলক ছবির ন্যায় এককালে তিরোহিত করিয়া দেওয়া হয়। সদসৎ চিন্তা, বিচার, দয়া, আশা এবং ক্ষমা যাহা সম্প্রতি আমাদের সত্ত্বায় গভীর সত্যরূপে প্রতীত আছে সে সমস্ত এককালে খপুষ্পের ন্যায় অমূলক প্রতিচ্ছায়াভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। সল্লোক ও অসল্লোকের মধ্যে পার্থক্যবুদ্ধি একেবারে উঠিয়া যায়। নরভোজী রাক্ষস এবং পরোপকারী যীশুখ্রীষ্ট উভয়ই জড়ীয় পূর্ব্বভাবের জড়সন্ততিরূপে প্রতীয়মান হয়। তাহারা মাধ্যাকর্ষণবলনিক্ষিপ্ত পর্ব্বত হইতে নিপতিত প্রস্তর ফলকের ন্যায় জড়দ্রব্যবিশেষ হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রশংসা ও নিন্দা এবং তাহাদের প্রতি রাগ-দ্বেষ কিছুই আবশ্যক হয় না। ডারউইন, টিণ্ডল, হাক্‌সলি প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পুরুষগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে তাহাদের মত এইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্তকে ভয় করে না।

তর্কস্থলে বিজ্ঞান ও আত্মার অবিরোধ হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বী

নরজীবনের অন্তরঙ্গ রহস্য নির্ণয়স্থলে প্রাগুক্ত জড়মূলক মতকে সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিলে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। মনুষ্য যে কেবল জড়জাত যন্ত্রবিশেষ ইহাই মাত্র মানিয়া লইতে হয়, ইহা না মানিলে আর জড়বাদীদিগের অগ্রগামী হইবার পথ দেখা যায় না। এস্থলে সরল জিজ্ঞাসুদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা জড়বাদীদিগকে তাহাদের নিজ সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করিতে বাধ্য করান এবং তাহাদের নিকট হইতে স্পষ্টবাক্যে আমরা সত্য বলিলাম কিনা ইহার উত্তর গ্রহণ করুন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডেভিস নিজ প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন; —

মনে করা যাউক যে বিজ্ঞান এবং আত্মার তত্ত্বের বিরোধ না থাকিলেও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে।

জড়বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আত্মতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয়

এখন দেখা উচিত, ইহাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধার উপর কাহার বিশেষ অধিকার। উভয়কে সমান সম্মান দিতে পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতাম; কিন্তু তাহা আমরা করিতে পারি না। যখন জড়বাদিগণ বিজ্ঞানকে অধিক সম্মান দেওয়া উচিত এরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তখন আমাদের এরূপ প্রশ্ন করা অনধিকার চর্চ্চা নয়। তাঁহাদের বিজ্ঞান তাঁহাদের অপ্রাকৃত জীবন সম্বন্ধীয়

কোন ভাবেরই আভাস দেয় না। কেবল ক্রমোৎপত্তি, শক্তির রূপান্তরতা, স্বভাবের গতি ও সিদ্ধক্রম এই সকল শব্দ ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল ভাবের প্রতি আদর তাঁহারা নিজেই করিয়া থাকেন। এই সকলকে তাঁহারা সুন্দরতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অথচ তাঁহারা নিজেই কিছু বুঝিতে পারেন না। এই সকল তত্ত্বের অনুশীলন প্রয়াসে তাঁহারা অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী আমরা এইরূপ বিশেষ ব্যক্তি-সিদ্ধান্তের বাক্যকে অনাদর করি না, কিন্তু জড়বাদীদিগের বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখীন হইলে তাহার প্রতি কোন প্রকার বিশেষ আদর প্রকাশ করিতে পারি না। আমরা স্পষ্টই বলিয়া থাকি যে বিজ্ঞান-বৈশারদী বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভক্তি অধিক।

আত্মতত্ত্ব পারমার্থিক উর্দ্ধগতিসম্পন্ন

আমাদের বিবেচনায় আসল প্রশ্ন এই যে, বৈকুণ্ঠ হইতে প্রেরিত আলোক তাঁহারা অবলম্বন করিবেন কি না? এখনকার কথা এই যে তুমি বিজ্ঞানের অনুগত হইবে, না আত্মজ্ঞানের অনুগত হইবে। বিজ্ঞান বিগত-ব্যাপার এবং নিম্নগত ব্যাপারসকল লক্ষ্য করে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব জীবের ভাবী ব্যাপার এবং ঊর্দ্ধগতির প্রতি দৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়-গৃহীত ব্যাপারসকল অনুসন্ধানপূর্ব্বক দেখিয়া থাকেন যে, বস্তু-সকলের কিরূপে ক্রমবিবর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান পারমার্থিক জীবনের অমৃতপান করতঃ কাব্য এবং শিল্প রচনা করিতে সক্ষম হন।

লুএলিন্ ডেভিসের মত শুদ্ধ নহে

লুএলিন্ ডেভিসের কথাগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত হইলেও আমরা ইহাতে অনেক বিতর্কের স্থল পাই। ইহার সর্ব্বত্র এই কথাগুলি লক্ষিত হয়---যদিও আত্মজ্ঞান বিজ্ঞান অপেক্ষা কাব্য, শিল্প ও সামাজিক ভাবও ধর্ম্মপ্রসূত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধার উপর অধিক দাবী করিতে পারে, তথাপি জীবনের বৈজ্ঞানিক ভাব আমাদের কিছু না কিছু শ্রদ্ধার উপর দাবী রাখে, কেন না ইহা সত্য।

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত সুতরাং হেয়

আমরা স্থির করি এই যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আমাদের শ্রদ্ধার্হ হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত হেয়। কেননা যাহাকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলেন তাহাতে বিজ্ঞান-লক্ষণ কিছুই নাই। তাহাতে কতকগুলি কথা আছে যাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং

প্রমাণ হইবার যোগ্য নয়। দেখ, নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের আসল কথা কি? তাহাদের আসল কথা এই যে, মানবের আধ্যাত্মিক সত্তা নাই, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র এবং ইতিহাসের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে তাহার কোন কার্য্য নাই। খ্রীষ্টের কোন অনুগত গোস্বামী বলেন যে, খ্রীষ্টপ্রেম দ্বারা আমি এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ক্রমোৎপত্তি-সাধক বৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন তাহা নয়। হে খ্রীষ্টিয়ান, তোমার বিশ্বাস শুদ্ধ ভ্রম। তোমার খ্রীষ্টপ্রেম বৈদ্যুতিক সংবাদ দাতার কার্য্য সম্বন্ধের ন্যায় সংসারিক কার্য্যের নিতান্ত গৌণ কর্ত্তামাত্র। সুখ-দুঃখ, অশ্রু ও হাস্য, বিশ্বাস, আশা, উচ্চাভিলাষ এবং প্রেম ইহারই সামাজিক কার্য্যের গৌণ নিয়ন্তা।

ক্রমোৎপত্তিবাদের যুক্তি-খণ্ডন

ন্যায় মতে বৈজ্ঞানিকদিগের এই কথাই সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ দাবীর হেতু কি, দেখা যাউক। আজকাল যাহাকে বৈজ্ঞানিক—জগৎ বলা হইয়াছে তাহা ডারউইনের ক্রমোৎপত্তি সিদ্ধান্তের চরণে এতদূর সাষ্টাঙ্গ প্রণত যে, ডারউইনের সিদ্ধান্তটী যে একটী মতবাদমাত্র তাহা দেখাইতে হইলে বিশেষ সাহসের প্রয়োজন। ডারউইনের পরম ভক্তগণ যে যে কথা স্বীকার করিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহাদের আজও প্রমাণের বিশেষ অভাব। কেবল এইমাত্র তাহা নহে---প্রমাণে চিরদিনই অভাব থাকিবে। এক জাতীয় বস্তু হইতে বহু জাতীয় আকৃতি ও বর্ণ কৃত্রিম উৎপত্তির দ্বারা হইতে পারে, দেখিয়া তাঁহারা ইহা স্থির করিয়াছেন যে, কোন মূল আকার হইতে আকার-বৈচিত্র্য জন্মিয়া থাকে। প্রকৃতি কখনই দুইটী সর্ব্বপ্রকারে সমান বস্তু উৎপন্ন করেন না। বৃক্ষের এক পত্রের ন্যায় অন্য আর এক পত্র সে বৃক্ষে দেখা যায় না। কোন জন্তু সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাতা বা পিতার সমান হয় না। এই অতাত্ত্বিক ঘটনাগুলি দৃষ্টি করিয়া মালিগণ, পশুপালকগণ এবং তাহাদের ন্যায় অনেকেই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের সহিত একজাতীয় বস্তু হইতে বহু প্রকার আকৃতিশালী বস্তু অর্থাৎ উদ্ভিদ্ ও জন্তু উৎপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত দুই জাতীয়কে একত্র করিয়া পৃথক্ জাতি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হন নাই। মানব সৃষ্টির পর ক্রমোৎপত্তির কোন কার্য্য দেখা যায় না--- একথা ক্রমোৎপত্তিবিদ্ পুরুষেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন

যে বহুকাল বিগত না হইলে একটী নূতন জাতীয় বস্তু উৎপত্তি হয় না, সুতরাং নূতন জাতি দর্শনের আশা এত শীঘ্র করা উচিত নয়। এখন কথা এই হইল যে—প্রতিদিবসের প্রতিঘন্টার এবং প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনাসকলে বিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একটি অদৃষ্ট-ফল-মতবাদ স্বীকার কর, যাহার স্বভাব বিচার করিলে তাহাকে প্রমেয় বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

জড়বাদ স্বীকারের গুরুতর প্রতিবন্ধক

জড়বাদ স্বীকার করার পক্ষে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক থাকিলেও তদপেক্ষা গুরুতর আর একটি প্রতিবন্ধক আছে। ক্রমোৎপত্তিবাদকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহার অধিকার নির্ণয়স্থলে ইহাকে একটি সামান্য প্রক্রিয়ামাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যে শক্তি হইতে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহার মূল ও স্বভাব সম্বন্ধে এই বাদ নিতান্ত নিস্তব্ধ। যে-পর্য্যন্ত ভূমিস্তরসমূহে উদ্ভিদ্ ও জন্তুদিগের আকৃতি ও নির্ম্মাণসম্বন্ধে এই মতের ক্রিয়া হইতে থাকে, সে-পর্য্যন্ত এই ক্রিয়ারও মূলানুসন্ধান প্রবৃত্তি কার্য্য করে না। এই মতে তন্ত্রবাদী যথেষ্ট। কিন্তু সদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ যখন দেখিতে থাকেন যে—অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয় পরিপূর্ণ জীবন সম্বন্ধে যে সময়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অনেক প্রকার সত্তা প্রতীত হয়, যাহার সম্বন্ধ-প্রাপ্ত বস্তু আত্ম-প্রত্যয়ের সীমার বাহিরে নাই।

ক্রমোৎপত্তিবাদের হেয়তা ও ধৃষ্টতা

যখন আমরা আনন্দ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, বাক্য ও ক্রিয়া বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহাদের উৎপত্তিক্রমের মূল জানিতে পারি না, কেবল যখন সৃষ্টিশক্তির তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করি, তখনই তাহা জানিতে পারি। ক্রমোৎপত্তিবাদী সাহসের সহিত কিন্তু প্রমাণশূন্য হইয়া বলিতে থাকেন যে, এই শক্তি জড়যন্ত্রোদিত এবং আত্মপ্রত্যয়ের সম্বন্ধশূন্য কোন প্রকার শক্তি আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতাপূর্ণ জীব সকলকে উৎপত্তি করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ক্রমোৎপত্তিবাদী কোন সিদ্ধান্ত করিতে চায় না। পক্ষান্তরে তিনি স্বীকার করিয়া থাকেন যে এই তত্ত্বটী অপরিজ্ঞাত এবং অবিচিন্ত্য। তথাপি তাঁহার জড়বাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে অতিশয় অবিচারপূর্ব্বক তিনি বলিয়া থাকেন, যাঁহারা ক্রমোৎপত্তিবাদের সত্যতা সন্দেহ করেন, তাঁহারা অতত্ত্বজ্ঞ এবং বাদদূষিত।

জড়ীয় মতবাদ সসীম ও ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত

হারবার্ট স্পেন্সার, হাক্সলি প্রভৃতির উদ্ভাবিত বিজ্ঞান করণাপাটব-সম্ভূত প্রমাদবিশেষ। অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানীগণ জৈবজীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধি সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদজনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। জড়ীয় মতবাদ যে নিতান্ত সীমাবিশিষ্ট এবং ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবে পরিপূর্ণ—ইহা দেখাইয়া দিলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিরোধে সেই ভ্রান্তদিগের শিক্ষা কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারিবে না।

খ্রীষ্টয় মতের Soul ও বেদের আত্মা এক নহে

এই প্রবন্ধটী কোন খ্রীষ্টিয়ান লেখনী হইতে নিঃসৃত, ইহাতে সন্দেহ নাই। লেখক জড়বাদ অস্বীকারপূর্ব্বক যেটুকু আধ্যাত্মিকবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মোচিত সঙ্কোচিত আত্মবাদ মাত্র। খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্মে যে একটি Soul শব্দ আছে, তাহা স্থাপনা করিতে গেলে নিতান্ত জড়বাদীদিগের মতের খণ্ডন করা আবশ্যক, কেন না জড়শক্তিগত বিধি সকলকে অতিক্রম করিয়া সেই Soul বর্ত্তমান। পরন্তু খ্রীষ্টিয়ান মত-ভাবিত Soul যে শুদ্ধ আত্মা তাহা নয়। বেদশাস্ত্রে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যে আত্মার উদ্দেশ আছে সে আত্মা নিতান্ত জড়বাদ ও মিশ্র জড়বাদ হইতে পৃথক্। খ্রীষ্টিয়ানের আত্মা মিশ্র জড়বাদের অন্তর্গত। মন ও মনের ধর্ম্ম সমস্তই খ্রীষ্টিয়ানের আত্মা। কিন্তু শুদ্ধ আত্মা মন হইতে অত্যন্ত উচ্চ ও শুদ্ধ।

জড়বাদ অপেক্ষা খ্রীষ্টিয় আত্মবাদও শ্রেষ্ঠ

লিঙ্গ-শরীরকে খ্রীষ্টিয়ানগণ আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি স্বর্গ ও একটি নরকের কল্পনা করিয়াছেন ও সেই বিশ্বাসের অনুগত একটি ঈশ্বর ও একটি সয়তানের বিশ্বাসকে অঙ্গীকার করেন। যাহা হউক খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অনুভব করিতে না পারিলেও সর্ব্বপ্রকার জড়বাদীর পূজনীয়, কেন না সর্ব্বপ্রকার জড়বাদেই আত্মতত্ত্বের অন্বেষণমাত্রই নাই। খ্রীষ্টিয়ানগণের স্থূল ও জড়বন্ধন-মুক্তি-পূর্ব্বিকা আত্মপথে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়—

ইহাই তাহাদের মঙ্গলের বীজ। এই শ্রদ্ধাভাস জন্মজন্মান্তরে সৎসঙ্গরূপ সুকৃতি বলে অনন্যা ভক্তিতে শ্রদ্ধারূপে পরিণত হইবে। জড়বাদীগণ দুর্ভাগা। তাহাদের মরণান্তে জড়ধর্ম্ম প্রাপ্তিই ফল। ''ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা'' এই ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ। ''যান্তি দেবব্রতা দেবান্'' এই বাক্য দ্বারা খ্রীষ্টিয়ানগণ দেবতত্ত্বের স্বর্গলোক লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। বেদার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ ''যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্'' এই বাক্যক্রমে শুদ্ধ আত্মবস্তুর যাজন পূর্ব্বক পরমাত্মস্বরূপ ভগবৎ-সেবা লাভ করেন।

জড়বাদীগণই ভূত-পূজক 'ভূতেজ্যা' এবং ইহাদের সভ্যতা আধুনিক ও আসুরিক

জড়বাদীদিগকেই ভুতেজ্যা বলা যায়, কেননা তাহারা জড়ভূত ও জড় ভূতদিগের বিধি ও জড়-শক্তি আলোচনা পূর্ব্বক যতপ্রকার ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তি বিধি নির্ণয় করিয়াছে এবং সেই বিধিকে জগচ্চক্রের প্রধান বিধি বলিয়া মানিয়াছে। তাহারা মরণান্তে আত্মতত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া জড়মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের আত্মশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া জড়শক্তি প্রধান হইয়া জড়ীভূত হয় ইহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। ইহারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই অপরাধেই তাহারা চরমে অধিকতর বঞ্চিত হয়। এই প্রকার ক্রমোৎপত্তিবাদ আর্য্যপুরুষদিগের মধ্যে বহুতর অধঃপতিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কিছু মাত্র নূতনতা নাই। পাশ্চাত্য দেশে অতি অল্পকালই মানবের সভ্যতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেখা যায়। সেই সব দেশে সুতরাং টিণ্ডল, হাক্সলি, ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত। পুরাতন কথা নূতন ভাষায় বলিলে যে পাণ্ডিত্যের দাবী করা যায় তাহাই তাঁহারা করিতে পারেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে শ্রীভগবদ্গীতা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে আসুর প্রবৃত্তি বর্ণনে ''জগদাহুরনীশ্বরং'', ''অপরস্পরসম্ভূতং'' ইত্যাদি বাক্যে স্বভাববাদ, ক্রমোন্নতি ও ক্রমোৎপত্তিবাদ এই সকল যে আসুর প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়---তাহা কথিত হইয়াছে।

ক্রমোন্নতিবাদী ও ক্রমোৎপত্তিবাদীগণের প্রতি উপদেশ

এই সকল বাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করা স্বার্থ-সাধক জীবের কর্ত্তব্য। জড় জগতের বৈচিত্র্য সমস্ত স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতে অধিকর্ত্তার লীলা, আলোচনা করতঃ ভগবৎপ্রেমের অনুসন্ধান করা উচিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদে

আবদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। প্রক্রিয়ান্বেষী শিল্পীদিগের পক্ষে সেই সেই বিজ্ঞান বহু মাননীয়। শিল্প-বিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নত করিয়া তত্ত্ববিদ্গণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাঁহারা তাহার আলোচনায় নিযুক্ত তাঁহাদের সামান্য শিল্প বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর নির্ব্বাহী ব্যাপার সকলের সাধনের জন্য অন্যান্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাত, ক্রমোন্নতিবাদি! হে ভ্রাত, ক্রমোৎপত্তিবাদি! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর, তাহাতে তোমাদের এবং জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকারচর্চ্চাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।

বেদান্তের সিদ্ধান্ত

বেদান্ত কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে লোকের অনেক সন্দেহ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, বৈষ্ণবদিগের মত ও বেদান্ত-মত পরস্পর পৃথক্। সাধারণগণ এইরূপ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণ ভাগবতাদি পুরাণ অবলম্বন করিয়া চলেন এবং পুরাণ-সকল বেদান্ত হইতে পৃথক্ শাস্ত্রবিশেষ। তাঁহাদের মনে এরূপ ধারণা আছে যে, শঙ্করাচার্য্য যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বৈদান্তিক মত। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রম-মূলক। আমরা প্রথমেই সেই ভ্রম দূর করিতে যত্ন পাইব।

বেদের শিরোভাগকে উপনিষদ্ বলে। উপনিষৎ অনেক; তন্মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় এবং বৃহদারণ্যক প্রভৃতি দশটী উপনিষৎ বলিয়া সর্ব্বকালে স্বীকৃত আছে। সেই উপনিষদ্ বাক্যের নামই বেদান্ত। বেদান্ত শব্দে বেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বুঝায়।

উপনিষদ্বাক্যসকল প্রায় পরস্পর সংযুক্ত নয়। উপনিষদ্ গ্রন্থে বিষয়বিভাগ-পূর্ব্বক কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নাই। প্রত্যেক বাক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন অল্প-মেধাবী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষদ্বাক্যে বেদান্ত-জ্ঞান লাভ করা দুঃসাধ্য।

পরম দয়ালু সত্যবতী-নন্দন বেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যেমত বেদ-সকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ উপনিষদ্বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্ত বাক্যার্থ সংগ্রহ করতঃ প্রায় সাড়ে পাঁচ শত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বলিয়া তাহাদের নামকরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ সূত্রসকলের যথার্থ অর্থ সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি নারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্য সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নির্ম্মাণ করেন শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল সিদ্ধান্ত আছে সে সমুদয়ই যথার্থ বেদান্তসিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রাকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হ'ন তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে বেদন্তবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে। বেদান্ত-সূত্রভাষ্য-স্বরূপ ভাগবতে (১/২/১১) এইরূপ লিখিত হইয়াছেঃ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে।।

অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন সেই অদ্বয়জ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অদ্বয়তত্ত্বই সমস্ত সিদ্ধান্তের চরম বিশ্রাম স্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ যখন সেই অদ্বয়তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, তখন উক্ত প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সগুণ ন'ন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সমস্তই নির্গুণ।

'অদ্বয়জ্ঞান' কাহাকে বলে তাহা বিচার করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে, কেবল অভেদ বাদকে অদ্বয়জ্ঞান বলে। তাহা নয়। 'কেবল অভেদ'-বাদ সমস্ত বেদবিরুদ্ধ। বেদ অনেক স্থলে অভেদবাদ এবং অনেক স্থলে নিত্যভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাহা হইতে অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য; অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। এই ভেদাভেদতত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রষ্ট্র-স্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুতেই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার 'কেবল ভেদ' দৃষ্টি হয়। জড় একটী নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথক, রূপে ভাসমান হয়। ইহারই নাম দ্বৈতজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানময়। ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লয়, তখনই ঐ অদ্বয়জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্ম-স্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা-প্রকৃতি-রূপ জীব-চৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি। পরমাত্মতত্ত্বে দৃঢ়ীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রতীত হন। তখন অদ্বয়জ্ঞানের নাম ভগবান্। ভগবদ্দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন

পরমবস্তু আর পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায়, তাহার স্বরূপ প্রকৃতিময় হইয়া পড়ে। অতএব ভগবান্ই অদ্বয়-তত্ত্বের চরম প্রকাশ, পরম নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাঁহারা ভগবান্কে সগুণ ও ব্রহ্ম, পরমাত্মাকে নিগু'ণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ বেদান্তবিচারে পটু ন'ন। তাঁহারা অদ্বয়তত্ত্বের যাথার্থ লাভ করেন নাই।

"ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ"

---এই সূত্রে কেবল-অদ্বৈত-ভায্যে কোন প্রকার ভাল সিদ্ধান্ত নাই। রামানুজাদি পরম পণ্ডিতগণ এই সূত্রটীর ভায্যবিচারে যে শ্রুত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সমুদয় বিচার করিলে স্থানাভাব হয়। অতএব আমরা কেবল নিম্নলিখিত বচনটী উদ্ধৃত করিয়া সন্তুষ্ট হইব—

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভি-যু'তঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ।।"

সেই অদ্বয়জ্ঞানরূপ অচ্যুত তত্ত্ব স্বরূপতঃ একমাত্র ভগবান্। জীব দৃষ্টিভেদ-ক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে একই বৈদুর্য্য-মণি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে। তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ তত্ত্বমণিও জীবের অধিকার-ভেদে্ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে ভাসমান। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের অধিকার-ভেদ কত প্রকার?

জীবের বুদ্ধি ও দক্ষতাভেদে অধিকার নানা প্রকার। সেই অধিকারসমূহ স্থূলবিচারদ্বারা তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। সেই তিনটি অধিকারের নাম--জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞানাধিকারে অবস্থিত পুরুষ সেই তত্ত্বমণিকে 'ব্রহ্ম'স্বরূপে দৃষ্টি করেন; যোগাধিকারে অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে 'পরমাত্মা' স্বরূপে দৃষ্টি করেন। ভক্ত্যাধিকারে অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমণির ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন।

ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ স্বরূপ; যেহেতু তাহাই বিশেষ্যতত্ত্ব। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণদ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র ভগবান্ বই আর কিছুই ছিল না। তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্টি হইলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই ভাবে ভগবানের একটী বিশ্বসম্বন্ধীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। 'ব্রহ্ম'-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। একটি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত সৃষ্টি

বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তাবিশেষ। উভয়ভাবই বিশ্বসম্বন্ধীয় ভাব। অতএব ব্রহ্মই ভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপে বিশ্বসম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে ভগবানের 'অঙ্গকান্তি' বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থই হইয়া থাকে। পরমাত্মাকে ভগবানের 'অংশ বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না। জীব-সৃষ্টির সহিত ভগবানের যে অংশাবির্ভাব, তাহা শ্রীভগবদ্গীতায় (৭/৫) স্বীকৃত হইয়াছে—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভুতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।"

সর্বভূতসমূহে গূঢ় সর্বভূতাত্মা শ্রীগোবিন্দ

"একোহপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৫)

মায়িক-তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ আর একটী স্বভাব চিদ্‌বস্তুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণে বর্তমান। তিনি অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। জগৎ সমস্তই তাঁহার শক্তি-পরিমাণ। আবার তাঁহার স্থিতিও অলৌকিকী; কেন না, সমস্ত চিদচিদ্ জগৎ তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত এবং তিনি সেই একই সময়ে জগতে, এমন কি, সমস্ত জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত। সর্বব্যাপিত্ব-ধর্ম--কেবল কৃষ্ণের প্রাদেশিক ঐশ্বর্য মাত্র, কিন্তু সর্বব্যাপিত্ব সত্ত্বেও মধ্যমাকারে সর্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থানই তাঁহার লোকাতীত চিদৈশ্বর্য। এই বিচারদ্বারা যুগপৎ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে এবং মায়াবাদাদি সমস্ত দুষ্টমত দূরীকৃত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম সাকার

উপনিষদ্-বাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায়, এবং শব্দের 'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়িয়া যে 'লক্ষণা' করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান', 'ঐতিহ্য' ও 'শব্দ'—এই চারি প্রকার প্রমাণের মধ্যে 'শ্রুতিপ্রমাণ' অর্থাৎ শব্দপ্রমাণই সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখ, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু 'শঙ্খ' ও 'গোময়' তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্য-বলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে 'অমুমানের' অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদিগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ-মেঘ-দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্বধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বর লক্ষণে লক্ষিত হন্। আবার সেই ঈশ্বরকে তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহদ্ব্রহ্মবস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব 'ব্রহ্ম', 'ঈশ্বর' ইঁহারা ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সবিশেষ; তাঁহাকে 'নিরাকার' ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে সকল শ্রুতি তাঁহাকে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃত-বিশেষ' নিষেধ করিয়া 'অপ্রাকৃত-বিশেষ' স্থাপন করেন। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্রং পুরুষং মহান্তম্।।" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯) ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত-সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে।

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষরমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব।।" (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

—"যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন।"

'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'-ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য, ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না উহাতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে---(তৈঃ উঃ-১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহা পাওয়া যায় যে, এই চরাচরবিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মে পুনরায় লীন হয়।" এই সব বেদ বাক্যদ্বারা পরব্রহ্মের 'অপাদান' 'করণ' ও 'অধিকরণ'-কারকত্বরূপ তিন প্রকার লক্ষণ আছে। এই তিন প্রকার নিত্যলক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্' (তৈঃ উঃ ব্রঃ-৬) ইত্যাদি শ্রুতিমতে ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐতঃ উঃ ১।১) এই বাক্যমতে প্রাকৃত-শক্তিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময়ে প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই; অতএব, ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে নয়নে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই মন ও নয়ন প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল।

সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল, ইহা সর্ব্ব-বেদসম্মত। উপনিষদ্-বাক্যে প্রায় সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দ পাওয়া যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্--ইঁহাই বেদসম্মত এবং শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা কৃষ্ণই যে সেই স্বয়ং ভগবান্, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, বেদে এরূপ স্পষ্টবাক্য নাই, তবে বিচার করিয়া দেখ, বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ়। মহর্ষিগণ বেদবাক্য-তাৎপর্য্য জগতে বুঝাইবার জন্য পুরাণবাক্যে বেদতাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১৪।৩১) বলিতেছেন---

"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।"

—"নন্দ-গোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।"

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯) এই শ্রুতি---আদৌ ব্রহ্মের 'প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই' বলিয়া পরে 'শীঘ্র চলে এবং সকল বস্তু গ্রহণ করে' এই বাক্যদ্বারা অপ্রাকৃত হস্ত-পদ আছে বলিয়া ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' করিতেছেন। মায়াবাদিগণ শ্রুতির মুখ্যার্থ ছাড়িয়া লক্ষণাবৃত্তিতে ব্রহ্মের সবিশেষ-নিষেধক নির্ব্বিশেষত্ব অন্যায়রূপে স্থাপন করিতেছেন। তাঁহারা ব্রহ্মকে 'নিত্য নিরাকার'

বলিয়া সংস্থাপন করেন, পরন্তু শাস্ত্রমতে সেই ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দবিগ্রহবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া স্থির করেন কিন্তু 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে'' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)—এই বেদবাক্যমূলক বহু শাস্ত্রবাক্যে সেই ব্রহ্মের তিনটি স্বাভাবিক শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, যথা---

''বিষ্ণুভক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে।।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতো।।'' (বিষ্ণুপুরাণ)

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার---পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যাসংজ্ঞাবিশিষ্ট। বিষ্ণুর পরা শক্তিই চিচ্ছক্তি; ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি; কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তির নাম 'মায়া'।

ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিই জীবশক্তি; সেই জীবশক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়াবৃত্তিরূপে অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়া সংসার গত অখিলতাপ নিত্য ভোগ করেন। আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা-কুণ্ঠাবৃতা হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি---সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জীবশক্তি---মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞিতা মায়াশক্তি---অধমা। জীবশক্তি মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তি বৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করত উচ্চ-নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

হে ভগবন্! সর্ব্বাশ্রয় নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময়। মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হলাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্রা'---এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণ-স্বরূপে একাকারা।

বিষয় ও বৈরাগ্য

অনেকে মনে করেন যে বিষয়ী লোকের বৈরাগ্য নাই ও বৈরাগীর বিষয় নাই। এ কথা নিতান্ত অতাত্ত্বিক। বিষয়ে অবস্থিত ব্যক্তির বৈরাগ্যসাধন অসম্ভব নহে, বরং সুবিধা হইলে সেই অবস্থাতেই—বৈরাগ্যসাধন অনেকে করিয়া থাকেন। বিরাগ উদয় হইলেই যে বিষয় ত্যাগ হয় তাহাও নয়। স্থূল দেহে সাধক যে পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকেন সে পর্য্যন্ত শারীর-কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী সমস্ত বিষয়ই থাকে। দেহধারী মনুষ্যমাত্রই বিষয়ী। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া যখন যিনি নির্ব্বিষয়ী-ভাব বাঞ্ছা করেন তখন তিনি ক্রমে ক্রমে হৃদয়নিষ্ঠাকে বিষয়-মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যখন তিনি সফল হন তখন তিনি স্বরূপতঃ বৈরাগী হইতে পারেন। শ্রীদাস গোস্বামীর নির্ম্মল চরিত্র আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া সংসার ত্যাগের বাসনা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সে সময় পরমারাধ্য শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন,—

> "স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
> ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।।
> মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
> যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।।
> অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
> অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।"

বৈরাগীকুলতিলক দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর আজ্ঞা পরমানন্দে মস্তকে ধারণ করত স্বগৃহে গমন করিলেন। তথায় কিছু দিবস সদ্‌গৃহস্থের ন্যায় আচরণ করতঃ বৈরাগ্যোপযোগী ব্যবহার শিক্ষা করিয়া পরে সুযোগ পাইয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীমহাপ্রভুর চরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে মহাপ্রভু এই কথা বলিলেন—

> "ভাল কৈল, বৈরাগ্য-ধর্ম্ম আচরিল।।
> বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
> মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ।।
> বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
> কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।।

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ।।
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ।।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।"

শ্রীদাসগোস্বামী যদিও সিদ্ধ পার্ষদ, তথাপি জগজ্জনকে বিষয়ে অবস্থিত হইয়া ক্রম-চেষ্টাদ্বারা কিরূপে বৈরাগ্য লাভ করা যায় তাহার উপায় শিক্ষা দিবাব জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে পূর্ব্বোক্তক্রম শিক্ষা দিয়াছেন।

অনেকে মনে করেন যে বর্ণাশ্রমস্থিত কৃষ্ণোপাসকগণ বৈষ্ণব নাম পাইবার অধিকারী নন অর্থাৎ যাঁহারা ভেক লইয়া কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাই বৈষ্ণব। একথাটি নিতান্ত অমূলক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মহা প্রভুর পার্ষদবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহস্থ বৈষ্ণব। কলিকালে যেরূপ দৌরাত্ম্যের প্রবলতা, তাহাতে বৈষ্ণবগণ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পক্কাবস্থা লাভ না করেন সে পর্য্যন্ত গৃহস্থধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণভজন করিবেন, ইহা জগৎকে শিখাইবার জন্য শ্রীকলিযুগ-পাবন অবতারের পার্ষদবর্গ অনেকেই গৃহস্থ থাকিয়া যেরূপ উচ্চ বৈষ্ণবতা আচরণ করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছেন। পরিপক্কাবস্থার অপেক্ষায় বৈষ্ণবকে গৃহে থাকিতে গেলে ভেকধারী বৈষ্ণবের সংখ্যা নিতান্ত কম হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় অপক্কাবস্থায় ভেক লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সংখ্যা স্বল্পই হওয়া স্বাভাবিক; অধিক হইলে উৎপাতের মধ্যে পরিগণিত হয়, যথা--- "শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।"

পরিপক্ক বৈরাগী বৈষ্ণবের সম্বন্ধে দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া 'মহাপ্রভু' শ্রীমুখে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন,—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।"

শ্রীআম্নায়-দশমূল

প্রমাণম্ (১)

ওঁ অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগিত্যাদি।
ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বণং
চতুর্থমিতিহাসংপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিত্যাদি।

(বৃঃ আঃ ২।৪।১০)

অনুবাদ। মহাপুরুষ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ শ্লোক, সূত্র, অনুবাখ্যা---সমস্তই নিঃসৃত হইয়াছে। ইতিহাস-শব্দে রামায়ণ মহাভারতাদি। পুরাণ-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবত-শিরস্ক অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ। উপনিষৎ শব্দে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন প্রভৃতি একাদশ উপনিষৎ। শ্লোক শব্দে ঋষিগণকৃত অনুষ্টুপাদি ছান্দোগ্রন্থ। সূত্র-শব্দে প্রধান প্রধান তত্ত্বাচার্য্যকৃত বেদার্থ-সূত্রসকল। অনুব্যাখ্যা-শব্দে সেই সূত্রসম্বন্ধে আচার্য্যগণকৃত ভাষ্যাদিব্যাখ্যা। এই সমস্তই আম্নায়-শব্দে কথিত।

প্রমেয়ম্ (২-১০)
(সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনমূলকম্)

সম্বন্ধঃ

কৃষ্ণঃ। ২

তত্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" (ছাঃ ৮।১৩।১)

ইত্যাদি একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিত্যাদি।

অনুবাদ। আমি উপনিষদুক্ত পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম শবল। কৃষ্ণপ্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসার-ভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী সার-ভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই।

(এক অদ্বয়বস্তু শক্তিপরিণতি-ক্রমে বহুপ্রকারে দৃশ্যমান।)

কৃষ্ণশক্তিঃ। ৩

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।। (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

সেই কৃষ্ণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিপূর্ণ চিৎস্বরূপ। অতএব, জড়দেহ যেরূপ সৌন্দর্য্য পরিমিতি সহকারে এক সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না, সেরূপ নয়। কৃষ্ণবিগ্রহ সৌন্দর্য্য-পরিমিতির সহিত অপরিমেয়রূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা-বিশিষ্ট। এইরূপ হইয়াও তিনি পরাৎপর বস্তু। অন্য কোন স্বরূপই তাঁহার সমান বা অধিক হইতে পারে না; যেহেতু, তাহা অবিচিন্ত্যশক্তির আধার। তাঁহার অবিচিন্ত্যতা এই যে, পরিমিত জীববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সেই অবিচিন্ত্যশক্তির নাম পরা শক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হলাদিনী) ভেদে বিবিধা।

কৃষ্ণধামরসঃ। ৪

দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ সংব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। (মুণ্ডক ২।২।৭)
রসো বৈ সঃ (তৈত্তিরীয় ২।৭)

অনুবাদ। (অপ্রাকৃত ব্রহ্মপুর পরব্যোম ধামে এই পরমাত্মা নিত্য বিরাজমান।)

পরমতত্ত্বই রস। রসতত্ত্বের স্বরূপ এই—শ্রদ্ধা নিষ্ঠা-রুচি আসক্তিক্রমে ভগবৎ-সম্বন্ধিনী প্রবৃত্তি যখন রতিরূপা হয়, তখন তাহাকে স্থায়িভাব বলে। সেই স্থায়িভাবে যখন যখন বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যাভিচারী--এই চারিটী সামগ্রীরূপ ভাব সংযুক্ত হইয়া স্থায়িভাবরূপ রতিকে স্বাদ্যত্ব রূপ কোন চমৎকার অবস্থায় নীত করে, তখন তাহা ভক্তিরস হয়।

জীবঃ। ৫

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি
এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (বৃহদারণ্যক ২।১।২০)

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্।

তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতী দঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।। (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯)

অগ্নির যেরূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে।

সেই জীবপুরুষের দুইটি স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয় মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থান স্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব উভয়স্থানই দেখিতে পান।

মায়াবদ্ধজীবঃ। ৬

তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।। (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯)

সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন।

বদ্ধঃ মুক্তঃ জীবঃ। ৭

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।।

(মুণ্ডক ৩।১।২; শ্বেতাশ্বতর ৪।৪)

সেই একই বৃক্ষে অবস্থিত জীব মায়ামোহিত হইয়া শোক করিতে করিতে পতিত হন। যখন সেবনীয় ঈশ্বরকে দেখিতে পা'ন, তখন বীতশোক হইয়া জীব তাঁহার মহিমা লাভ করেন।

পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগদিতি।
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি (ঈশোঃ১)
জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশান্তি চ ইত্যাদি।। (তৈঃ ৩।১)

জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ভগবচ্ছক্তি-সম্বন্ধযুক্ত।

সকল বস্তুতে চিচ্ছক্তি-সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকিলে আর বহির্ম্মুখ ভোগ হয় না, অন্তর্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে জগতে যাহা শরীর-যাত্রার জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, সেই সকলই ভগবৎ প্রসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অধঃপতন হয় না।

'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে', এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধ হয়। 'যাঁহা কর্ত্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে',—এই বাক্যদ্বারা করণকারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে'—এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণ-কারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই লক্ষণ দ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ।

অভিধেয়ং নববিধাভক্তিঃ। ৯

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যম্ ইত্যাদি।।

(বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬)

অয়ি! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং নিরন্তর একান্তভাবে ধ্যান করিতে হইবে।

প্রেম প্রয়োজনম্। ১০

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং স্তেন কুর্য্যামিতি। (বৃহদারণ্যক ২।৪।৩)

রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি। (তৈত্তিঃ ২৭)

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।। (তৈত্তিঃ ২।৪)

মৈত্রেয়ী বলিলেন,—'যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব, তাহার দ্বারা কি করিব?'

সেই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দ লাভ করেন।

সেই পরব্রহ্মের আনন্দ বিদিত হইয়া কেহ কখনও গর্ভ বাসাদি দুঃখ হইতে ভীত হয় না।

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা-দশমূল

প্রমাণং বেদশাস্ত্রং ১

বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।। (গীঃ ৯।১৭)

আমিই পবিত্র ওঙ্কার; আমিই ঋক্ সাম্ ও যজুঃ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।। (গীঃ ১৬।২৪)

অতএব কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও।

সম্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ ২

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। (গীঃ ৭।৭)

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিগণ গাঁথা থাকে, তদ্রূপ সমস্তবিশ্বই আমাতে ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করে।

কৃষ্ণশক্তিঃ ৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।। (গীঃ ৭।৪-৬)

ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানের নামই ভগবজ্ জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই যে, আমি---সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ; ব্রহ্ম---আমার শক্তিগত একটী নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র; তাহার স্বরূপ নাই,---সৃষ্ট জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব বিশেষ; ফলতঃ তাহাও অনিত্য-জগৎ সম্বন্ধতত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য' স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই 'নিত্য', তাহাতে আমার

শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম---'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা' শক্তি ও বলা যায়; আমার এই অপরা বা জড়সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটী তত্ত্ব সংখ্যা লক্ষ্য করিবে। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ--এই পাঁচটী 'মহাভূত' এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ---এই পাঁচটী তন্মাত্র; —এইপ্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা-প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা---'এক' তত্ত্ব। এই সমূদয়ই আমার বহিরঙ্গা শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত আমার একটী 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপ জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা শক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ---এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীব-শক্তিকে তটস্থা-শক্তি বলা যায়।

চিদচিৎ সমস্ত-জড় ও তটস্থ জগৎ---এই দুই প্রকৃতি হইতেই নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই সমস্ত উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু।

কৃষ্ণরসঃ ৪

অব্যক্ত ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।। (গীঃ ৭।২৪)

যাহারা নির্ব্বিশেষবুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তিত্ব লাভ করি, অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক্, তথাপি নির্ব্বোধ; যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম, অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিত্যবিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।। (গীঃ ৯।১১)

আমি যাহা বলিলাম্, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ---সচ্চিদানন্দময়, আমারই অনুগ্রহে আমার শক্তি সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড় জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, তাহাও কেবল আমার অনুগ্রহ ও শক্তিপ্রভাবমাত্র। আমি---জড় বিধি সকলের

অতীত---তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করেন, উহা তাহাদের মায়াবদ্ধা বুদ্ধির কার্য্যমাত্র; আমার পরমভাব তাহা নয়। আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যমাকারস্বরূপ হইয়াও আমার শক্তিদ্বারা আমি---যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল আমার অচিন্ত্য---শক্তিক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোকসমূহ আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; অতএব, অবিদ্বৎ প্রতীতি-দ্বারা আমাতে একটী ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদানন্দতনু' বলিয়া বুঝিতে পারেন।

জীবঃ ৫

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।। (গীঃ ১৫।৭)

আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ---দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ; স্বাংশক্রমে আমি বামন-নৃসিংহাদিরূপে লীলাপ্রকাশ করি; বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কররূপে জীবের প্রকাশ। স্বাংশ-প্রকাশে আমার অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পরমেশ্বরীয় অহংতত্ত্ব থাকে না। তাহাতে জীবের একটী স্বসিদ্ধ অহংত্বের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটী দশা---মুক্তদশা ও বদ্ধদশা; উভয় দশাতেই জীব--সনাতন অর্থাৎ নিত্য; মুক্তদশায় জীব---সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতি সম্বন্ধশূন্য।

বদ্ধজীবঃ ৬

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।। (গীঃ ১৫।৮)

মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, তাহা নহে। জীব এই স্থূল শরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনকালে সে সেই শরীর-সম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয় পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব

সূক্ষ্মভূত-সহকারে একটী স্থূলশরীর হইতে অন্য স্থূল শরীরে ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়া প্রয়াণ করে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।। (গীঃ ৭।১৫)

দুষ্কৃতিব্যক্তিগণ আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা— 'মূঢ়', 'নরাধম' 'মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান' ও 'আসুর-ভাবাশ্রিত'-ভেদে চারিপ্রকার। নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, কর্ম্মজড়মতি, ব্যক্তিগণই মূঢ়, ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসঙ্কল্প। 'নরাধম' শব্দে মানবগণের হৃদ্গত উচ্চভাবরহিত নিরীশ্বর-নৈতিক ও কল্পিত-ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়-কার্য্যাবিৎ পুরুষগণকে বুঝিতে হইবে। তাহারাই 'মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান' পুরুষ —যাহারা চিদ্বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম-দ্বারা দুষ্টমত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তিতত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই আসুরভাবাশ্রিত, যাহারা দম্ভ, অহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত সাধুদিগের হীন বলিয়া জানে। সংক্ষেপবাক্য এই যে, যাহারা সর্ব্বসময়েই সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিশূন্য তাহারাই 'দুষ্কৃত'।

মুক্তিঃ ৭

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।

নাপ্নুবন্তিমহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমং গতাঃ।। (গী ৮।১৫)

মহাত্মা ভক্ত যোগীসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না; যেহেতু তাঁহারা পরম সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্ততাই কেবলা ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (গীঃ ৭।১৪)

এই মায়া আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানদ্বারা বা অন্যদেবতা প্রপত্তি-দ্বারা মায়া-সমুদ্র পার হইতে পারেন না।

মায়া-জীবেশ্বর-পরস্পর-সম্বন্ধঃ ৮

মর়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।। (গীঃ ৯।৪-৫)

অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি-স্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি; চৈতন্যস্বরূপ আমাতে সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়; আমি—পূর্ণ বিভূচৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন; কিন্তু আমি পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক্ তত্ত্ব।

যেতেতু আমি বলিলাম যে—আমাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত; যেহেতু, আমার যে মায়াশক্তিপ্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধিদ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না। অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর্য্য জ্ঞান করিয়া আমার শক্তিকার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে,আমাতে দেহ-দেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ।

অভিধেয়ং ৯

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।। (গীঃ ৯।১৩)
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।। (গীঃ ৯।১৪)

হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্বৎ-প্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারাই মহাত্মা; তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছফলদ কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী অভেদবাদ রূপ শুষ্কজ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকলভূতের আদি ও অব্যয় আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া ভজন করেন।

সেই বিদ্বৎ-প্রতীতিযুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার

এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের নিত্যদাস্য-লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ 'একাদশী', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি ব্রতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসার নির্ব্বাহকালে ভক্তিযোগদ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন।

প্রয়োজনম্ ১০

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। (গীঃ ৯।২২)

তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যার (ত্রয়ীর) উপাসকসকল সুখলাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন, তাঁহারা দেহযাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারা নিত্য অভিযুক্ত; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমিই তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং পালন-কার্য্য করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগ-বিহিত বিষয়সমূহ স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়ভোগ অনায়াসেই হয়; তাহাতে বহির্দ্দৃষ্টিতে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব, ভক্তদিগের কামনা না থাকিলেও আমি তাঁহাদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করি; আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। কিন্তু প্রতীকোপাসকেরা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করতঃ পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়; তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তগণের কিছু মাত্র অপরাধ লই না, যেহেতু তাঁহারা আমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না; আমি স্বয়ং তাঁহাদের অভাব সম্পাদন করি।

সমোহহং সর্ব্বভূযেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।। (গীঃ ৯।২৯)

আমার রহস্য এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি; --আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই; ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল

প্রমাণং বেদশাস্ত্রম্। ১

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।

(ভাগবত ১১।১৪।৩)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধভক্তিরূপ 'জৈবধর্ম্ম' কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি।

সম্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ। ২

যদ্দর্শনং নিগম আত্মবহঃপ্রকাশং মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।
তং সর্ব্ববাদবিষয় প্রতিরূপশীলং বন্দে মহাপুরুপসমাত্মনিগূঢ়বোধম্।।

(ভাগবত ১২।৮।৪৯)

হে ভগবান! একমাত্র বেদেই ভবদীয় রহস্য-প্রকাশক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা ব্রহ্মপ্রমুখ জ্ঞানিগণও সাংখ্যযোগাদিমার্গে চেষ্টাযুক্ত হইয়াও ভবদীয় স্বরূপ-বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি সাংখ্যাদি বাদিগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিরূপ বা প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জীবের নিকট দেহাদি উপাধিসমূহে ভবদীয় স্বরূপ জ্ঞান নিগূঢ় রহিয়াছে। আমি মহাপুরুষরূপী আপনার বন্দনা করিতেছি।

কৃষ্ণশক্তিঃ। ৩

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে।।

(ভাগবত ৬।৪।৩১)

প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—"বাদীদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সম্বাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহূর্ম্মুহু জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্ত-গুণস্বরূপ ভূমাপুরুষকে আমি নমস্কার করি।

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধান্নঃ।।

(ভাগবত ১১।৪।২)

অনন্তপুরুষের অনন্তগুণ। যিনি তাহা অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি। ভূমির রেণুসকল কোন প্রকারে গণিত হইতে পারিলেও অখিলকালে অখিলশক্তি ধাম ভগবানের গুণসমূহ কখনই সংখ্যা করিতে পারা যায় না।

কৃষ্ণরসঃ। ৪

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

(ভাগবত ১০।৪৩।১৭)

অখিল-রসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রসের পরিচয়। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যে রস (তিনি) সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীররসপ্রিয় মল্লসকল দেখিল যে, সাক্ষাদ্ বজ্রস্বরূপ কৃষ্ণ উদিত হইলেন। মধুররসপ্রিয় স্ত্রীগণ (তাঁহাকে) সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথ দেখিলেন। নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন। সখ্য-বাৎসল্য-প্রিয় গোপসকল স্বজন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। ভয়ার্ত্ত অসদ্রাজসকল শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে দেখিল। পিতামাতা অতিসুন্দর শিশু দর্শন করিলেন। ভোজপতি (কংস) সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিল। শান্তরসের পরমযোগিসকল পরতত্ত্ব দেখিতে পাইলেন। বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন।

জীবঃ। ৫

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ।।

(ভাগবত ১১।১১।৪)

ভগবান্ কহিলেন,—"হে উদ্ধব! মহামতে! জীব বলিয়া আমার একটী অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদি বিদ্যাকর্ত্তৃক মুক্ত হন। এস্থলে 'অংশ'-

শব্দের তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্‌বস্তু, অতএব কাষ্ঠ পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে অংশ করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূলবস্তু খর্ব্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহু দীপ যেরূপ জ্বালিত হয়, সেরূপ অংশ কথঞ্চিৎ স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুইপ্রকার--একপ্রকার অংশের নাম 'স্বাংশ' এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম 'বিভিন্নাংশ'। 'স্বাংশ'-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বমহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশলক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। 'বিভিন্নাংশ'- সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্র মণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না; কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায় ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়। স্ব-স্ব-কার্য্যের দায়িকতা ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। 'বিভিন্নাংশ' কখনই চিন্তামণির প্রভূতধর্ম্ম পায় না। জীব---'বিভিন্নাংশ''।

বদ্ধজীবঃ। ৬

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্।।

(ভাঃ ১১।১১।৬)

এই সংসার বৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পর সদৃশ ও সখারূপ দুইটী পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী পিপ্পলফলরূপ অন্ন খাইতেছেন। অপর পক্ষীটী অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয় বলে বলীয়ান্।

মুক্তজীবঃ। ৭

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বানপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ।।

(ভাঃ ১১।১১।৭)

অপিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে ও অন্য পক্ষীটীকে জানেন না। পিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে বা অন্য পক্ষীটীকে জানেন। অপিপ্পলাদপক্ষী অবিদ্যাযুক্ত আছেন বলিয়া নিত্যবদ্ধ।

পিপ্পলাদ (পক্ষীটী) বিদ্যাময়; অতএব নিত্যমুক্ত। অপিপ্পলাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া পিপ্পলাদ পক্ষীও বিদ্যাযুক্ত হইলে মুক্ত হন; আর তাঁহার পিপ্পল ফল খাইতে হয় না। (অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না)।

জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ। ৮

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদ সৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্মাহম্।।

(ভাঃ ২।৯।৩২; চতুঃশ্লোকী ১)

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয়স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

ঋতেঽর্থং মৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি!
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।

(ভাঃ ২।৯।৩৩; চতুশ্লোকী ২)

পূর্ব্বশ্লোকে পরমতত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতরতত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করে, ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপতত্ত্ব হইতে ইতরতত্ত্বের নাম মায়া। সেই মায়াতত্ত্বের জ্ঞান এই শ্লোকে বিস্তৃত হইতেছে। স্বরূপ-তত্ত্বই অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীতি হয় এবং সেই স্বরূপ তত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুইটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতরবস্তু দুইরূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্যস্থানে পতিত হয়, তাহাকে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎ-স্বরূপের কিরণ-স্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বী আভাসরূপ মায়াবৈভব; ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদূরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব, এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই,—আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার

সম্বন্ধ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতর-স্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা 'মায়া' এবং আত্মস্বরূপ হইতে সুদূরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞান ও মায়া।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।

(ভাঃ ২।৯।৩৪; চতুঃশ্লোকী ৩)

যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপ আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ ভগবদ্‌রূপে নিত্য বিরাজমান ও ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য---ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশরূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূল জগৎকে প্রকাশ করতঃ তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূত অবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তিদ্বারা জগৎসৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণচিদ্‌বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। আবার চিদ্‌বিগ্রহের কিরণপরমাণু-স্বরূপ জীবগণ শুদ্ধপ্রেমমার্গে তাঁহার বিমলপ্রেম আস্বাদন করেন--ইহাই রহস্য।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্যয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।।

(ভাঃ ২।৯।৩৫; চতুঃশ্লোকী ৪)

যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু, তিনি অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য, প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্‌গুরু--চরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেকে অর্থাৎ বিধি-নিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।

অভিধেয়ম্। ৯

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।

(ভাঃ ১১।৩।২১)

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয়ঃ অবগত হইবার জন্য সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি 'শাব্দে' অর্থাৎ শাস্ত্রে পারঙ্গত এবং পরে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বে উপশমাশ্রিত হইয়াছেন, তিনিই সদ্‌গুরু। শাস্ত্রজ্ঞ ও শুদ্ধভক্তই সদ্‌গুরু। বিশেষ-রূপে জানিয়া সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চন বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।

(ভাঃ ৭।৫।২৩)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন--এই নবলক্ষণা ভক্তি।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুযাদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা-ভক্তি লাভ করতঃ হৃদ্‌রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা--সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

প্রয়োজনম্। ১০

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্।।

(ভাঃ ১১।৩।৩৭)

অঘ (পাপ) সমূহ-হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ

করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি সঞ্জাত প্রেমভক্তিদ্বারা উৎপুলকিত-তনু ধারণ করেন।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩৩)

শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া আসক্তি পর্য্যন্ত ভক্তি অভিধেয় তত্ত্বের অন্তর্গত। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির প্রথমোদয়। এস্থলে প্রেম ও ভাবের কথা কেবল অভিধেয়-পরিষ্কৃতির জন্য প্রদর্শিত হইল। এখন স্পষ্ট ভাবলক্ষণ বলিতেছেন। কৃষ্ণের সুভদ্র লীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও লৌকিক-চেষ্টা তথা--- সেই লীলাময় সুগীত 'মধুসূদন', 'মুরারি' প্রভৃতি নাম বিলজ্জভাবে গান করিতে করিতে সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন। এস্থলে স্বল্প হৃদয়বিকার ও পুলকাশ্রু হইয়া থাকে, কেননা ভাবই প্রেমের প্রথম ছবি।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি নিজ সৎকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না। যেহেতু তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্যদ্বারা পরিতুষ্ট হও।

চরিতামৃত-দশমূল

১। প্রমাণং বেদশাস্ত্রস্য

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪)

২। সম্বন্ধঃ কৃষ্ণঃ

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২১।৩৪)

৩। কৃষ্ণ-শক্তিঃ

কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন-প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি'-নাম।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।১৫০)

৪। রসঃ

কিম্বা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁ'র শক্তি তাঁ'র সহ হয় একরূপ।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৬)

৫। জীবঃ

বিভিন্নাংশ জীব--তাঁর শক্তিতে গণন।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯)

৬। বদ্ধজীবঃ

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া-তাঁর গলায় বান্ধিল।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।২৪)

৭। মুক্তিঃ

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়।।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪-১৫)

৮। জীবেশ্বর-মায়া-পরস্পর-সম্বন্ধঃ

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম।।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'।।

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৪, মঃ ২০।১০৮)

৯। অভিধেয়ম্।

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' জ্ঞান'-কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।
কৃষ্ণভক্তি-অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৮; মঃ ২২।৫)

১০। প্রয়োজনম্

এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হইতে 'প্রেমা' হয়।
সেই প্রেমা--'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম।।

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৯; মঃ ২৩।১৩)

ভগবানের স্বরূপ

ভগবানের নিত্য বিগ্রহই ভগবানের স্বরূপ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য—-এই ছয়টি ভগবানের স্বরূপ-গত গুণ। (১) জড়ীয় বস্তুতে যেমন গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব ভগবানে সে ভেদ নাই। তথাপি গুণ সমূহ যে গুণকর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, সেই গুণই প্রাধান্য লাভ করতঃ অন্য সমস্ত গুণের আধাররূপে প্রকাশ পায়। শ্রী অর্থাৎ শোভা যদিও গুণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তথাপি শ্রী-ই গুণের আধার বলিয়া পরিজ্ঞাত হ'ন। শ্রী-ই ভগবদ্বিগ্রহ-রূপিণী পরমা শক্তি। সেই বিগ্রহে যথা স্থানে অন্য গুণগণ ন্যস্ত থাকিয়া ভগবানের অখণ্ডত্ব, সর্বপ্রভুত্ব, অসীম বীর্য্য, অনন্ত যশঃ, সার্বজ্ঞ্য ও সর্ব বিধির বিধাতৃত্ব বিধান করিতেছেন। যাঁহারা ভগবানের নিত্য বিগ্রহ স্বীকার না করেন, তাঁহারা ভক্তিবৃত্তির নিত্যতা কখনই রক্ষা করিতে পারেন না। (২) অচিন্ত্য-বিগ্রহ ভগবান্ চিজ্জগতের সূর্যস্বরূপ প্রকাশমান এবং চন্দ্রস্বরূপ আনন্দ-বিধায়ক। বিগ্রহ বলিলেই যে জড়ীয় বিগ্রহ হইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। জড় জগতে যেমন জড়ীয় বিগ্রহদ্বারা ব্যক্তিগণের ভিন্নতা সম্পাদন করে, চিজ্জগতে তদ্রূপ চিদ্বিগ্রহদ্বারা ভগবান্ অন্য চিৎ হইতে পৃথক্ থাকেন। ভগবানের চিদ্বিগ্রহ সর্বচিত্তত্ত্বের পরমাকর্ষক ও অধিপতি। জড়জগতে বিশেষ বলিয়া যে ধর্ম আছে তাহা যে জড়জগতেই উৎপন্ন হইয়া জড়ের সহিত লয় পায়, এরূপ নয়। জড় যেমন চিত্তত্ত্বের প্রতিফলিত তত্ত্ববিশেষ, বিশেষ ধর্মও তদ্রূপ চিদগত ধর্ম। প্রতিফলিত জড়ে প্রতিফলিত ধর্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ তত্ত্ব যদি ভগবদ্গত তত্ত্ব না হইত, তাহা হইলে কিছুই সৃষ্টি হইত না এবং জীবও অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়ের বিচার করিত না। সেই চিদগত বিশেষ ধর্মদ্বারা পরমেশ্বরের শক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সমস্তই বিচিত্র হইয়াছে। ভগবদ্বপুসমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব হইতে পৃথক্ থাকিয়াও সর্বত্র অনুস্যূত আছে। এমন কি, বৈকুণ্ঠের

---

(১) ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়।

জ্ঞানবৈরাগায়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।। (বিষ্ণুপুরাণ)

(২) সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।

'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে।। (--মহাপ্রভুবাক্য, চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম)

প্রতিফলনরূপ জড়জগতে ও সর্বত্র পূর্ণরূপে যুগপৎ অবস্থিত। অতএব ভগবৎ-স্বরূপবিগ্রহ অলৌকিক ও অচিন্ত্য। (৩) সেই স্বরূপ সূর্য্যের গুণ কিরণরূপ ব্রহ্ম অনন্ত জগতের জীবনস্বরূপে বর্তমান আছেন। পরমাত্মা সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগতের নিয়ামক হইয়া বর্তমান। ব্রহ্ম-পরমাত্মরূপে সর্বব্যাপী হইয়াও ভগবৎ স্বরূপ নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ লীলাবিগ্রহ-বিশেষ। ঐশ্বর্য্যপ্রধান প্রকাশে ঐ বিগ্রহের এক প্রকার মূর্তি হয়। সেই মূর্তি অনন্ত মূর্তিরূপে ভিন্নভিন্ন লীলার আশ্রয়। মাধুর্য্যপ্রধান প্রকাশে ঐ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপে চিদ্বিলাসসমূহের অনন্ত-অন্তরঙ্গ প্রভাব ক্রমে নিত্য ব্রজলীলাপরায়ণ। (৪) রসতত্ত্ব যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাঁহারই সম্বন্ধে সেই লীলা অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। সেই স্বরূপের অবস্থান ও কোন চিন্ময় ধাম ও উপকরণ ও চিন্ময় কাল ও লিঙ্গসকল আছে। তত্ত্বরসগত ব্যক্তিদিগের নিকটেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সেই স্বরূপ, তাঁহার অবস্থান, তাঁহার উপকরণ, তাঁহার সঙ্গীও তাঁহার বিলাস সমস্তই চিন্ময়, নিত্য পরম উপাদেয়, নির্দোষ ও সমস্ত বিশুদ্ধ জৈব আশার এক মাত্র নিলয়।

---

(৩) সর্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাম্।। (ভাঃ ১০।১৪।৫৭)

(৪) যন্মর্ত্যলীলৌপিয়কং স্বযোগ মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম।। (ভাঃ ৩।২।১২)

ঈশ্বর, জীব ও মায়া

"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।।
জীবতত্ত্ব-শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব-শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ।।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১১৬-১১৭)

ঈশ্বরের তত্ত্বকে জ্বলিত জ্বলনের সহিত তুলনা করিলে, অনন্ত জীবগণকে তাঁহার স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ তুলনা করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর চিন্ময়, অসীম, জ্বলিত অগ্নিবিশেষ। অনন্ত জীব সকল তাঁহা হইতে স্ফুলিঙ্গের কণাস্বরূপ পৃথকতত্ত্ব হইয়া নিঃসৃত হইয়াছে। এস্থলে জীবের স্বরূপ গঠনে মায়ার কোন ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ কোন প্রাকৃত ব্যাপার নাই। যদি বল, এরূপ চিৎকণগঠনের প্রয়োজন কি? তবে শুন, ঈশ্বরের বিচিত্র স্বরূপশক্তির দুই প্রকার প্রবৃত্তি অসীম ক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে ঈশ্বর স্বরূপ ও চিজ্জগদ্রূপ তত্ত্ব বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, এই প্রবৃত্তিকেই 'চিচ্ছক্তি' বলে। অণুক্রিয়াপ্রবৃত্তি হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্তজীব; এই প্রবৃত্তিকেই 'জীবশক্তি' বলে। স্বরূপশক্তির যদি এই উভয় বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হইত। পূর্ণৈশ্বর্য্য ভগবানের শক্তিগত অণুক্রিয়ারূপ জীবের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাব্য ও অপরিহার্য্য। অতএব জীবতত্ত্ব হইতেই কৃষ্ণতত্ত্বে শক্তি মত্তা (বিলাস)। জীবতত্ত্ব না থাকিলে কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তিমত্তা স্বীকৃত হইত না। ঈশিতব্যের অভাবে ঈশিতার অভাব হয়।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।। (গীতা ৭।৪)

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত রূপ স্থূল জগৎ; মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-রূপ লিঙ্গ জগৎ। এই অষ্টপ্রকারে প্রকৃতি -'অপরা' বা জড়া; ইহার নাম 'মায়া প্রকৃতি।' ইহা হইতে পৃথক ভগবানের আর একটী 'পরা প্রকৃতি' আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ। তাৎপর্য্য এই যে,ভগবান্ই একমাত্র বস্তু। তাঁহার একটী 'স্বরূপ' বা আত্মা'-শক্তি আছে। সেই

স্বরূপশক্তি হইতে পৃথক্ প্রায়, অথচ তাহার ছায়ার ন্যায় যে শক্তি প্রতীয়মান হয়; তাহার নাম 'মায়াশক্তি'। স্থূল ও লিঙ্গময় জড়ব্রহ্মাণ্ড-সেই মায়া প্রসূত। তাহার অতীত জীবতত্ত্ব। জীবের শুদ্ধসত্তা, শুদ্ধ অহঙ্কার ও মনোবৃত্তি, সমস্তই মায়ার অতীত কোন পরাশক্তি গঠিত, অতএব 'জীব'-নির্মাণ-কার্য্যে মায়ার কোন অধিকার ছিল না। মায়াপ্রবিষ্ট হইয়া জীবের যে জড় ভাবান্বিত অণুবুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রতীত হইতেছে, তাহাই কেবল মায়ার কার্য্য। এই মায়া-সম্বন্ধ হইতে পরিষ্কৃত হইয়া স্ব-স্বরূপে জীবের অবস্থানকে 'মুক্তি' বলে। মুক্তি হইলে মায়া-নির্মিত অহঙ্কার পর্য্যন্ত থাকে না; কিন্তু জীবের স্বতঃসিদ্ধ যে সকল চিন্ময়ী বৃত্তি আছে, উহারা শুদ্ধরূপে কার্য্য করিতে পারিবে। অতএব জীব--ভগবানের একটী শক্তিবিশেষ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।

(গীতা ৭।৫)

(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন--) এতদ্ব্যতীত আমার একটা তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে পরা প্রকৃতি বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে; আমার অন্তরঙ্গা শক্তিনিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা শক্তিনিঃসৃত এই জড়জগৎ, উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীব শক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা যায়।

জীবের স্বতন্ত্রতা কেন?

ইতরানুরক্তির দ্বারা জীবের ক্লেশ। কিন্তু পরমেশ্বর পরম কারুণিক, তবে তিনি জীবদিগকে ইতরানুরাগ হইতে রক্ষা কেন না করিলেন, এরূপ পূর্বপক্ষ হইবার সম্ভাবনা। জীবদিগকে যদ্যপি জড়ের ন্যায় স্বীয় নিয়মাধীন করিতেন তাহা হইলে জীবের উৎকর্ষ সাধন কিরূপে হইত? স্বাধীন কার্য্যের ফলই উন্নতি বা অবনতি। উন্নত করিবার ইচছায় জীবের স্বভাব স্বতন্ত্র করিলেন। যে সকল জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত স্বীয় স্বধর্মরূপ ঈশ্বরানুরক্তি পরিত্যাগপূর্বক ইতরানুরক্তির দ্বারা ভোগেচ্ছা করিলেন, তাঁহারা স্বীয় কামনাবশতঃ জড়তায় বদ্ধ হইয়া জড়সুখকে ভোগ করিতেছেন অর্থাৎ পরমানন্দরূপ প্রেমামৃত হইতে বঞ্চিৎ হইয়া বদ্ধ আছেন। তথা হি মুণ্ডকোপনিষদি ঃ—

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চকামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞো হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ।।

তথা হি চতুর্থ-মুণ্ডকে---

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
সকামভির্গায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইবৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ।।

এই প্রকার স্বাধীনতার অসদ্বাবহারে জীবের যে কষ্ট, তাহা ঈশ্বরদত্ত কহা যায় না এবং ঈশ্বরকে তজ্জন্য কোন প্রকার দোষ দেওয়া যায় না। বিধিলঙঘনের দ্বারা যে ক্লেশ পাইতে হয়, তজ্জন্য বিধাতা কখনই দোষী নহেন। বিধাতা যদি জীবকে ঐ অনর্থগ্রহণে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত। জীব যদি নিজ স্বাধীনতার দ্বারা স্বীয় পরানুরাগকে আরও দৃঢ় করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উৎকর্ষ হইত; কিন্তু স্বাধীনতা না পাইলে তাঁহার উৎকর্ষের উপর কোন অধিকার হইত না। পরমেশ্বর জীবকে এরূপ অপূর্ব স্বাধীনতা দেওয়ায়

জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বলিতে হইবে। স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারে যে পতন দৃষ্ট হয় তাহা কেবল জীবকে সংস্কার করত উদ্ধার করিবার জন্যই হইয়াছে, ইহা বলিতে হইবে। ঈশ্বরের দণ্ডবিধিই যে কারুণ্যের ফল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে (৩৪ শ্লোকে) নাগপত্নীগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে,—

"অনুগ্রহোঽয়ং ভবতা কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশুকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ।।"

(নাগপত্নীগণ স্তব করিতেছে,—হে কৃষ্ণ!) যেহেতু আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপনাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য আপনি দণ্ডরূপে আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পাপনাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহ মনে করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে জীব-তত্ত্ব

গৌড়রাষ্ট্রসচীবত্বং হিত্বা গৌরপদাশ্রয়াৎ।
সনাতনং নুমস্তং যো জীবতত্ত্বমশিক্ষয়ৎ।।

পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণ রূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ দেহাত্মাভিমানজনিত ভয় হইয়াছে। জীব কৃষ্ণ মায়ায় বদ্ধ। অতএব গুরুচরণাশ্রয়পূর্বক পণ্ডিত ব্যক্তি অনন্যভক্তি সহকারে সেই কৃষ্ণকে ভজন করিলে মায়া পার হন। (প্রমাণ-ভাঃ ১১।২।৩৭)

ভগবান্ কহিলেন,—"হে উদ্ধব! হে মহামতি! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদিবিদ্যাকর্তৃক মুক্ত হন। এস্থলে অংশশব্দের তাৎপর্য জানা আবশ্যক। ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু, অতএব কাষ্ঠ-পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে অংশ করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তু খর্ব হয়। অতএব এক দীপ হইতে বহুদীপ জ্বালিত হয় যেরূপ, সেরূপ অংশ কথঞ্চিত স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিক মাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুইপ্রকার; একপ্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব মহাদীপের সর্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশ লক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্রমণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না। কিছু কিছু তদ্ধর্ম অণুঅংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়। স্ব-স্ব কার্যের দায়িকতা ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ - শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম পায় না। জীব বিভিন্নাংশ (প্রমাণ-ভাঃ ১১।১১।৪)

কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"গুণীদিগের মধ্যে আমি সূত্ররূপী প্রধান বৃহৎদিগের মধ্যে আমি মহত্তত্ত্ব। সূক্ষ্মদিগের মধ্যে আমি জীব এবং দুর্জয়দিগের মধ্যে আমি মন। এস্থলে জীব যে সূক্ষ্ম চিৎকণ, তাহা জানা গেল। (প্রমাণ--ভাঃ ১১।১৬।১১)

ভগবান্ ও ভগবানের স্বাংশ অবতার বর্ণন করিয়া সূত কহিলেন যে, এতদতিরিক্ত আর একটি তত্ত্ব আছে, তাহার নাম জীব। তিনি জড়েন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া তাহা জড়জগদ্ব্যাপারে অব্যক্ত। তিনি জড়েন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া অদৃষ্ট ও অশ্রুত। তন্নিবন্ধন অব্যূঢ়-গুণ-বৃংহিত সেই জীবেরই পুনঃ পুনঃ দেহান্তর হয়। তিনি চিৎকণ বলিয়া অপ্রশস্ত অর্থাৎ ক্ষীণ। তদনুযায়ী শক্তিদ্বারা কিঞ্চিদুপলব্ধ বা পুষ্ট। (প্রমাণ--ভাঃ ১।৩।৩২)

পিপ্পল্লায়ন কহিলেন যে, আত্মা দুই প্রকার অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা। উভয় আত্মারই এক লক্ষণ। ভেদ এই যে, পরমাত্মা বিভুত্বপ্রযুক্ত সক্ষম এবং জীবাত্মা অণুত্বপ্রযুক্ত অক্ষম; সুতরাং জীব শক্ত্যন্তর দ্বারা চালিতব্য। আত্মার সাধারণ লক্ষণ এই যে, আত্মার ক্ষয়, জন্ম নাই। আত্মা মরেন না, আত্মা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, আত্মার ক্ষয় নাই; জন্ম নাই। আগমাপায়ী ব্যভিচারী বস্তুসম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ কালজ্ঞ, ইন্দ্রিয়বলে চালিত হইয়া প্রাণ পৃথক থাকে, তদ্রূপ আত্মা সৎ, জ্ঞানমাত্র এবং সর্বত্র অনপায়ী। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা অজ, অমর, বৃদ্ধি-ক্ষয় শূন্য, কালজ্ঞ, যে আধারে থাকেন তাহার সর্বত্র সর্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত এবং উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। (প্রমাণ-ভাঃ ১১।৩।৩৮)

প্রহ্লাদ কহিলেন,---'আত্মা' নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত। পণ্ডিত লোক এই দ্বাদশ আত্মলক্ষণ দ্বারা আত্মাকে নির্দেশ করিয়া এই জড় দেহাদিতে 'অহং'-'মম'রূপমোহজ অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন। (ভাঃ ৭।৭।১৯-২০)

প্রহ্লাদ কহিলেন---স্বর্ণ-বিষয়ে পণ্ডিত হেমকার যেরূপ পাষাণক্ষেত্রে নিহিত স্বর্ণকণসকল দ্রব্য ও ক্রিয়াযোগে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি আত্মপ্রাপ্তির যোগদ্বারা দেহে---ক্ষেত্রে নিহিত চিৎকণকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন, এবং পরমাত্ম-গতি লাভ করেন। (প্রমাণ ভাঃ ৭।৭।২১)

জঙ্গম ও স্থাবররূপ দুই প্রকার সর্বসংঘাত সর্বমিলিত দেহে কোন্ অংশ আত্মা নন্ ও কোন্ অংশ আত্মা, ইহা বিচক্ষণপূর্ব্বক অতৎ ত্যাগ করিয়া আত্মপুরুষকে অন্বেষণ করিবে। (ভাঃ ৭।৭।২৩)

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি বুদ্ধির বৃত্তি। সেই বৃত্তিগুলিকে যিনি অনুভব করেন, তিনি প্রকৃতির পরতত্ত্বস্বরূপ অধ্যক্ষ আত্ম-রূপ পুরুষ। (ভাঃ ৭।৭।২৫)

(ভগবৎপাদপদ্মে শ্রুতিগণের স্তুতি--) স্বীয় কর্মদ্বারা লব্ধ শরীরে স্থিত, (কিন্তু স্বরূপতঃ) ভিতরে ও বাহিরে আবরণশূন্য জীব-পুরুষকে--অখিলশক্তিধারী যে তুমি, তোমার অংশ বলিয়া বলেন। এইরূপ নৃগতি বিচারপূর্বক কবিগণ শ্রদ্ধাপূর্বক তোমার চরণ উপাসনারূপ ভক্তিকে নিগমোক্ত নিত্যকর্ম বলিয়া স্থির করেন। 'ভিতরে আবরণশূন্য' এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক গতিতে তোমার অসীম চিজ্জগৎ। 'বাহিরে আবরণশূন্য' শব্দের তাৎপর্য এই যে, পরাক্‌গতিতে সম্মুখে অসীম মায়িক বিশ্ব। ভাঃ ১০।৮৭।২০)

(দেবাহূতির নিকটে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব) তাহার প্রকরণ বলিতেছেন। জীবাত্মার স্থিতি এইরূপ। জড়-জগৎ সম্বন্ধে পূর্বশ্লোকে দর্শিত হইয়াছে যে, যেরূপ পুত্র-বিত্তাদি হইতে মর্ত্য জীব পৃথক্ প্রতীত হয়, আত্মা বলিয়া যে পুরুষটি আছেন তিনি দেহাদি হইতে (তদ্রূপ) পৃথক্। এখানে দর্শিত হইতেছে যে, উল্মুক অর্থাৎ জ্বলৎকাষ্ঠ--তাহা হইতে যে অগ্নি কণ বাহির হয় সে-সব বিস্ফুলিঙ্গ এবং তাহা হইতে যে ধূম বাহির হয় তাহা তমঃ-বিশেষ। যাহাকে জীবাত্মা বলা যায়, তিনি বিস্ফুলিঙ্গস্থলীয়--উল্মুক হইতে পৃথক্ অগ্নিবিশেষ। জীব যে, চিৎসূর্যরূপ কৃষ্ণের রশ্মিস্থানীয় কিরণকণ, তাহা বেদ-পুরাণে নিশ্চিত হইয়াছে। চিৎকণত্বে ঈশ্বর হইতে নিত্যভেদ এবং চিদ্ধর্মত্বে ঈশ্বরের সহিত নিত্য অভেদ। জীব ঈশ্বর-শক্তিবিশেষ। শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। অতএব জীব ও ঈশ্বরে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধ। (ভাঃ ৩।২৮।৪০) ভগবান্ হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ-প্রদর্শনার্থ তিনি স্বীয় স্বরূপ (পৃথুকে) বলিতেছেন।

১। তিনি (ভগবান্) এক, জীব কিন্তু অনেক।

২। তিনি নিত্য শুদ্ধ, কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য।

৩। তিনি নিত্য নির্মলজ্যোতি, জীব স্বরূপভ্রমক্রমে মলিন হয়।

৪। তিনি নির্গুণ--কখনও প্রাকৃতগুণ-সঙ্গ করেন না, জীব বাসনাদোষে প্রাকৃতগুণে আবদ্ধপ্রায় হইয়া পড়েন।

৫। তিনি অপ্রাকৃত গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃতগুণাভিমানী হইতে পারেন।

৬। তিনি সর্বগ, জীব স্বরূপতঃ অণু।

৭। তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাত্ম--জড়াসক্তিশূন্য; জীব জড়াসক্তিতে আবদ্ধ হন।

৮। তিনি অন্তর-রহিত আত্মা, জীব তদাত্মক।

৯। তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাঁহার বশীভূত। এই নয়টি জীবেশ্বরের বৈলক্ষণ্য। (ভাঃ ৪।২০।৭)

(গজেন্দ্র ভগবৎস্তুতিতে বলিতেছেন) অগ্নি হইতে অর্চি সকল এবং সূর্য হইতে গভস্তি অর্থাৎ কিরণসমূহ বাহির হয়, এবং স্বীয় তেজসকল পুনঃ প্রবেশ করে, সেইরূপ কৃষ্ণ হইতে জীবসমূহ, গুণসংপ্রবাহরূপা জড়া প্রকৃতি, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সকল এবং শরীরসর্গ নিরন্তর বাহির হয় ও ভিতরে প্রবেশ করে। (ভা ৮।৩।২৩)

সুতরাং ভূতেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান ও সর্বোপরি জীবতত্ত্ব হইতে আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর পৃথক্ দ্রষ্টা-স্বরূপ ভগবান্ ও ব্রহ্মরূপ বৃহদ্বস্তু। (ভাঃ ৩।২৮।৪১—দেবহূতির প্রতি ভগবদুক্তি)

এবম্ভূত চিৎকণস্বরূপ জীব কিরূপে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা বলিতেছেন। সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণের দ্বারা বিচিত্র-স্বরূপ প্রজাসৃষ্টিকারিণী মায়া প্রকৃতিকে দেখিয়া জীবের মোহ হয়। তখন মায়ার জ্ঞান-আবরিকা শক্তি অবিদ্যা তাহার স্বরূপভ্রম উদয় করে। ভগবদনুবৃত্তিই জীবের স্বরূপধর্ম। তাহা ভুলিয়া মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ইহাই জীবের বন্ধনের হেতু। (ভাঃ ৩।২৬।৫)

দেহাত্মাভিমানদ্বারা আত্মানুস্মৃতি বিলুপ্তপ্রায় থাকে, আবার ইন্দ্রিয়গণ স্থগিত হইলে অভিমান বিনষ্ট হয়, তখন লিঙ্গ শরীরের আশ্রয়-অভাবে অহমিকা-বুদ্ধি লোপ পায়, এবং কূটস্থ আত্মানুস্মৃতি উদয় হয়। তাহার একটি ঐকান্তিক দৃষ্টান্ত এই যে,---অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ ও স্বেদজ চারি প্রকার দেহপ্রাপ্তি। জীব যে দেহে গমন করেন, প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহে ধাবিত হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয়-বিরাম, অভিমান-শূন্যতা-লিঙ্গভঙ্গের সহিত আত্মানুস্মৃতি স্পষ্ট হইতে থাকে। (ভাঃ ১১।৩।৩৯)--নিমিরাজ প্রতি পিপ্পলায়ন ঋষির উক্তি)

সৎ---লিঙ্গ দেহ এবং অসৎ--স্থূল দেহ। এই দুই দেহ অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে কৃত হইয়াছে। চিদ্রূপগত সম্বিদ্দ্বারা যখন এই উভয় দেহই আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ব্রহ্মদর্শন লাভ করেন। (ভা ১।৩।৩৩---শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি সূত গোস্বামীর উক্তি।)

পিপ্পলায়ন নিমি মহারাজকে বলিয়াছেন (১১।৩।৩৪)---মায়িক বিষয়ে বৈশারদী মতি যে অবিদ্যা তাহা যখন উপরত হন, তখনই জীব আপনাকে সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং স্বীয় চিন্মহিমায় মহীয়ান্ হন।

এখন এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন সকল ক্ষেত্রে জীবের সহিত ভগবান্ অবস্থিত, তখন জীবের দূর্ভগত্ব এবং কর্ম-ক্লেশ কি কারণে হয়? (ভাঃ ৩।৭।৬)

তাহার উত্তর এই মাত্র। ভগবন্মায়া অঘটনঘটন পটিয়সী শক্তিবিশেষ। বিমুক্ত ঈশ্বরের কার্পণ্য এবং জীবের বন্ধন সেই মায়া হইতে হয়। একথা যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারিবে না। অচিন্ত্যভাববিষয়ে 'তর্কের' যোজনা সম্ভব নয়। ভগবদ্-চিন্তাশক্তির দ্বারা জীবের মায়ার প্রতি মোহ এবং ভগবানের তাঁহাতে অনুগ্রহাভাব। (ভা ৩।৭।৯)

বস্তুতঃ জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে লিঙ্গ-শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহাই বন্ধন। সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্মবিপর্যয় অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম কেবল অর্থ বিনা অর্থদর্শন মাত্র। স্বশির-ছেদনাদির ন্যায় ভ্রম মাত্র।

জলে প্রতিভাত চন্দ্রের কম্পাদি জলকৃত গুণমাত্র। চন্দ্রে কম্পনাদি নাই। না ঘটিয়াও, চন্দ্রকম্প বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ দ্রষ্টা জীবের আত্মায় যে, অনাত্মিক-গুণ-আরোপ, তাহা মিথ্যা; এইরূপ বিবর্তধর্মেই জীবের অমঙ্গল। "অতত্ত্বতোহন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।" যাহা ঘটে নাই, তাহাকে ঘটিয়াছে বলিয়া যে মিথ্যা বুদ্ধি তাহাই বিবর্ত। রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং শুক্তিতে রজতভ্রম এই সকল বিবর্তের উদাহরণ। (ভাঃ ৩।৭।১০-১১)

এইরূপ লব্ধজন্মা জীব বস্তুতঃ নিত্য ও নিরহঙ্কৃত হইলেও যে পর্যন্ত যে শরীরে থাকেন, সেই পর্যন্ত তাঁহার সেই শরীরে আরোপিত সত্তা। (ভাঃ ৬।১৬।৮)

গুণভাবিত কর্মদ্বারা দৈবাধীনে প্রাপ্ত শরীরে মূঢ় অবিদ্যা-দুষ্ট জীব বর্তমান থাকিয়া 'আমি কর্তা' এই বলিয়া বদ্ধ থাকে। (ভাঃ ১১।১১।১০)

এই প্রকারে আত্মা হইতে অপরা যে প্রকৃতি, তাহার অভিধ্যানদ্বারা তাহার গুণকৃত-কর্মে আপনার কর্তৃত্বাভিমান করে। (ভাঃ ৩।২৬।৬)

জীব বস্তুতঃ অকর্তা, মায়ার অপরাধীন, সাক্ষী, স্বয়ং কৃষ্ণদাসস্বভাব-প্রযুক্ত বদ্ধতা স্বীকার করে। ইহার নামই জীবের সংসার-বন্ধ। ইহাতে পরমেশ্বরের বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই। (ভাঃ ৩।২৬।৭)

এইরূপ ঘটিয়াছে, প্রকৃতিই কার্য-কর্তৃত্বের কারণ। প্রকৃতি হইতে নিতান্ত পৃথক্ হইয়াও পুরুষ বিবর্তাশ্রয়ে সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইয়াছেন। (ভাঃ ৩।২৬।৮)

নারদ চরিত্রে জীবের প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। (শ্রীনারদ বলিতেছেন,--) হে ব্যাস, যখন ভগবদনুগ্রহে প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্ত হইল, তখন আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পৃথক্ হইয়া নিপাতিত হইল। আমাতে সেই ভাগবতী তনু প্রযুক্ত হইল। আমি অস্কন্দিতব্রত (অস্খলিতব্রহ্মচর্য) হইয়া ত্রিলোকের অন্তর্বহির্ভাগে পর্যটন করি। ভগবদ্দত্ত-স্বরব্রহ্ম-বিভূষিত এই বীণাটীতে মূর্চ্ছনা দিয়া হরিকথা গান করিতে করিতে ভ্রমণ করি। (ভাঃ ১।৬।২৯-৩০)

পরব্যোমে যে সকল নিত্যমুক্ত জীব আছেন, তাঁহদের বর্ণনা এইরূপ,--তাঁহারা শ্যামবর্ণ, নির্মল, পদ্মচক্ষু, পিশঙ্গ (পিঙ্গলবর্ণ) বস্ত্রযুক্ত, সুন্দর, মধুরভাষী, সকলেই চতুর্বাহুবিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট-মণিসমূহদ্বারা মণ্ডিত এবং তাঁহারা সুন্দর জ্যোতি বিস্তার করেন। ঐশ্বর্যপ্রধান নিত্যশুদ্ধ জীবগণের চিন্ময় স্বরূপদেহ এইরূপ। মাধুর্যপ্রধান নিত্য জীবগণ গোলোক-ব্রজে এতদপেক্ষা অধিক মাধুর্যের সহিত প্রকাশ পান। (ভাঃ ২।৯।১১)

যখন কৃষ্ণচরণৈষণারূপ শুদ্ধভক্তিদ্বারা চিত্ত গুণকর্মজনিত মলসমূহ ধ্বংস করে, সেই সময়ে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অমলদৃক্ পুরুষের নিকট নির্মল সূর্য-প্রকাশের ন্যায় সমুদিত হয়। (ভাঃ ১১।৩। ৪০)

নিবৃত্তিধর্ম, কৃষ্ণানুকম্পা এবং শুদ্ধাভক্তিযোগদ্বারা সে অবিদ্যা-অভিনিবেশ ক্রমে তিরোহিত হয়। তাৎপর্য এই যে, শরীরযাত্রায় সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করতঃ ক্রমে ক্রমে রাজস ও তামস স্বভাব ও ধর্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধভক্তি-যোগদ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নির্গুণ-করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তিসাধন যত নির্মল হয়, ততই কৃষ্ণানুকম্পা উদয় হয়। তবেই অবিদ্যার বল ক্ষয় হয় এবং বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূর উদয় হয়। (ভাঃ ৩।৭।১২)

যে সময়ে ইন্দ্রিয়োপরতি স্বভাবতঃ হয়, তখন সংসুপ্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইলে, মিথ্যা স্বপ্নভয় সম্পূর্ণরূপে যায়, সেইরূপ সহজেই হরিতে দৃষ্টি পড়ে এবং তন্নিবন্ধন সকল ক্লেশ বিলয়প্রাপ্ত হয়। (ভাঃ ৩।৭।১৩)

হরিগুণানুবাদ শ্রদ্ধাপূর্বক শুনিতে শুনিতে অশেষ ক্লেশের উপশম হয়। তাঁহার চরণারবিন্দ-পরাগ-সম্বন্ধে আত্মলব্ধ রতি হইলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব? (ভাঃ ৩।৭।২৪)

জীব-সম্বন্ধে যাহা আলোচনা হইল, তাহাতে দেখা গেল যে, কৃষ্ণ অখিলগুণ ও শক্তিসম্পন্ন বিভুচৈতন্য। কৃষ্ণের জীবশক্তিদ্বারা জীব অণুচৈতন্যরূপে পরিণত। জীবের স্বগঠনে মায়াশক্তির কোন ক্রিয়া নাই। অণুধর্মপ্রযুক্ত জীব কৃষ্ণবহির্মুখ হইলে মায়াবদ্ধ হইবার যোগ্য। যদৃচ্ছাক্রমে মায়াবদ্ধ জীবধর্ম-অনুসারে দেহাত্মাভিমানপ্রযুক্তসংসার স্বীকার করেন। সুকৃতিক্রমে পুনরায় কৃষ্ণভক্তিদ্বারা স্বস্থ হন।

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে শক্তিপরিণামবাদ

অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং যৎ সুরয়ো ভাগবতং বদন্তি।।

(ভাঃ ৩।৪।১৩)

ভেদাভেদামচিন্ত্যং মন্মতবাদনিবর্তনম্।
গৌরাজ্ঞয়োদ্ধৃতং যেন নৌমি গোপালভট্টকম্।।

(ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন--) পুরাকালে পাদ্মকল্পে আদিসর্গে ব্রহ্মা আমার নাভিপদ্মে নিষণ্ণ (অবস্থিত) হইলে আমার মহিমাপ্রকাশক পরম জ্ঞান তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। সেই জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলেন। চতুঃশ্লোকীতে যে শক্তিপরিণামাত্মক অচিন্ত্য-ভেদাভেদ (সিদ্ধান্ত) শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাই ভাগবত।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।

(ভাঃ ২।৯।৩০)

অদ্বয়জ্ঞানই পরমতত্ত্ব। ভগবান্ কহিলেন,---হে ব্রহ্মন্! আমার জ্ঞান অদ্বয় ও পরমগুহ্য। তাহা অদ্বয় হইয়াও নিত্যই চারিটী ভেদযুক্ত--জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ। তাহা জীববুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবে না, আমার অনুগ্রহে তাহার উপলব্ধি কর। জ্ঞান আমার স্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তিসম্বন্ধ, জীব আমার রহস্য, প্রধান আমার জ্ঞানাঙ্গ। এই চারিটী তত্ত্বের নিত্য অদ্বয়তা ও নিত্য-রহস্য-গত ভেদ আমার অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

(ভাঃ ২।৯।৩১)

আমি স্বরূপতঃ যে রূপ, আমার ভাব যে প্রকার, আমার চিদচিৎ-ভেদে গুণ-কর্ম, আমার তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি বুঝিয়া লও।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্‌ ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্‌।।

(ভাঃ ২।৯।৩২)

এই শ্লোক হইতে চারিটি শ্লোকে চারিটি তত্ত্বের ভেদ দেখাইতেছেন। ইহার নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত। পরম নিত্য আমি এক অদ্বয়তত্ত্ব। প্রথমে আমিই ছিলাম। আর কিছুই ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমাপায়ী অবস্থা এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অন্বয়-সম্বন্ধ এই দুই ক্রিয়া যাহা সৃষ্টিতে উদয় হইয়াছে, তাহাও আমি। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্যের যেমন কিরণ, সর্বভূত আমার সেইরূপ শক্তিপরিণাম; আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার অক্ষয় শক্তি চিন্তামণির স্বর্ণ-প্রসবের ন্যায় স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথক্‌তা হইলেও আমি সর্বস্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ-পরিচয়। আবার প্রলয়ে আমি অবশিষ্ট একই থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ---এই সকল নামের বিবাদ মাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে তাহা আমার অচিন্ত্য-শক্তিপরিণাম-রূপ নিত্য-ভেদাভেদজ্ঞান। ইহাই সর্ববেদ-বাক্য ও মহাবাক্য সম্মত।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।

(ভাঃ ২। ৯।৩৩)

মতবাদিগণ আমার অচিন্ত্য-শক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে 'অস্তি' 'নাস্তি' ইত্যাদি নানা প্রকার জল্পনা করে। সেও আমার প্রভাব। এক পরা শক্তি মায়াই আমার অচিন্ত্য-শক্তি। তাহাতে দুইটি অবস্থা আছে অর্থাৎ স্বরূপ-অবস্থা ও তটস্থা-অবস্থা। জগৎ-সৃষ্টিতে তটস্থা অবস্থাই অণু ও ছায়ারূপে দ্বি-প্রকার। অণু তটস্থা শক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে জীবশক্তি বলিয়াছেন, তথাপি তাহাকে আমি পরা প্রকৃতি বলি। ছায়া তটস্থা শক্তি অচিন্মায়াশক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম বহিরঙ্গা শক্তি। চিদ্ধর্মাদি-প্রকাশক স্বরূপশক্তিকে চিৎশক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি বলে। মায়া বলিলে প্রধানতঃ আমার পরা শক্তিকে বুঝায়। এই মায়িক সংসারে স্বরূপ শক্তির পরিযয় গূঢ় এবং অচিন্মায়াশক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত

বলিয়া মায়া বলিলে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া তটস্থাকেই বুঝায়। আমি মূল মায়াশক্তি তোমাকে বুঝাইতেছি। আমি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা--পুরুষ। বিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি ও অর্থ--তিন প্রকার তত্ত্ব-বিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়্‌বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই অর্থ বলি। অর্থকে ছাড়িয়া দিলে যাহা আমা হইতে পৃথক্ চিন্ত্যনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ-প্রতীতি হয় না, তাহাই মায়া। আত্মা-বস্তু এবং মায়া--ছায়া, আর যতগুলি তত্ত্ব আছে সকলই বস্তুপ্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নয়--বস্তু যে আত্মা, তাহার শক্তিমাত্র। বস্তুমধ্যে ইহার দুইপ্রকার পরিচয়। 'আভাস' ইহার প্রথম পরিচয় এবং 'তমঃ' ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই 'আভাস'-পরিচয়। চিৎ-শক্তি অণু-তটস্থ-অবস্থায় 'আভাস'-রূপ জীব, সুতরাং তাঁহার চিৎ-পরিচয়। অচিন্মায়ায় 'তমঃ'-পরিচয়, তাহাতে জড় জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া পরব্রহ্ম স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেধনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষূন বতম্বহম্।।

(ভাঃ ১।৯।৩৪)

এখন রহস্য-তত্ত্ব শুন। এ জড় জগৎ মিথ্যা নয়; আমার শক্তি-পরিণতি এবং আমি সৎ-রূপে তাহার অন্তরে আছি বলিয়া সত্য। সত্য হইলেও ইহার আগমাপায়ী প্রকাশ নশ্বর। এই জগতে মহাভূতসকল উচ্চাবচ-ভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও মহাভূতরূপে অপ্রবিষ্ট। সেইরূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে স্বস্বরূপে পূর্ণরূপে আছি। আবার জীবশক্তি-পরিণতি জীবসকল স্বভাবতঃ আমার প্রণতঃ দাস। তাহাদের ভিতরে পরমাত্মরূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমার চিদ্ধামে প্রাপ্তপ্রেম জীবসমূহ লইয়া আমার নিরন্তর লীলা।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।

(ভাঃ ২।৯।৩৫)

এখন দেখ আমি স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবভাসিত হইয়াও নিত্য অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব। মায়াবদ্ধ জীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কত প্রকার বিতর্ক করে। তাহাদের কর্তব্য এই যে, আমার কৃপাপ্রাপ্ত শাস্ত্রাভিধেয়

অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি-নিষেধ অথবা বিধি-রাগ-ভেদ অনুসারে সদ্গুরু-চরণে জিজ্ঞাসাদ্বারা সর্বদা সর্বত্র সত্য বলিয়া স্থির করিয়া তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

প্রাপঞ্চিক-জগতঃ মায়াশক্তিপরিণামত্বং দর্শিতম্ ব্রহ্মা নারদং (ভাগবত ২।৫।২২-২৯)—

কাল্যদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠতাদভূৎ।।
মহতস্তু বিকুর্বাণাদ্রজঃসত্ত্বোপবৃহংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ।।
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্বন্ সমভূৎ ত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো।।
তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ।।
নভসোঽথ বিকুর্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।
বায়োরপি বিকুর্বাণাৎ কালকর্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ।।
তেজসস্তু বিকুর্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ।।
বিশেষস্তু বিকুর্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপ গুণান্বিতঃ।।

প্রাপঞ্চিক জগৎ মায়াশক্তি-পরিণাম, তাহা দেখাইতেছেন। (ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন--) মায়ান্তর্গত কালশক্তির ব্যতিকরই মায়ার স্বভাবতঃ পরিণাম। পুরুষাধিষ্ঠিত মহত্তত্ত্ব হইতে কর্মের জন্ম। মহত্তত্ত্ব পরিণত হইয়া রজঃ-সত্ত্বদ্বারা উপবৃংহিত হয়। তমঃপ্রধান হইয়া দ্রব্যজ্ঞান-ক্রিয়া স্বরূপ লাভ করে। তাহার

নাম অহঙ্কার। তাহা পরিণত হইয়া বৈকারিক, তৈজস, তামস-ভেদে তিন প্রকার হয়। তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ। আকাশের মাত্রাগুণ হইতে শব্দের উৎপত্তি। তাহাই দ্রষ্টা-দৃশ্যের চিহ্ন। আকাশ বিকুর্বিত হইয়া স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু হইল। (ইহাতে আকাশের শব্দগুণও আছে।) আকাশের গুণ অনুস্যূত থাকায় প্রাণ, ওজ ও বলযুক্ত হইল। কাল-কর্ম-স্বভাবদ্বারা বায়ু বিকুর্বিত হইয়া তেজ উৎপন্ন হইল। তাহাতে রূপ, স্পর্শ ও শব্দ তিনটী গুণ হইল। তেজ বিকুর্বিত হইয়া রসাত্মক জল হইল; তাহাতে রস, স্পর্শ, শব্দ ও রূপই এই চারিটী গুণ হইল। গন্ধবান্ পৃথিবীরূপবিশেষ জল-বিকারের দ্বারা হইল। তাহাতে রস, স্পর্শ, শব্দ, রূপ ও গন্ধ---এই পাঁচটী গুণ হইল।

প্রপঞ্চসৃষ্টৌ বিবর্তস্য না স্থানমেব দর্শিতম মৈত্রেয়ো বিদুরম্ (ভাঃ ৩।১০।১১-১২)—

গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ।।
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তিমূর্তিনা।।

জগৎসৃষ্টিতে বিবর্ত নাই। (শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিতেছেন--) কাল স্বয়ং নির্বিশেষ ও অপ্রতিষ্ঠিত। কালই প্রকৃতির ব্যতিকরের আকার মাত্র। পুরুষ তদুপাদানরূপ কালকে লীলার দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। এই বিশ্বটী ব্রহ্ম তন্মাত্র, বিষ্ণুমায়ার দ্বারা সংস্থিত। অব্যক্ত-মূর্তি কালরূপ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাবে (ইহার) উদয় হইয়াছে।

ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।১৯।১৪-১৬,)---

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্ জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্।।
এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।।
স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ।।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তত্ত্ব-সংখ্যা বলিতেছেন। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, (পঞ্চ তন্মাত্র) রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই নয়টী। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—এই একাদশটী। ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-- এই তিনটী গুণ। একত্রে আটাইশটি তত্ত্ব। তন্মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য দুই প্রকার—পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, ক্ষুদ্র পুরুষ জীব মায়াপ্রবণ। প্রকৃতি দুই প্রকার অর্থাৎ পরা কেবল চিৎসম্বন্ধিনী, এবং অপরা জড়-সম্বন্ধিনী যে জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই এক জ্ঞানদ্বারা তত্ত্বসমূহে যে এক জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান, তাহাই ভগবজ্ জ্ঞান। ভগবৎ-শক্তি-পরিণত সকল তত্ত্বই ভিন্ন ও পৃথগ্‌রূপে সত্য; এইরূপ জ্ঞানের নাম 'বিজ্ঞান'-জ্ঞান। বিজ্ঞানদ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব উদয় হয়। ত্রিগুণাত্মক ভাবসকলের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংস-কার্যে কার্যের আদি, মধ্য এবং অন্তে সৃজ্য বস্তু হইতে সৃজ্য বস্তুতে যাহা অন্বিত আছে, তাহাই 'সৎ' এবং তাহা প্রতিসংক্রমে সদ্রূপে থাকে।

কর্মণাং পরিণামিত্বদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।

(ভাঃ ১১।১৯।১৮)

কর্ম পরিণামী। অতএব সৃষ্টিকর্মের অন্তর্গত বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্তই অমঙ্গল। দৃষ্ট মর্ত্যাদি লোক এবং অদৃষ্ট ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পণ্ডিতগণ সকলকেই নশ্বর বলিয়া জানেন।

নশ্বরমপি জগৎ সত্যম্ (ভাঃ ১১।২৪।১৮)—

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে।।

নশ্বর হইলেও সমস্ত সত্য অর্থাৎ কল্পিত নয়। পূর্বস্থ ভাব যদুপায় (যাহা হইতে) পরবর্তী ভাব ও তাহার পরিণাম। অতএব আদি ও অন্ত যে সত্য হইতে, সেই সত্যই সর্বত্র। ইহাই বেদ-সিদ্ধান্ত।

চিচ্ছক্তেরংশভূতস্য জীবশক্তেঃ পরিণামরূপত্বাৎ জীবোঽপি শক্তিপরিণাম ইতি সপ্তম-কিরণে একাদশ-শ্লোকে দর্শিতঃ। ইদানীং তস্য জীবস্য সংসারাভিমানমেব বিবর্তধর্মাদিতি নিশ্চীয়তে।

শ্রীকৃষ্ণেণ (ভাঃ ১১।১০।৮৯)—

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ।।
নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নাণাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ।।

চিচ্ছক্তির অংশভূত জীবশক্তি। তাহার পরিণাম জীব। জীবও শক্তিপরিণাম। সপ্তমকিরণে একাদশ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এ স্থলে সেই জীবের সংসারাভিমান বিবর্ত-ধর্ম হইতে নিশ্চিত হইতেছে। জীব স্ব-স্বরূপের দ্রষ্টা ও পর-দ্রষ্টা। যেরূপ দাহ্য দারুহইতে দাহক ও প্রকাশক-রূপ অগ্নি পৃথক্, তদ্বৎ জীব তাঁহার সাম্প্রতসূক্ষ্ম অর্থাৎ (মন বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক) লিঙ্গ শরীর ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব।

জীব পরতত্ত্ব হইয়াও নিরোধ, উৎপত্তি, অণু, বৃহদ্-রূপনানাত্ব স্থূললিঙ্গ দেহ কৃত গণসকল তাহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া স্বীকার করেন।

সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তসমা ভূততির্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ।।

(ভাঃ ১১।২২।৫২)

সত্ত্ব গুণের সঙ্গে ঋষিত্ব-দেবত্ব, রজোগুণের সঙ্গে অসুরত্ব-মানুষত্ব তমোগুণের সঙ্গে ভূত-তির্যক-রূপ-ধারণ পূর্বক কর্ম্মদ্বারা ভ্রামিত হন।

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তাম্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নীহোঽপ্যনুকার্যতে।।

(ভাঃ ১১। ২২।৫৩)

কেহ নৃত্য করিতেছে বা গীত গাহিতেছে দেখিয়া যেরূপ নর্তক ও গায়কের অন্য কেহ অনুকরণ করে, সেইরূপ বুদ্ধির গুণসকল দেখিয়া (স্বরূপতঃ জীব নিরীহ হইলেই) ভ্রান্ত জীবের "অহং"-অভিমান অণুকরণ করিতে থাকে।

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোপি চলা ইব।
চক্ষুসা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ।।

(ভাঃ ১১।২২।৫৪)

জলের উপর যাহারা নৌকায় চলে তাহারা তীরস্থ বৃক্ষ সকল চলিতেছে বলিয়া মনে করে। ভ্রাম্যমাণ পুরুষের চক্ষু যেমত পৃথিবীকে ভ্রাম্যমাণ দেখে, সেইরূপ জীবের বিবর্তদ্বারা দেহাত্মাভিমান-বুদ্ধি।

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ।।

(ভাঃ ১১।২২।৫৫)

যাহারা সর্বদা মনোরথ-চিন্তায় থাকে, স্বপ্নে তাহাদের মিথ্যা বিষয়ানুভব উদয় হয়। হে দাশার্হ উদ্ধব, জীবাত্মার সংসার সেইরূপ।

অর্থে হ্যবিদ্যমানোঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা।।

(ভাঃ ১১।২২।৫৬)

বিষয়ধ্যানকারী পুরুষের স্বপ্নে যেরূপ অনর্থাগম হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবের বাস্তবিক বিষয়ার্থ না থাকিলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না।

জীবানাং দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ সৈব বিবর্ত ইতি দর্শিতম্।
সর্বৈব শক্তিপরিণামঃ ততোঽচিন্ত্য-ভেদাভেদৌ।।

মনুঃ ভগবন্তম্ (ভাঃ ৮।১।৯)—

যেন যেচয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্তি শয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ।।

এই সকল বাক্যে প্রদর্শিত হইল যে, জীবের যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি, তাহাই বিবর্ত। জীবের স্বরূপ-অনুভবে বা গঠনে বিবর্তের ক্রিয়া নাই। শক্তিপরিণামই কার্য করে। তাহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদ স্থির হইল।

যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতনতা প্রদান করেন, বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করাইতে পারে না। নিদ্রিত সময়ে সুষুপ্তিতে যিনি জাগ্রত থাকেন তিনিই চেতন। তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কে জানিবে?

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।

(ভাঃ ৮।১।১০)

এই বিপুল সমস্ত বিশ্ব আত্মাদ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ আত্মা ইহাতে বাস করেন। জগতে জগৎ বলিয়া যাহা কিছু আছে সমস্তই আত্ম-সম্বন্ধ। সেই আত্মা যাহা দেন তাহাই ভোগ কর। অন্যের ধনে লোভ করিও না। এই মন্ত্রে দুইটি তত্ত্ব স্থাপিত হইতেছে। একটি এই যে, জীব স্ব-স্বরূপ ও স্ব-স্বভাব ভুলিয়া মায়ারূপ কৃষ্ণশক্তিতে এই বিশ্বে আবদ্ধ। দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে, এ সময় কৃষ্ণানুগত্য ব্যতীত আর উপায় নাই। ভক্তিসাধনই তদানুগত্য। কৃষ্ণপ্রসাদব্যতীত আর কিছু ভোগ করিবে না। পরের উপকার বই আর কিছু অপকার করিবে না। ক্রমশঃ বহির্ম্মুখ জগতের মমতা-ত্যাগ ও এই জগতে উদিত কৃষ্ণ-লীলার নিরন্তর সেবা করতঃ অপার প্রেম ভোগ কর। মায়াবদ্ধ ক্লেশ অনায়াসে অবান্তর ফলোদয়ের ন্যায় দূর হইবে।

ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামুনি যদ্যস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদ্‌তং মহৎ।।

(ভাঃ ৮।১।১২)

এইরূপ কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখিতে থাক, তাহা হইলে সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত অভিধেয় সাধন চলিবে। সেই কৃষ্ণের আদি, অন্ত, মধ্য, স্ব, পর, অন্তর, বহিঃ এরূপ কিছু নাই। বিশ্বে যত কিছু আছে সব যিনি এবং বিশ্ব যাঁহা হইতে হইয়াছে, যাঁহার সত্যতাতে সকল সত্য হইয়াছে, সেই কৃষ্ণই আমাদের সর্বস্ব।

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্।।

(ভাঃ ৮।৩।৩)

যে কৃষ্ণে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যাহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্ব, আবার যিনি বিশ্ব হইতে পর এবং জীব হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই স্বয়ম্ভুব কৃষ্ণকে আমি শরণাপন্ন হইয়া প্রপত্তি করি।।

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নমঃ আশ্চর্যকর্মণে।।

(ভাঃ ৮।৩।৩৯)

সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মও অনন্তশক্তি, অরূপ এবং বহুরূপ আশ্চর্য-কর্মকারিস্বরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানি বলিলে আমি অপরাধী

হই, কর্মদ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিব মনে করিলে আমি জড়বুদ্ধি হই, যোগদ্বারা তাঁহার কৈবল্য লাভ করিব---এরূপ মনে করিলে আমাকে আমি ধিক্কার করি। সুতরাং অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহাকে প্রণতি করি।

বসুদেবঃ রামকৃষ্ণৌ (ভাঃ ১০।৮৫।৪)---

যত্র যেন যতো যস্মৈ যদ্‌যদ্‌যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।।

শ্রীবসুদেব শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকে বলিতেছেন---

এই প্রধান অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্ব এবং পুরুষ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ জীব এবং আধিকারিক দেববর্গের যিনি ঈশ্বর এবং যাহাতে সর্বকারকের স্থিতি-ভূমি অর্থাৎ কর্তা, করণ, অধিকরণ, উপাদান, সম্বন্ধ ও সম্প্রদানের যিনি একমাত্র স্থল, সেই ভগবান্ কৃষ্ণই আমার সর্বস্ব।

কেবলাদ্বৈতপক্ষীয়ান্নিরস্তীকৃতাঃ শ্রুতিভিঃ (ভাঃ ১০।৮৭।৩০-৩১)—

অপরিমিতা ধ্রবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুনানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া।।
ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষোরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ।।

শ্রুতিগণকর্তৃক কেবলাদ্বৈত পক্ষীয়গণ নিরস্তীকৃত। শ্রুতিগণ (শ্রীকৃষ্ণকে) কহিলেন,--হে ধ্রব! জীব সংখ্যার অন্ত নাই অর্থাৎ জীব অনন্ত, এইরূপ শব্দপ্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে, জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্বগত---এইটি তাহাদের ভ্রম; কেননা শাস্ত্রে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং তুমি ঈশ্বর তাহার শাসক অর্থাৎ জীব সেবক এবং তুমি সেব্য, এ নিয়ম স্থির থাকে না, সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু-পরিমাণ। সর্বগ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এই যে, জীব স্ব-স্বরূপে ব্যাপক এবং তুমি

সর্বব্যাপক। তুমি অগ্নি বা সূর্যতুল্য, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণকণস্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময়স্বরূপ তোমাতে স্থিত বলিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র হইতে বাহির না করিয়া দিয়া তোমার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহারা জীবকে সর্ব বিষয়ে তোমার সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা জানেন না যে, শ্রুতিগণ এই মতকে দুষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এই বদ্ধ জীবের মায়িক জগতে উদ্ভব কেবল ত্রিগুণ্যাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে ঘটে না। চিৎ-শক্তি যুক্ত পরম পুরুষ তুমি, তোমাতে মায়াশক্তিযুক্ত হইয়া জীবের সোপাধিক জন্ম সংঘটন করে। জীব মায়া-শক্তির অতীত, সুতরাং স্বরূপ শক্তির সহায়তাক্রমেই বহির্মুখ জীবকে উভয় শক্তিযুক্ত ঈশ্বরের বলক্রমে প্রাণযুক্ত করিয়া জড়ে জলবুদবুদের ন্যায় উদ্ভব করে। সেই বদ্ধ জীবসকল তোমার বিবিধ-নাম-উপাসনার গুণে তোমাতে অর্থাৎ চিন্ময়সমুদ্র স্বরূপ তোমাতে সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় মিশিয়া যায়। উপাসনা-অঙ্গে যে সকল রস আছে, সেই অশেষ রস চরমে মধুর রসে লয় পায়। ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর রস ভোগ করেন।

অক্রূরঃ ভগবন্তং (১০।৪০।১০)

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুৎ তদ্বত্ত্বাৎ গতয়োঽন্ততঃ।।

অতএব অক্রূর ভগবান্‌কে কহিলেন,---অদ্রিপ্রভব। নদীগণ পর্জন্য-পূরিত হইয়া, হে প্রভো! (যেরূপ) সমুদ্র প্রবেশ করে, সেরূপ জীবের অন্তিম গতি তুমি বইত আর কেহ নয়।)

জীবের ক্লেশের জন্য কৃষ্ণ দায়ী কিনা ?

প্রশ্ন। জীবের কষ্টের জন্য কৃষ্ণ দায়ী কি না?

উত্তর। স্বতন্ত্রতা একটি রত্ন বিশেষ; জড় জগতে অনেক বস্তু আছে, সে সকল বস্তুকে এ রত্ন দেন নাই; এতন্নিবন্ধন তাহারা তুচ্ছ ও হেয়। জীবকে যদি স্বতন্ত্রতা না দেওয়া হইত তাহা হইলে জীব জড়বস্তুর ন্যায় হেয় ও তুচ্ছ হইত। বিশেষতঃ জীব চিৎকণ, চিৎবস্তুতে যে ধর্ম আছে, সুতরাং তাহা জীব লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটি ধর্ম নিহিত আছে। নিত্যধর্ম হইতে বস্তুকে বিচ্ছেদ করা যায় না; অতএব জীব যে পরিমাণ অণু, তাহার স্বতন্ত্রতাধর্ম সেই পরিমাণ অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতা-ধর্মপ্রযুক্ত জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চ পদার্থ এবং জড়জগতের প্রভু হইয়াছেন। এরূপ স্বতন্ত্রতা ধর্মবিশিষ্ট জীব কৃষ্ণের প্রিয়সেবক। এই জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়াতে অভিনিবেশ করে, তখন করুণাময় কৃষ্ণ জীবের অমঙ্গল দেখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্ধার করিতে যান---জীব কৃষ্ণের অমৃতময় লীলা জড়-জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রপঞ্চে উদয় করেন; আবার, জীব সেই লীলাতত্ত্ব তদবস্থায় বুঝিতে পারে না দেখিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম-উপায়-স্বরূপ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্ত-চরিত্রদ্বারা শিক্ষা দেন। বাবা! এমন দয়াময় কৃষ্ণকে কি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে পার? তাঁহার করুণা অগাধ, কিন্তু তোমার দুর্দৈব অতিশয় শোচনীয়।

প্রশ্ন। তবে কি মায়াশক্তিই আমাদের দুর্দৈব ও শত্রু? সর্বশক্তিময়, সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ মায়াকে দূর করিলে জীবের ত' কষ্ট হইত না?

উঃ। মায়া---স্বরূপশক্তির ছায়া, অতএব শুদ্ধশক্তির বিকার; অনুপযুক্ত জীবকে সংস্কার করিবার হাপর অর্থাৎ উপযুক্ত করিবার উপায় মায়া---কৃষ্ণদাসী, কৃষ্ণবিমুখ জনকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। 'কৃষ্ণের নিত্যদাস আমি'---এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়া চিৎকণ-স্বরূপ জীবের পক্ষে অনুচিত ও দোষ; সেই দোষে দুষ্ট হইলে জীব মায়াপিশাচীর দণ্ড্য হইয়া পড়েন। মায়িক জগৎটা দণ্ড্য জীবের কারাগার; রাজা যেমন প্রজাদিগের প্রতি দয়া করিয়া

কারাগার স্থাপন করেন, কৃষ্ণও তদ্রূপ জীবের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করতঃ জড়জগৎ রূপ কারাগার এবং জড়মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন।

জগৎ-কারাগারের নিগড় কি?

প্রঃ জড়জগৎ যদি কারাগার হইল, তবে তদুচিত নিগড় কাহাকে বলি?

উঃ। মায়ার নিগড় তিন প্রকার সত্ত্বগুণনির্মিত নিগড়, রজগুণ-নির্মিত নিগড় ও তমোগুণ-নির্মিত নিগড়; দণ্ড্যজীব সকলকে যথাযথ ঐ তিন নিগড়ে আবদ্ধ করেন। জীব সাত্ত্বিকই হউন্, রাজসিকই হউন্ বা তামসই হউন্, সকলেই নিগড়-বদ্ধ। স্বর্ণনিগড়, রৌপ্যনিগড় ও লৌহ নিগড়,---ইহারা ধাতুতে ভিন্ন হইলেও সকলেই নিগড় বই আর অন্য দ্রব্য নয়।

প্রঃ। চিৎকণবিশিষ্ট জীবকে মায়িক নিগড় কি প্রকারে বাঁধিতে পারে?

উঃ। মায়িকবস্তু চিৎবস্তুকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। জীব 'আমি মায়াভোক্তা'— এই অভিমান করিবামাত্র জীবের জড়াহঙ্কাররূপ লিঙ্গাবরণ হইয়া পড়ে; সেই লিঙ্গাবৃত জীবের পদদ্বয়ে মায়িক নিগড় প্রযুক্ত হয়। সাত্ত্বিক-অহঙ্কার বিশিষ্ট জীবসকল উচ্চলোকবাসী দেবতা, তাহাদের পদদ্বয়ে সাত্বিক বা স্বর্ণনিগড় প্রযুক্ত হয়; রাজস জীবসকল দেবতা ও মনুষ্যভাবমিশ্র, তাহাদের পদে রৌপ্য বা রাজস নিগড়; তামস-জীবসকল পঞ্চমকারীয় জড়ানন্দে মত্ত, তাহাদের পদে তামসিক বা লৌহ-নিগড় প্রযুক্ত আছে। সেই নিগড়বদ্ধ জীবসকল কারাগৃহের বাহিরে যাইতে পারে না বহু প্রকার ক্লেশনিগড় দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

বিকার ও বিবর্ত্ত

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,---পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যাসংজ্ঞা বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই 'চিচ্ছক্তি', ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তিই জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' (ভিন্না) বলিয়া উক্ত হইয়াছে); কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যা শক্তির নাম 'মায়া'।

জীবতত্ত্ব--শক্তিবিশেষ। সেই জীবতত্ত্বকে 'অণুচৈতন্য' রূপে সিদ্ধ না করিয়া 'ব্রহ্ম' রূপে সিদ্ধ করিতে গেলে অবশ্যই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ঈশ্বর-আজ্ঞাক্রমে ঈশ্বরত্ব আচ্ছাদন করিবার অভিপ্রায়ে জীবতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের ঐক্য স্থাপন পূর্ব্বক ভ্রমময় সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। ব্যাসসূত্রে বস্তুতঃ (শক্তি) পরিণাম-বাদ স্বীকৃত। আচার্য্য পরিণাম-বাদে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয়, এই বিতর্ক উঠাইয়া, পরিণাম-বাদ মানিলে ব্যাসকে 'ভ্রান্ত' বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এই যুক্তি মনে করিয়া 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে "তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" এই ১৪শ সূত্রের ভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি বেদবাক্যের উদাহরণ দিয়া পরিণামবাদকে দোষযুক্ত বিকার-বাদ বলিয়া বিতর্ক করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তির কার্য্য বিকাররূপে এইরূপ পরিণাম-বাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিণামের লক্ষণ এই,---"সতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধিবিকার ইত্যুদাহৃতঃ। একটী সত্য তত্ত্ব হইতে অন্য একটী সত্য তত্ত্বের উদয় হইলে, তাহাতে অন্যবস্তু বলিয়া যে বুদ্ধি, তাহাই 'বিকার' অর্থাৎ পরিণাম। 'ব্রহ্ম' একটী সত্যবস্তু, তাঁহা হইতে জীব রূপ একটী সত্যবস্তু ও 'মায়িক ব্রহ্মাণ্ড'রূপ একটী সত্যবস্তু পৃথগ্‌রূপে হইয়াছে, এইরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের 'বিকার' বা পরিণাম বলে। বিকার বা পরিণামের উদাহরণ এই যে, 'দুগ্ধ'---একটী সত্যপদার্থ, তাহাই 'দধি' রূপ অন্য সত্যপদার্থরূপে বিকৃত হয়। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) এইরূপ বেদবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ ইহাতে কোন সন্দেহ হয় না। ব্রহ্মের একটী অচিন্ত্য শক্তি আছে, তাহা "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮) এই বেদবাক্যে সিদ্ধ হয়। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের সত্যধর্ম্মই জগদ্‌রূপে পরিণত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে কোন

প্রকার দোষ হইতে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম" (ছাঃ ৬।২।১), "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), "সন্মলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪), ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বং (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি ছান্দোগ্য-বাক্যে সেই ব্রহ্ম স্বীয় পরাশক্তিক্রমে এই চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত,---ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব 'উপাদেয়', ব্রহ্ম— 'উপাদান'। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (তৈঃ, উঃ ১ অঃ) এই বেদবাক্যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণামবাদের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিতে পারিলে এই 'জগৎ' ও 'জীব' কে পৃথক্ সত্য তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না। "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ (ছাঃ ৬।৮।৪) ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, 'জীব' ও জীবায়তন 'জড়জগৎ সত্যবস্তু বটে। এস্থলে ব্রহ্মের বিকারীত্ব হইবে---এই নিরর্থক ভয়ে রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা-স্বরূপ জীব ও জগৎকে কল্পনা করা প্রতারণা মাত্র; তবে যে মাণ্ডুক্য ইত্যাদি বেদে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধি--এই সকল উদাহরণ দেখা যায় তাহার বিশেষ বিশেষ স্থল আছে। জীব--শুদ্ধচিৎকণ। মানবদেহ বিশিষ্ট জীব এই জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, ইহাই 'বিবর্ত্তের' স্থল। 'বিবর্ত্ত' এইরূপে ব্যাখ্যাত--"অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধিবিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ"--যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া প্রতীতি করার নামই 'বিবর্ত্ত'। জীবের পক্ষে 'বিবর্ত্ত' একটি মহাদোষ,--বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধি-দোষে দূষিত। এইরূপ বিবর্ত্তদোষকে মূল-বিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ করা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভুলিয়া গেলেই এইরূপ ভ্রমের উদয় হয়। ভগবান্ যেরূপে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহার একটী সামান্য দৃষ্টান্ত আছে। অনেকে বলেন, প্রাকৃত জগতে 'চিন্তামণি' বলিয়া একটি নিধি আছে, তাহা নানারত্নরাশিকে প্রসব করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত-স্বরূপে অবস্থান করে। প্রাকৃত বস্তুতে যদি এরূপ অচিন্ত্যশক্তি থাকে,তাহা হইলে ঈশ্বরের তদ্পেক্ষা যে অনন্তগুণবিশিষ্টা একটী অচিন্ত্য-শক্তি আছে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?

বেদের মূলবাক্য---প্রণব, সুতরাং তাহাই একমাত্র ব্রহ্মবাচক মহাবাক্য। 'প্রণব'--ঈশ্বরের স্বরূপব্যঞ্জক শব্দ, সুতরাং ঈশ্বরের নিত্য নাম, 'সর্ব্ববিশ্বাধাম'— সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের উদ্দেশ করে। তবে যে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা," "ব্রহ্মেদং সর্ব্বং" (বৃঃ আঃ ২।৫।১), "আত্মৈবেদং সর্ব্বং (ছাঃ

৭।২৫।২), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ ২।১।১১ বৃঃ আঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি বাক্যগণকে 'মহাবাক্য' বলা একটী বিষম ভ্রম। কেননা, তন্মধ্যে প্রধান বাক্যরূপ "তত্ত্বমসি' বাক্যটী প্রাদেশিক মাত্র; যে হেতু "তত্ত্বমসি' শব্দে যাহা উপদিষ্ট হয় তাহা কেবল বেদের একদেশ-ব্যাপী উপদেশ। যাহা বেদের সৰ্ব্বদেশব্যাপী, তাহাই মহাবাক্য; সুতরাং 'প্রণব' বই আর কোনটীই 'মহাবাক্য' হইতে পারে না। এই তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য 'তত্ত্বমসি' কে মহাবাক্য বলিয়াছেন। তাদৃশ কল্পিত মহাবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিদ্বারা ব্যাখান করা হইয়াছে, তাহাতে সৰ্ব্ববেদ সূত্রের কৃষ্ণতত্ত্বব্যাখ্যানকে অকারণ তিরস্কৃত করা হইয়াছে। বেদ যখন স্বতঃপ্রমাণ, তখন তাহার শব্দার্থ সকলে লক্ষণা যোজনা করাই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের প্রমাণতা হানি করা মাত্র।

স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্

গুরৌ-শ্রীগৌরাঙ্গে তদুদিতসুভক্তি প্রকরণে

শচীসূনোর্লীলা-বিকসিতসুতীর্থে-নিজমনৌ।

হরের্নাম্নি প্রেষ্ঠে হরিতিথিষু রূপানুগজনে

শুকপ্রোক্তে শাস্ত্রে প্রতিজনি মমাস্তাং খলু রতিঃ।। ১।।

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বনিয়মদ্বাদশকের বঙ্গানুবাদ

১। শ্রীগুরুতে, শ্রীগৌরাঙ্গে, শ্রীগৌরাঙ্গ উপদিষ্ট ভক্তির সম্যক্ আচরণে, শ্রীশচীনন্দনের লীলাদ্বারা উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে, নিজের (গুরু দীক্ষা) মন্ত্রে, নিজ প্রিয়তম শ্রীহরির নামে, শ্রীহরিবাসর শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিতিথি সমূহে, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর অনুগামী জনে এবং শ্রীশুকদেবকথিত শ্রীভাগবত শাস্ত্রে প্রতি জন্মে আমার রতি থাকুক।

মন্তব্য---এই দ্বাদশকে লোট্‌প্রত্যায়ান্ত ক্রিয়াগুলি প্রার্থনা সূচক। আস্‌ধাতু স্থিত্যর্থে ব্যবহৃত।

সদা বৃন্দারণ্যে মধুররসধন্য রসময়ঃ

পরাং শক্তিং রাধাং পরমরসমূর্ত্তিং রময়তি।

স চৈবায়ং কৃষ্ণো নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্

শচীসূনুর্গৌড়ে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ।। ২।।

২।শৃঙ্গাররসদ্বারা ধন্য শ্রীবৃন্দাবনে যে রসময় শ্রীকৃষ্ণ পরমরসমূর্ত্তি পরাশক্তি শ্রীরাধাকে সর্ব্বদা আনন্দ দান করেন, তিনিই গৌড়দেশে নিজভজন-প্রণালী উপদেশকারী আমার প্রভুবর (মহাপ্রভু) শ্রীশচীনন্দন। তাঁহাতে জন্মে জন্মে আমার রতি থাকুক।

ন বৈরাগ্যং গ্রাহ্যং ভবতি ন হি যদ্ ভক্তিজনিতং

তথা জ্ঞানং ভানং চিতি যদি বিশেষং ন মনুতে।

স্পৃহা মে নাষ্টাঙ্গে হরিভজনসৌখ্যং ন হি যত-

স্ততো রাধাকৃষ্ণপ্রচুর পরিচর্য্যা ভবতু মে।।৩।।

৩। যে বৈরাগ্য ভক্তি হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। তদ্রূপ যে জ্ঞান চিৎতত্ত্বে বিশেষ স্বীকার করে না, তাহা ছলমাত্র অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের আকারবিশিষ্ট হইলেও প্রকৃত জ্ঞান নহে। অষ্টাঙ্গযোগে আমার স্পৃহা নাই, যেহেতু তাহাতে হরিভজনানন্দ নাই। অতএব আমার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা (করিবার সুযোগ লাভ) হউক।

তাৎপর্য্য---যে ভক্তি বৈরাগ্যজনিত নহে, তাহা আমি চাহি না। যে জ্ঞান চিদ্বিশেষ মানে না তাহাও চাহি না। যে অষ্টাঙ্গযোগে হরিভজনানন্দ নাই, তাহাতেও আমার স্পৃহা নাই। আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর সেবা করিতে পারি।

কুটিরেঽপি ক্ষুদ্রে ব্রজভজনযোগ্যে তরুতলে
শচীসূনোস্তীর্থে ভবতু নিতরাং মে নিবসতিঃ।
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে বিবুধগণসেব্যে পুলকিতো
বসামি প্রাসাদে বিপুলধনরাজ্যান্বিত হই।। ৪।।

৪। শ্রীনবদ্বীপধামে ক্ষুদ্র কুটীরেও বা নিতান্তপক্ষে ব্রজভজনোপযোগী বৃক্ষতলেও আমার বাস হউক। কিন্তু এই পৃথিবীতে বিপুলধনরাজ্যবিশিষ্ট ও দেবতা বা পণ্ডিতগণের বাসযোগ্য অন্য দেশে রাজপুরী বা দেবমন্দিরেও আনন্দের সহিত বাস করিব না।

ন বর্ণে সক্তির্মে ন খলু মমতা হ্যাশ্রমবিধৌ
ন ধর্ম্মে নাধর্ম্মে মম রতি-রিহাস্তে ক্বচিদপি।
পরং তত্তদ্ধর্মে মম জড়শরীরং ধৃতমিদ-
মতো ধর্মান্ সর্ব্বান্ সুভজনসহায়ান্নভিলষে।। ৫।।

৫। ব্রাহ্মণাদি বর্ণে আমার আসক্তি নাই, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমবিধিতেও নিশ্চয় আমার অনুরাগ নাই, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কোনটিতেই আমার আদর নাই। কিন্তু আমার এই জড়শরীর সেই সেই ধর্ম্মে ধারণ করিয়াছি (অর্থাৎ এই জড়শরীর দ্বারা সেই সেই ধর্ম্ম-কার্য্যাদি আচরণ করিয়াছি) সুতরাং, সকল ধর্ম্ম আমার শুদ্ধভজনের সহায় হউক, ইহাই আমার অভিলাষ।

সুদৈন্যং সারল্যং সকলসহনং মানদদনং
দয়াং স্বীকৃত্য শ্রীহরিচরণসেবা মম তপঃ।
সদাচারোঽসৌ মে প্রভুপদপরৈর্যঃ সমুদিতঃ
প্রভোশ্চৈতন্যস্যাক্ষয়চরিতপীযূষকৃতিষু।।৬।।

৬। সুদৈন্য (নিষ্কপট দীনতা), সরলতা, সর্ব্বপ্রকার (কষ্ট, অপমানাদি) সহিষ্ণুতা, (অন্যকে) মানদান ও অন্যের প্রতি দয়া স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম-সেবাই আমার ব্রত এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অমিয় চরিতামৃতপূর্ণ গ্রন্থসমূহে তাঁহার পাদপদ্মসেবৈকনিষ্ঠ ভক্তগণ-কর্ত্তৃক যে সকল আচার উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই আমার সদাচার।

ন বৈকুণ্ঠে রাজ্যে ন চ বিষয়কার্য্যে মম রতি
র্ন নির্ব্বাণে মোক্ষে মম মতিরিহাস্তে ক্ষণমপি।
ব্রজানন্দাদন্যদ্ধরিবিলসিতং পাবনমপি
কথঞ্চিন্মাং রাধান্বয়বিরহিতং নো সুখয়তি।। ৭।।

৭। বৈকুণ্ঠরাজ্য বা বিষয়কার্য্যে আমার অনুরাগ নাই। নির্ব্বাণ মুক্তিতেও ক্ষণকালের জন্যও আমার অভিলাষ নাই। শ্রীরাধিকার সম্বন্ধবিরহিত শ্রীহরির বিলাস পবিত্রকারক হইলেও শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধযুক্ত ব্রজানন্দ ব্যতীত অন্য কিছু আমাকে সুখ দিতে পারে না।

ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধুনিচয়া
হরৌ ভক্তে-ভক্তৌ ন খলু যদি তেষাং সুমমতা।
অভক্তানামন্নগ্রণমপি দোষো বিষয়িণাং
কথং তেষাং সঙ্গাদ্ধরিভজনসিদ্ধির্ভবতি মে।। ৮।।

৮। যদি স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, মাতা ও বন্ধুবর্গের (আমার বলিয়া খ্যাত হইলেও) শ্রীহরিতে হরিভক্তে ও ভক্তিতে সত্যই নিষ্কপট বা সুদৃঢ়া মমতা না থাকে তবে তাহারা আমার কেহই নহে, অর্থাৎ তাহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। অভক্ত বিষয়িগণের অন্নগ্রহণও পাপ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে আমার হরিভজনে কিরূপে সিদ্ধি (লাভ) হইবে?

অসত্তর্কেরন্ধান্ জড়সুখপরান কৃষ্ণবিমুখান্
কুনির্ব্বাণাসক্তান্ সততমতিদূরে পরিহরন্।
অরাধং গোবিন্দং ভজতি নিতরাং দাম্ভিকতয়া
তদভ্যাসে কিন্তু ক্ষণমপি ন যামি ব্রতমিদম্।। ৯।।

৯। কুতর্কের দ্বারা অন্ধ, জড়সুখপ্রমত্ত, শ্রীকৃষ্ণ সেবা বিমুখ, এবং সাযুজ্য মুক্তিতে আসক্ত জনগণকে সর্ব্বদা দূরে পরিত্যাগ করিয়াও যে ব্যক্তি অত্যন্ত দাম্ভিকতাবশতঃ শ্রীরাধা বিরহিত শ্রীগোবিন্দের ভজনা করে আমি কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও তাহার নিকটে যাই না, ইহাই আমার ব্রত।

শব্দার্থ---নির্ব্বাণ--নিবৃতি অর্থাৎ আত্যন্তিক সুখ, সাযুজ্য মুক্তি। এস্থলে কুনির্ব্বাণ শব্দে সাযুজ্যই উদ্দিষ্ট।

প্রসাদান্নক্ষীরাশনবসন পাত্রাদিভিরহং
পদার্থৈর্নির্বাহ্য ব্যবহৃতিমসঙ্গঃ কুবিষয়ে।
বসন্নীশাক্ষেত্রে যুগলভজনানন্দিত মনা-
স্তনুং মোক্ষ্যে কালে যুগপদপরাণাং পদতলে।। ১০।।

১০। প্রসাদী অন্নদুগ্ধাদি খাদ্য, বস্ত্র, এবং পাত্রাদি দ্রব্য দ্বারা ব্যবহার নির্ব্বাহ পূর্ব্বক জড়বিষয়ে অনাসক্ত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল সেবায় আনন্দিত চিত্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতে করিতে সময় উপস্থিত হইলে শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদপদ্মসেবী ভক্তগণের শ্রীচরণের নিকট শরীর ত্যাগ করিব।

শব্দার্থ---ঈশাক্ষেত্র--ঈশা শ্রীরাধা তাঁহার ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থান অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থান।

শচীসূনোরাজ্ঞাগ্রহণচতুরো যো ব্রজবনে
পরারাধ্যাং রাধাং ভজতি নিতরাং কৃষ্ণরসিকাম্।
অহং ত্বেতৎপাদামৃতমনুদিনং নৈষ্ঠিকমনা
বহেয় বৈ পীত্বা শিরসি চ মুদা সন্ননতিযুতঃ।। ১১।।

১১। যে ভক্ত গৌরাঙ্গের আদেশ পালনে চতুর ও যিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণরসজ্ঞা পরমারাধ্যা শ্রীরাধাকে একান্তভাবে ভজনা করেন, আমি নিষ্ঠাযুক্ত চিত্তে প্রণতিপুর্ব্বক তাঁহার পাদোদক প্রতিদিন পান করিয়া শিরোধারণ করিব।

হরের্দ্দাস্যং ধর্ম্মো মম তু চিরকালং প্রকৃতিতো
মহামায়াযোগাদভিনিপতিতঃ দুঃখজলধৌ।
ইতো যাস্যাম্যূর্দ্ধং স্বনিয়মসুরত্যা প্রতিদিনং
সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণবকৃপা।। ১২।।।

১২। শ্রীহরির সেবাই চিরকাল আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম কিন্তু আমি মহামায়ার বলে দুঃখ-সমুদ্রে সম্পূর্ণভাবে পতিত হইয়াছি। আমি প্রতিদিন স্বনিয়মে সুদৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত থাকিয়া (অর্থাৎ সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া) দুঃখসমুদ্র হইতে তদতীত স্থানে যাইব। এই কার্য্যে একমাত্র মায়াবিনাশিনী বৈষ্ণব-কৃপাই আমার সহায়।

শব্দার্থ---বিতথ--মায়া, মিথ্যা।

১৩। কোন হরিজন রচিত এই নিজ ভজন বিষয়ে স্বনিয়ম (দ্বাদশক) বিশ্বাস-যুক্ত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে সমর্পিত চিত্তে যিনি পাঠ করেন, তিনি ব্রজে বাস প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনা করেন ও নিজ গুরুরূপা মঞ্জরীর পশ্চাৎ থাকিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের নানা প্রকার সেবা করিতে থাকেন।

ত্রিবিধ-দর্শন

জগতে যত জীব আছেন তাঁহারা প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-অধিকার অনুসারে ত্রিবিধ। লোকে বলেন যে, দর্শন ছয় প্রকার; কিন্তু আমরা সেই সমস্ত দর্শনকে তিন প্রকারে বিভাগ করি অর্থাৎ প্রাকৃত দর্শন, আধ্যাত্মিক দর্শন ও অপ্রাকৃত দর্শন। ন্যায় বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসা--ইহারা প্রাকৃত দর্শন। সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য—এই তিনটী আধ্যাত্মিক দর্শন। বেদান্ত স্বয়ং অপ্রাকৃত দর্শন। এই ত্রিবিধ দর্শনের সমস্ত কার্যকে আমরা এইরূপে অঙ্কিত করি,—

প্রথম প্রাকৃত দর্শন—

১। অবিদ্যাজনিত প্রাকৃতদেহে অহংতা-জ্ঞান এবং সেই দেহানুগত সকল বিষয়ে মমতা-জ্ঞান। এই অহংতা ও মমতা হইতে দেহের জন্ম-বৃদ্ধি ইত্যাদি ষড়্বিকার, জ্বরা-মরণ প্রভৃতি পরিণতি ও পীড়া এবং মনের অনুভূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, বিকল্প, নির্ধারণ, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববুদ্ধি ও কামক্রোধাদি ষড়্বিকার (রিপু)।

২। উক্ত অহংতা মমতা হইতে (মায়াবদ্ধ) জীব (সমূহের) পরস্পরের ঔপাধিক জ্ঞান বাহ্য জগতের ভোক্তৃত্ব-জ্ঞান কর্ম, ঔপাধিক কর্ম, বর্ণাশ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠতা প্রাকৃত ফলোদ্দেশে প্রাকৃতফলোপযোগী-দেবতা-পূজা, অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম সপ্তাঙ্গ, পুণ্যবিধি, পাপনিষেধ, জয়, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্প।

৩। জড়গত-ঔপাধিক-জ্ঞানজনিত পুণ্য হইতেই ঐহিক পার্থিব সুখ, নানাবিধ চিন্তাসুখ ও পারলৌকিক স্বর্গীয় সুখসমুদয়।

৪। জড়গত-ঔপাধিক-জ্ঞানান্তর্গত মৎসরতাজনিত পাপবিকার হইতে কলহ, যুদ্ধ, দুশ্চিন্তা, পীড়া, ভয়, মনস্তাপাদি ঐহিক দুঃখ ও নরকাদিরূপ পারত্রিক দুঃখ সমুদয়।

৫। প্রাকৃত দর্শনাবেশেই জীবের সংসার, অপগতি বা বন্ধন। বন্ধন দুই প্রকার অর্থাৎ স্বর্ণময় শৃঙ্খলরূপ পুণ্যবন্ধন ও লৌহময় শৃঙ্খলরূপ পাপবন্ধন এই সমস্ত প্রাকৃত দর্শনের অনুগত। মনুষ্য যতদিন প্রাকৃত, ততদিন এই দর্শনে আবিষ্ট।

দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন---

১। প্রাকৃতদর্শনবিষয়ে বিবেকজনিত বৈরাগ্য।

২। প্রকৃতির বিপরীত সুতরাং অস্ফুট-সত্তাজ্ঞান।

৩। সেই অস্ফুট-সত্ত্বায় নীরস-সর্বৈকত্ব-জ্ঞান।

৪। নির্বিশেষ-জ্ঞানাগ্রহতা।

৫। প্রাকৃতবন্ধনমুক্তিস্পৃহারূপা সাযুজ্য-নির্বাণ-গতি চিন্তা। এই পাঁচটী আধ্যাত্মিক দর্শনান্তর্গত।

প্রাকৃত বিষয়ে তুচ্ছজ্ঞান হইয়াও যতদিন অপ্রাকৃত জ্ঞানে অভিনিবেশ না হয়, ততদিন এই দর্শনাবস্থা থাকে। বুদ্ধিদোষে যাঁহাদের এই দর্শনে স্থিতি হয়, তাঁহারা দুয়ের বাহির; সুতরাং শোচনীয়, অপরাধবদ্ধ।

তৃতীয় অপ্রাকৃত দর্শন---

১। জ্ঞান বা শুদ্ধ-জ্ঞান, প্রকৃতির অতীত বিশেষ ও বিচিত্রতা-জ্ঞান। প্রকৃতি যে তত্ত্বের প্রতিফলন বা হেয় প্রতিচ্ছবি সেই তত্ত্বের বিচিত্র-জ্ঞান।

২। শুদ্ধ-বিজ্ঞান, প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক-ধিক্কারী বৈদান্তিক শুদ্ধজ্ঞান।

৩। শুদ্ধজ্ঞানাত্মিক-শক্তি-শক্তিমৎ-সম্বন্ধজ্ঞানপূর্বিকা ভক্তিচেষ্টা।

৪। শুদ্ধভক্তসঙ্গলিপ্সা।

৫। প্রেম---অপ্রাকৃত আনন্দচিন্ময় রসোপলব্ধি। এই জ্ঞানে অর্থাৎ অপ্রাকৃত দর্শনে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। ইহাই জীবের স্বমহিমা।

ব্রহ্মসংহিতার আলোকে দুর্গাতত্ত্ব

"সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যে-জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ---চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী---'দুর্গা'। তিনি-দশকর্মরূপ দশভুজা-যুক্তা, বীরপ্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপ-দমনীরূপা মহিষাসুরমর্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্তিক ও গণেশের জননী; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্য বর্তিনী, পাপ-দমনে বহুবিধ বেদোক্ত-ধর্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী; কাল-শোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী; এই সকল আকার-বিশিষ্টা দুর্গা; যেই দুর্গা---দুর্গবিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দে কারাগৃহ; তটস্থাশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক-কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার 'দুর্গ'। কর্মচক্রই তথায় 'দণ্ড'; বহির্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন-প্রণালী-বিশিষ্ট কার্যই গোবিন্দের ইচছানুরূপ কর্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবদিগের যখন সেই বহিমুর্খতা দূর হয় এবং অন্তর্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্মুখ ভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যারূপে প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণবহির্মুখ জীবের জন্য "জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা" বিস্তার করেন। জীব--চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণবহিমুর্খতা-দোষ হইলেই তিনি মায়িক

জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র দুর্গা তাঁহাকে , কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ-ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত একটি স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘূর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতরে মনো-বুদ্ধি অহঙ্কার-রূপ একটি লিঙ্গদেহও দেন। জীব এক স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূল দেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্বাসনা-ময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমূয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।।" এই ভাগবত-বচনেই বহির্মুখ-জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। জড়-জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনিই এই 'দুর্গা', কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়া-দুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য করেন।

(এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ কর্তৃক ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩ শ্লোকের টীকায় লিখিত—ক্বচিদ্দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বন্তু শক্তিশক্তিমতোরভেদবিক্ষয়া; অতএবোক্তং গৌতমীয়কল্পে—"যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে।।" ইত্যাদি। অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্তত্র স্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গা নাম; তস্মান্নেয়ং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। নিরুক্তশ্চাত্র—'কৃচ্ছ্রেণে দুরারাধনাদি-বহুপ্রয়াসেন গন্যতে জ্ঞায়তে' ইতি।" ইত্যাদি বিচার দ্রষ্টব্য। গৌঃ সঃ।)

ব্রহ্মসংহিতার আলোকে শম্ভুতত্ত্ব

নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশং তদা

তল্লিঙ্গং ভগবান্ শম্ভুর্জ্যোতিরূপঃ সনাতনঃ।

যা যোনিঃ সাপরা শক্তিঃ কামবীজং মহদ্ধরেঃ

লিঙ্গযোন্যাত্মিক জাতা ইমা মাহেশ্বরী-প্রজাঃ।। (৫।৮।৯)

চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী—নিয়তিরূপা ভগবৎপ্রিয়া। সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চ-রচনোন্মুখে কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশ-জোতিঃ উদিত হয়, তাহাই সনাতনজ্যোতির আভাস। সেই লিঙ্গ---নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎপাদকাংশ। নিয়তি হইতে যে প্রসবিনী শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরা শক্তি যোনিরূপা মায়ার স্বরূপ। তদুভয় সংযোগই হরির মহত্তত্ত্বরূপ প্রতিফলিত কামবীজ। এই জগতের সমস্ত মাহেশ্বরী প্রজাই---লিঙ্গ-যোনিস্বরূপ।

সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; কারণ-বারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করত তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাস-রূপই শম্ভুলিঙ্গ; তাহাই রমাশক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষ্ণুসৃষ্ট কামের প্রথম উদয়কে হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব বলে; তাহাই সৃষ্টোন্মুখ মনোরূপি-তত্ত্ব। ইহাতে গূঢ় বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন। নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি, এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্তা। দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই উপাদান এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচছাময় তত্ত্বই প্রপঞ্চপ্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ। এই তিনই সৃষ্টিকর্তা। গোলোকে যে কামবীজ, তাহা---বিশুদ্ধ চিন্ময়, এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা—ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি শক্তির কামবীজ। প্রথমোক্ত কামবীজ—মায়ার আদর্শ হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্তী এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ--মায়িক প্রতিফলন।

ভগবানের চতুষ্পাদ বিভূতিই তাঁহার ঐশ্বর্য। তন্মধ্যে অশোক, অমৃত ও অভয়---এই ত্রিপাদ বিভূতিই বৈকুণ্ঠ গোলোকাদিগত ঐশ্বর্য। এই মায়িক-জগতে দেবমানবাদি সকলেই সমস্ত-লোকসহ মায়িক মহৈশ্বর্যবিশেষ; সকল বস্তুই উপাদান-নিমিত্ত ভেদে লিঙ্গ যোন্যাত্মক, অর্থাৎ লিঙ্গ যোনি সংযোগ-বিধানক্রমে উৎপন্ন। জড়ীয়বিজ্ঞানদ্বারা যত কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সকলই এইরূপ সংযোগ স্বভাব-সম্পন্ন; বৃক্ষ, লতা, এমন কি, সমস্ত জড়বস্তুই পুরুষ প্রকৃতি-সংযোগস্বরূপ। বিশেষ তাৎপর্য এই যে, যদিও লিঙ্গ-যোন্যাদি শব্দসকল অশ্লীল, তথাপি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এই সকল তত্ত্বসূচক বাক্য--অত্যন্ত উপাদেয় এবং অর্থপ্রসূ। অশ্লীলতা--কেবল সামাজিক-ব্যবহারগত ভাব-মাত্র, কিন্তু বিজ্ঞান ও পরম-বিজ্ঞান সামাজিক ব্যবহারকে অপেক্ষা করিয়া সত্যবস্তু ধংস করিতে পারে না। সুতরাং জড় জগতের মূলতত্ত্ব যে মায়িক কামবীজ, তাহা দেখাইতে হইলে অনিবার্যরূপে ঐ সমস্ত শব্দই ব্যবহার্য হয়। এই সমস্ত শব্দের ব্যবহারদ্বারা কেবল পুরুষ-শক্তি অর্থাৎ কর্তৃপ্রধান ক্রিয়া-শক্তি এবং স্ত্রীশক্তি অর্থাৎ কর্মপ্রধান ক্রিয়াশক্তি বুঝিতে হইবে।

শক্তিমান্ পুরুষঃ সোঽয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ।। (৫।১০)

উপাদানময় পুরুষ লিঙ্গরূপী মহেশ্বর শম্ভুই--নিমিত্তাংশ মায়ারূপশক্তি-যুক্ত। জগৎপতি মহাবিষ্ণু তাঁহাতে ঈক্ষণাংশে আবির্ভূত।

চিদৈশ্বর্যপ্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। তাঁহার ব্যূহগত মহাসঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহাংশ। তিনি চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-রূপা মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ-স্বরূপাভাসরূপ রুদ্ররূপী দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শম্ভু নিমিত্তাংশ-মায়ার সহিত সঙ্গ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্বলরূপ মহাবিষ্ণু প্রভাবব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না; সুতরাং শিবশক্তি রূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চ ভূত, (পঞ্চ) তন্মাত্র ও জীবের

মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশসমূহই জীবরূপে উদিত।

প্রত্যণ্ডমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্ বিশতি স্বয়ম্।
সহস্রমূর্ধা বিশ্বাত্মা মহাবিষ্ণুঃ সনাতনঃ।। (৫।১৪)
বামাঙ্গাদসৃজদ্‌বিষ্ণুং দক্ষিণাঙ্গাৎ প্রজাপতিম্।
জ্যোতির্লিঙ্গময়ং শম্ভুং কুর্চদেশাদবাসৃজ।। (৫।১৫)

সেই মহাবিষ্ণু স্বীয় বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতিকে, এবং কুর্চদেশ অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়-মধ্য হইতে জ্যোতিলিঙ্গময় শম্ভুকে সৃষ্টি করিলেন।

ব্যষ্ট্যন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী পুরুষই শ্রীবিষ্ণু। হিরণ্যগর্ভরূপ ভগবদংশই প্রজাপতি; ইনি---চতুর্মুখব্রহ্মা হইতে পৃথক্; এই হিরণ্যগর্ভই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ব্রহ্মার বীজতত্ত্ব। জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভু---তদীয় মূলতত্ত্ব আদিলিঙ্গরূপ শম্ভুর প্রভূত প্রকাশ-মাত্র। বিষ্ণু---মহাবিষ্ণুর স্বাংশতত্ত্ব, অতএব সর্বমহেশ্বর; এবং প্রজাপতি ও শম্ভু--মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক-দেববিশেষ। স্বীয় শক্তি বামে থাকেন বলিয়া শ্রীমহাবিষ্ণুর চিচ্ছক্তির শুদ্ধসত্ত্ব হইতে বামাঙ্গে বিষ্ণুর উদয়। বিষ্ণুই ঈশ্বররূপে প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। বেদে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলিয়া তাঁহারই বর্ণন শুনা যায়; তিনিই পালনকর্তা; কর্মীলোক সমূহ তাঁহাকেই 'যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ' বলিয়া পূজা করেন এবং যোগিগণ 'পরমাত্মা' বলিয়া ধ্যান করত সমাধি প্রত্যাশা করেন।

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
গোবিন্দমাদিপুরুসং তমহং ভজামি।। (৫।৪৫)

দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণ-রূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যবশতঃ 'শম্ভূতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শম্ভু---কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' নন। যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা---গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ

যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার বিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমো-গুণ, তটস্থা-শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্গুণ, বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকার বিশেষ হয়। সেই বিকারবিশেষ-যুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস স্বরূপই---ঈশ্বর জ্যোতির্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন। সৃষ্টিকার্যে দ্রব্যবুাহময় উপাদান, স্থিতিকার্যে কোন-কোন অসুরের নাশ এবং সংহার-কার্যে সমস্তক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভু-স্বরূপে গোবিন্দ 'গুণাবতার' হন। শম্ভুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত আছে; প্রমাণসমূহ টীকায় ধৃত হইয়াছেন। ''বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ'' ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয়-কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তি লাভের সোপান-স্বরূপ ধর্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভুতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিক রূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি---'ঈশ্বর', তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।

(শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ পরিপূর্ণ গুণের মধ্যে যে পাঁচটী গুণ সাধারণ জীবে নাই; ব্রহ্মা ও শিবে আংশিকরূপে আছে তাহা--- ১। সদা স্বরূপ সংপ্রাপ্তি, ২। সর্বজ্ঞতা, ৩। নিত্যনূতনত্ব, ৪। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপত্ব ও ৫। সর্বসিদ্ধি বশকারিত্ব।)

ব্রহ্মসংহিতার আলোকে বিষ্ণুতত্ত্ব

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজমিহ।। ৬৪।।

এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্যবর্তি বা বাতি-গত হইয়া বিবৃত (বিস্তার) হেতু সমান-ধর্মের সহিত পৃথকভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ চরিষ্ণুভাবে যিনি প্রকাশ পা'ন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

(এক্ষণে হরিধামের অধিষ্ঠাতা 'হরি' 'নারায়ণ' 'বিষ্ণু' ইত্যাদি নাম-প্রাপ্ত স্বাংশ তত্ত্বের বর্ণনা করিতেছেন। কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি—পরব্যোমপতি নারায়ণ; তদীয় অংশ-আদ্যাবতার পুরুষ কারণোদকশায়ী, তদীয় অংশ গর্ভোদকশায়ী, এবং তদীয় অংশ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। 'বিষ্ণু' -শব্দবাচক তত্ত্বই তদীয় সর্বাবস্থা-ব্যাপক-তত্ত্ব। এই শ্লোকে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর তত্ত্ব-নিরূপণদ্বারা স্বাংশবিলাস নিরূপিত হইতেছে। সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণুতত্ত্ব মায়িক-গুণাদি-মিশ্র শম্ভুতত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ। গোবিন্দ যে স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা উভয়েই আছে; বিষ্ণু-নিবৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতু-রূপে গোবিন্দের সহিত সমান-ধর্মবিশিষ্ট। ত্রিগুণময়ী মায়াতে যে সত্ত্বগুণ আছে, তাহা রজস্তমো গুণে মিশ্রিত থাকায় অশুদ্ধ সত্ত্ব। ব্রহ্মা রজো-গুণোদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ এবং শম্ভু মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশ-প্রভাববিশিষ্ট বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের হেতু এই যে, মায়ার রজঃ ও তমোগুণদ্বয় নিতান্ত 'অচিৎ' বলিয়া তাহাতে উদিত তত্ত্বদ্বয়—স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্ম হইতে অত্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত। মায়ায় সত্ত্বগুণ মিশ্র হইলেও তন্মধ্যে যে বিশুদ্ধসত্ত্বাংশ আছে গুণাবতার বিষ্ণু তাহাতেই উদিত; সুতরাং বিষ্ণু পূর্ণ স্বাংশবিলাস এবং মহেশ্বর-তত্ত্ব; তিনি মায়াযুক্ত ন'ন, অথচ মায়ার প্রভু। হেতুরূপ গোবিন্দের স্বীয়ত্বের প্রকরণরূপই বিষ্ণু। তদীয় বিলাসমূর্তি নারায়ণে গোবিন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য অর্থাৎ ষষ্টিসংখ্যক গুণ পূর্ণরূপে আছে। অতএব ব্রহ্মা ও শিব যেরূপ মায়াগুণ-মিশ্র-তত্ত্ব, গুণাবতার হইয়াও বিষ্ণু সেরূপ

ন'ন। নারায়ণের মহাবিষ্ণুরূপে আবির্ভাব, মহাবিষ্ণুর গর্ভোদকশায়িরূপে আবির্ভাব এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে বিষ্ণুর অবির্ভাবই চরিষ্ণুধর্মের উদাহরণ। বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং অন্য গুণাবতারদ্বয় ও সমস্ত দেবগণ---তাঁহারই অধীন আধিকারিক তত্ত্ববিশেষ। মহাদীপ গোবিন্দের বিলাসমূর্তি হইতে মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী এবং রামাদি স্বাংশ অবতারসকল পৃথক্-পৃথক্-বহির্গত বা দশাগত দীপস্বরূপে গোবিন্দের চিচ্ছক্তিদ্বারা বিরাজমান।

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা

প্রথম অধ্যায়

নববিধ প্রমেয়সিদ্ধান্ত

প্রশ্ন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে কি আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন?

উত্তর। তাঁহার আজ্ঞা এই যে---শ্রীমধ্বাচার্য আমাদিগকে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিব।

প্র। গুরু-পরম্পরা কাহাকে বলে?

উ। গুরুদিগের আদিগুরু--ভগবান্। তিনি কৃপা করিয়া আদি কবি শ্রীব্রহ্মাকে তত্ত্বোপদেশ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস এবং ক্রমশঃ শ্রীব্যাস হইতে শ্রীমধ্বাচার্য সেই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই গুরু-শিষ্য-ক্রমে যে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম---গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশ।

প্র। শ্রীমধ্বাচার্য যে নয়টী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের নাম কি?

উ। তাহাদের নাম, যথা---

(১) ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব।

(২) তিনি অখিল-বেদবেদ্য।

(৩) বিশ্ব-সত্য।

(৪) ভেদ---সত্য।

(৫) জীব--শ্রীহরিদাস।

(৬) জীবসকলের অবস্থাভেদে তারতম্য।

(৭) কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি লাভই মোক্ষ।

(৮) ভগবানের অমল ভজনই মোক্ষ-লাভের হেতু।

(৯) 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'শব্দ'---এই তিনটী প্রমাণ।

(শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদ্ রচিত 'প্রমেয়রত্নাবলী' গ্রন্থে (১।৮) লিখিয়াছেন—

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদ্রচিত 'দশমূলতত্ত্বে'র মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতাংস্তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতিহরৌ গৌরচন্দ্রং ভজে তম্।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবান্ একমাত্র পরমতত্ত্ব

প্রশ্ন। ভগবান্ কে?

উত্তর। যিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়কে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-স্বরূপে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চিন্তাতীত, অথচ পরাশক্তি-প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে জীবের ভক্তিবৃত্তির বিষয়ীভূত, তাঁহার নাম—ভগবান্।

প্র। ভগবানের শক্তি কি প্রকার?

উ। ভগবানের শক্তি আমরা সম্যক্ বর্ণন করিতে পারি না। যেহেতু, শক্তির সীমা নাই, আমরা সীমাবিশিষ্ট; তজ্জন্যই তাঁহার শক্তিকে পরাশক্তি বলা যায়। যাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা তাঁহার পরাশক্তির পক্ষে অবলীলাক্রমে সম্ভব। সমস্ত বিপরীত ধর্ম সেই শক্তির দ্বারা অবলীলাক্রমে চালিত হয়।

প্র। ভগবান্ তবে কি শক্তির অধীন?

উ। ভগবান্ একটী বস্তু এবং শক্তি একটী বস্তু, এরূপ নয়। দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নি হইতে অভিন্ন, ভগবানের শক্তিও তদ্রূপ ভগবান্ হইতে অপৃথক।

প্র। ভগবান্ যদি একমাত্র পরম তত্ত্ব, তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির উপদেশ কেন দিয়াছিলেন?

উ। ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগবানের নিত্যগুণ। কোন গুণের অধিক প্রকাশ এবং কোন গুণের স্বল্প-প্রকাশ-অনুসারে ভগবৎ-স্বরূপের উদয়ভেদ আছে। যেখানে ঐশ্বর্যপ্রধান-প্রকাশ, সেখানে পরব্যোমনাথ নারায়ণের উদয়। যেখানে শ্রী বা মাধুর্য বলবান্, সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের উদয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার সর্বোত্তম প্রকাশ।

প্র। ভগবানের স্বরূপ কত প্রকার?

উ। স্বরূপ—একই প্রকার চিন্ময়, পরমসুন্দর, পরমানন্দময়, সর্বাকষক, লীলাময় ও বিশুদ্ধপ্রেমগম্য। জীবের স্বভাব-ভেদে সেই নিত্যস্বরূপের অনন্ত উদয়-ভেদ আছে। সেই উদয়-ভেদসকলকে নানাপ্রকৃতির জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই নিত্যানন্দস্বরূপ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা কি?

উ। চিজ্জগতের মধ্যে পরম রমণীয় বিভাগের নাম শ্রীবৃন্দাবন; তথায় সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা-সম্পাদকরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্বরূপে বিরাজমান। জীবের আনন্দস্বরূপ প্রকাশিত হইলে তথায় পরমানন্দ-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার সঙ্গিনীভাবে নিত্য-শ্রীকৃষ্ণলীলায় অধিকারলাভ হয়। সেই লীলায় শোক, ভয় বা মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। অজস্র চিদানন্দই সেই লীলার একমাত্র উপকরণ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক কি?

উ। প্রতিবন্ধক দুইটী—জড়বুদ্ধি এবং জড়চিন্তাতীত হইয়াও নির্বিশেষ-বুদ্ধি।

প্র। জড়বুদ্ধি কি?

উ। জড়ীয় দেশ, কাল, দ্রব্য, আশা, চিন্তা ও কর্ম যে বুদ্ধিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে, তাহাকে জড়বুদ্ধি বলে। জড়বুদ্ধিক্রমে বৃন্দাবনধামকে জড়ীয় ভূমিরূপে দৃষ্টি করে; কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিন ভাগে বিভাগ করে, নশ্বর দ্রব্য বলিয়া জানে; স্বর্গাদি অনিত্য সুখের আশা করে; জড় চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করিতে পারে না; সভ্যতা, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাংসারিক উন্নতি প্রভৃতি নশ্বর কর্মকে 'কর্তব্য' মনে করে।

প্র। নির্বিশেষবুদ্ধি কি?

উ। যে ধর্মদ্বারা জড় জগতে দ্রব্য সকল পরস্পর পৃথক্ থাকে, তাহাকে 'বিশেষ' বলে। জড়চিন্তা ত্যাগ করিবামাত্র যিনি ঐ বিশেষকে ত্যাগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি নির্বিশেষ হইয়া পড়ে; তিনি আর বস্তুভেদ দেখিতে পান না; অগত্যা আপনাকে নির্বাণ বা ব্রহ্মলয়াবস্থায় নীত করেন্। সেই অবস্থায় আনন্দ থাকে না; চিৎসুখ-রহিত হইলে প্রেম লোপ হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়াতীত বটে, কিন্তু চিন্ময়বিশেষ সম্পন্ন।

প্র। শ্রীকৃষ্ণলীলা যদি জড়াতীত, তবে দ্বাপরের শেষে পাশ্চাত্য— (উত্তর) প্রদেশে কিরূপে তাহা লক্ষিত হইয়াছিল?

উ। শ্রীকৃষ্ণলীলা জড়েন্দ্রিয়ের অগোচর বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তাহা জড়জগতে প্রকট হয়। প্রকট হইয়াও তাহা জড়মিশ্র বা জড় ধর্মাধীন হয় না। শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট ও অপ্রকট—উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ চিন্ময়। শ্রীকৃষ্ণলীলা —শুদ্ধ বৈকুণ্ঠগত, শ্রীবৃন্দাবননিষ্ঠ। তাঁহার প্রপঞ্চে প্রকট বা জীবহৃদয়ে উদয়— কেবল তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি ও অপারকৃপাহেতুক। প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেও তাঁহার লীলা হইতে জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ সহজে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে জড়বুদ্ধি দ্বারা দোষ দর্শন করে। জগাই-মাধাইর ন্যায় যাহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হয়, তাহারা সেই তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া তাঁহাতে অনুরক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিলে জীবের রসলাভ হয় না।

প্র। বৈষ্ণবধর্মে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের শিক্ষা আছে। অন্যান্য ধর্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের কি হইবে?

উ। অন্যান্য ধর্মে যে ঈশ্বর, পরমাত্মা ও ব্রহ্মের উপাসনার শিক্ষা আছে, সে সমুদয় কৃষ্ণতত্ত্বের উদ্দেশক। জীবের ক্রমোন্নতিক্রমে অবশেষে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। খণ্ডধর্ম সমুদয় সম্পূর্ণতা লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পারতম্যবুদ্ধিই জীবের চরম জ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়

ভগবান অখিলবেদ্য

প্রশ্ন। ভগবত্তত্ত্ব কিরূপে জানা যায়?

উত্তর। জীবের স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের দ্বারা জানা যায়।

প্র। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কি?

উ। জ্ঞান দুই প্রকার—স্বতঃসিদ্ধ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান—শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ জীবের সত্তাগত তত্ত্ব; তাহা চিদ্‌বস্তুমাত্রের ন্যায় নিত্য; তাহাকেই 'বেদ' বা 'আম্নায়' বলে। বদ্ধ জীবের সহিত সেই সিদ্ধজ্ঞানরূপ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। সাধারণ লোকে যে বিষয়জ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র।

প্র। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র-জ্ঞানে ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় কি না?

উ। না। ভগবান্—সমস্ত জড়েন্দ্রিয়ের অতীত, তজ্জন্যই তাঁহাকে 'অধোক্ষজ' বলা যায়। ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা পুষ্ট মনোগত যুক্তি সর্বদাই ভগবত্তত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে।

প্র। যদি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ লভ্য হ'ন, তবে আমাতেও যে স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা তিনি লভ্য হউন, বেদ-শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রয়োজন কি?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানরূপ বেদ সর্বজীবের শুদ্ধসত্তায় আছে। বদ্ধসত্তার তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ বেদ কাহাতে স্বয়ং প্রকাশিত হন, কাহাতেও বা আচ্ছাদিত থাকেন। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানের উদ্বোধকস্বরূপে লিপিবদ্ধ বেদসমূহ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্র। আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্—ভক্তিগ্রাহ্য; তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানগ্রাহ্য কিরূপে বলিব?

উ। যাহাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান বলে, তাহারই নাম 'ভক্তি'; পরতত্ত্বের সম্বেদনকে কেহ 'জ্ঞান' বলেন, কেহ 'ভক্তি' বলেন।

প্র। তবে ভক্তিশাস্ত্রে কেন জ্ঞানকে তিরস্কার করিয়াছেন?

উ। স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানকে ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ আদর করিয়াছেন; তাহা ব্যতীত জীবের অন্য শ্রেয়ঃ নাই। কেবল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জ্ঞান ও তদ্ব্যতিরেক জ্ঞান অর্থাৎ নির্বিশেষ জ্ঞানের তিরস্কার দেখা যায়।

প্র। অখিল বেদশাস্ত্রে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—তিনেরই কথা আছে, ইহার মধ্যে কাহার দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়?

উ। সমস্ত বেদবাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখিলে ভগবান্ বই আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না। বৈদিক কর্মসকলও চরমে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করে। জ্ঞান পরিশুদ্ধ

অবস্থায় বিষয় ও নির্বিষয় উভয়াত্মক দ্বন্দ্ব পরিত্যাগপূর্ব'ক ভগবান্‌কে লক্ষ্য করে। ভক্তি স্বভাবতঃ ভগবানের অনুশীলন করে; অতএব তিনি অখিল-বেদ-বেদ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব সত্য

প্র। কেহ বলেন এই বিশ্ব মিথ্যা, কেবল মায়ানির্মিত। ইহাতে বাস্তব কথা কি?

উ। এই বিশ্ব সত্য, কিন্তু নশ্বর। 'সত্য' ও 'নিত্য' এই দুইটী বিশেষণের অর্থ —পৃথক্; বিশ্ব নিত্য নয়, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় কোন সময় নষ্ট হইতে পারে। বিশ্ব বাস্তব, মিথ্যা নয়। শাস্ত্রে কোন স্থলে বিশ্বকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে, তাহার দ্বারা কেবল ইহার নশ্বরতা বুঝাইবে।

প্র। মায়া কি?

উ। ভগবানের যে একমাত্র পরাশক্তি আছে, তাঁহার অনন্ত বিক্রমের মধ্যে আমাদের নিকট তিনটী বিক্রমের পরিচয় আছে। সেই তিনটী বিক্রম--- (১) চিদ্‌বিক্রম, (২) জীববিক্রম, (৩) মায়াবিক্রম। চিদ্‌বিক্রম হইতে ভগবত্তত্ত্বের স্বীয় স্ফূর্তি ও প্রকাশ। জীববিক্রম হইতে অণুচৈতন্যরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াছে; মায়াবিক্রম হইতে এই জড়ীয় বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। মায়াবিক্রম হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইয়াছে, সেই সমুদয়ই নশ্বর এবং যখন উদ্ভূত হইয়াছে, তখন সেই সমুদয়ই সত্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ভেদ সত্য

প্রশ্ন। জীব ও ভগবান্ উভয়েই যখন চৈতন্য পাদবাচ্য, তখন তাঁহাদের ভেদ্ কি কাল্পনিক?

উত্তর। না। ভগবান্--বিভূচৈতন্য এবং জীব--অণুচৈতন্য; তাঁহাদের পরস্পর ভেদ কাল্পনিক নয়, কিন্তু বাস্তবিক ভগবান্ স্বীয় মায়াশক্তির ঈশ্বর এবং জীব মায়ার অধীন।

প্র। ভেদ কয় প্রকার?

উ। দুই প্রকার---ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক।

প্র। ব্যবহারিক ভেদ কি প্রকার?

উ। ঘট হইতে পটের ব্যবহারিক ভেদ আছে, কিন্তু উভয়ের কারণ যে মৃত্তিকা, সে অবস্থায় উভয়ের ভেদ নাই; এই ভেদের নাম ব্যবহারিক ভেদ।

প্র। তাত্ত্বিক-ভেদ কি প্রকার?

উ। একবস্তু অন্যবস্তু হইতে কার্য ও কারণ, উভয় অবস্থায় যখন ভেদ স্বীকার করে, তখন তাহাকে 'তাত্ত্বিক' ভেদ বলে।

প্র। জীব ও ভগবানের যে ভেদ, তাহা 'ব্যবহারিক', না 'তাত্ত্বিক'?

উ। তাত্ত্বিক।

প্র। কেন?

উ। কোন অবস্থাতেই জীব ভগবান্ হইবে না।

প্র। তবে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের কিরূপে অর্থ করা যায়?

উ। শ্বেতকেতুকে উপদেশ করা হইল যে, 'তুমি জীব, জড়জাতীয় নহ, কিন্তু চৈতন্যজাতীয়। এইরূপ উপদেশ হইতে বুঝিতে হইবে না যে, তুমি বিভূচৈতন্য।'

প্র। তবে কি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বাক্য ব্যবহার করা যাইবে না?

উ। জীবপক্ষ হইতে বিচার করিলে ভেদই নিত্য হয়; ব্রহ্মপক্ষ হইতে বিচার করিলে অভেদ নিত্য হয়। অতএব ভেদ ও অভেদ—একই কালে নিত্য ও সত্য।

প্র। এরূপ বিরুদ্ধ-সিদ্ধান্ত কিরূপে মানা যায়?

উ। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা বিরুদ্ধ-তত্ত্ব সকলই সামঞ্জস্য লাভ করে; ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব বোধ হয়।

প্র। তবে অভেদবাদের তিরস্কার কি জন্য শুনিতে হয়?

উ। অভেদবাদীরা কেবল অভেদকে নিত্য বলেন, ভেদকে অনিত্য বলেন। শ্রীমধ্বাচার্য ভেদকে নিত্য বলিয়া সংস্থাপন করায় 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদমত' * যথার্থ নিশ্চিত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদীর দোষ নাই; কেবল-ভেদবাদী বা কেবল-অভেদবাদীরা একমতের পক্ষপাত-দোষে দূষিত।

প্র। কেবল-অভেদবাদ কাহাদের মত?

উ। নির্বিশেষবাদীরাই কেবল-অভেদ স্বীকার করেন। সবিশেষবাদীরা কেবল-অভেদ স্বীকার করেন না!

প্র। সবিশেষবাদ কাহার মত?

উ। সবিশেষবাদ-সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত।

প্র। বৈষ্ণবদিগের কয়টা সম্প্রদায়?

উ। চারিটী সম্প্রদায়---দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধাদ্বৈত।

প্র। ইঁহাদের মতে কি কি বিষয়ের ভেদ?

উ। ইঁহাদের মতের বাস্তব ভেদ নাই; ইঁহারা সকলেই সবিশেষবাদী। ইঁহারা সকলেই ভগবৎপরায়ণ এবং ভগবচ্ছক্তি স্বীকার করেন।

দ্বৈতবাদী বলেন যে, কেবল-অদ্বৈতবাদ---নিতান্ত অন্ধমত; তিনি দ্বৈতবাদের নিত্যতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্যের এই মত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন যে, বিশেষ্য বস্তু---বিশেষণান্বিত, অতএব কেবলাদ্বৈত নহেন।

দ্বৈতাদ্বৈত মতটী অত্যন্ত পরিষ্কাররূপে কেবল অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার করেন।

শুদ্ধাদ্বৈতমতও কেবল-অদ্বৈতবাদকে তিরস্কার পূর্বক শুদ্ধরূপ বিশেষণদ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভালরূপে বুঝিয়া দেখিলে উক্ত চারি মতে কোন ভেদ নাই।

প্র। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কেবল মাধ্বমতকে কেন অঙ্গীকার করিলেন?

উ। মাধ্বমতের বিশেষ গুণ এই যে, ইহা কেবলঅদ্বৈতবাদরূপ ভ্রমকে অধিক স্পষ্টরূপে খণ্ডন করে। ঐ মতে অবস্থান করিলে অভেদবাদরূপ পীড়া অনেক দূরে থাকে। দূর্বল মানবের নিশ্চয় মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ঐ মতকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অন্য তিন মতের কোন প্রকার লঘুতা মনে করিতে হইবে না। সবিশেষবাদ যে মতে, যে কোন প্রকারে থাকুক অবশ্যই জীবের নিত্যমঙ্গল বিধান করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীব হরিদাস

প্রশ্ন। জীবের নিত্যধর্ম কি?

উত্তর। কৃষ্ণদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম।

প্র। জীবের বৈধর্ম্য কি?

উ। অভেদবাদ স্বীকার পূর্বক স্বীয় নির্বাণ-অনুসন্ধান অথবা জড়গত সুখ বা সামর্থ্য অন্বেষণ করাই জীবের বৈধর্ম্য।

প্র। সে সমস্ত কার্যকে কেন বৈধর্ম্য বলি?

উ। জীব--চিন্ময়; চিন্ময় বস্তুমাত্রেরই ধর্ম---আনন্দ বা প্রীতি। নির্বিশেষবাদে আনন্দ নাই। কেবল চরম বিনাশই একমাত্র প্রয়োজন। জড়ীয় বিশেষ (বৈশেষিক) বাদে জীবের চিদ্ধর্মের বিশেষ হানি। নির্বিশেষবাদ বা জড়বাদ উভয়ই জীবের বৈধর্ম্য।

প্র। জড়গত সুখ কাহারা অন্বেষণ করেন?

উ। কর্মজড় পুরুষগণই কর্মমার্গে স্বর্গাদি জড় সুখ অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়গত সামর্থ্য কাঁহারা অন্বেষণ করেন?

উ। অষ্টাঙ্গ-যোগীদের মধ্যে যাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহারা এবং ষড়ঙ্গ-যোগিগণ বিভূতিফলে জড় সামর্থ্যই অন্বেষণ করেন।

প্র। জড়জগতের সুখ বা নির্বাণ তিরস্কৃত হইলে জীবের আর কি রহিল?

উ। জীবের নিজসুখ রহিল। প্রাগুক্ত দুই প্রকার সুখই সোপাধিক; নিজ-সুখানুভূতিই নিরুপাধিক।

প্র। নিজসুখানুভূতি কি?

উ। জড়সম্বন্ধরহিত জীবের যে শুদ্ধচৈতন্যগত কৃষ্ণানুশীলন-সুখ,তাহাই নিজসুখ।

সপ্তম অধ্যায়

জীবের তারতম্য

প্রশ্ন। সকল জীব কি এক প্রকার, না তাহাদের তারতম্য আছে?

উত্তর। তারতম্য আছে।

প্র। কত প্রকার তারতম্য আছে?

উ। দুইপ্রকার তারতম্য---স্বরূপগত তারতম্য ও উপাধিগত তারতম্য।

প্র। জীবের উপাধি কি?

উ। কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ মায়াসমূহই জীবের উপাধি।

প্র। সকল জীবই কেন নিরুপাধিক না থাকিল?

উ। যাঁহারা দাস্য ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহারা স্বীয় স্বরূপগত নিরুপাধিকত্ব পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহাদের কৃষ্ণসাম্মুখ্য নিত্য। যাঁহারা ভোগকে স্বার্থ মনে করিয়া কৃষ্ণবিমুখতা স্বীকার করিলেন, তাঁহারা মায়ানির্মিত এই কারাগাররূপ বিশ্বে আবদ্ধ হইলেন।

প্র। কৃষ্ণ যদি এরূপ দুর্বুদ্ধি হইতে জীবকে রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; কেন তাহা না করিলেন?

উ। এ বিষয়ে জীবের যদি স্বতন্ত্রতা না থাকিত তাহা হইলে জীবের স্বরূপটী জড়সাম্য লাভ করিত; তাহাতে চিদ্‌বস্তুর যে স্বতন্ত্রানন্দ, তাহা লাভ হইত না।

প্র। জীবের স্বরূপ কি?

উ। জীব চিদ্‌বস্তু; আনন্দই তাহার ধর্ম্ম।

প্র। স্বরূপগত তারতম্য কত প্রকার?

উ। পঞ্চ প্রকার। চিজ্জগতে যে পাঁচটী নিত্যরস আছে, সেই সেই রসে অবস্থিত হইয়া জীবের স্বরূপগত তারতম্য।

প্র। পাঁচ প্রকার রস কি কি?

উ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার।

প্র। ঐ পাঁচটী শব্দের অর্থ বলুন।

উ। (১) সম্বন্ধহীন কৃষ্ণানুরক্তির নাম—শান্ত রতি।

(২) সম্বন্ধযুক্ত কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম —দাস্যরতি।

(৩) সম্বন্ধযুক্ত, সম্ভ্রমহীন, অথচ বিশ্রম্ভযুক্ত কৃষ্ণানুরক্তির নাম—সখ্যরতি।

(৪) সম্বন্ধযুক্ত, স্নেহপূর্ণ কৃষ্ণানুরক্তির নাম— বাৎসল্যরতি।

(৫) সৌন্দর্যযুক্ত রাগাবস্থা-প্রাপ্ত রতির নাম—শৃঙ্গার-রতি।

প্র। রতি ও রসে ভেদ কি?

উ। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী (বা সঞ্চারী)—(চতুষ্টয়) যোগে রতি পুষ্টা হইলে নিত্যসিদ্ধ রসের উদয় হয়। রস—পরমানন্দস্বরূপ।

প্র। উপাধিগত তারতম্য কত প্রকার?

উ। তিন প্রকার; যথা— (১) নিত্যযুক্ত অর্থাৎ জড়াতীত; (২) বদ্ধমুক্ত অর্থাৎ জড়ে আছে, কিন্তু আবদ্ধ নয়; (৩) নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ।

প্র। ইহাদের মধ্যে কাহারা নিত্যবদ্ধ?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কোচিত-চেতন ও মুকুলিত-চেতন—এই তিন প্রকার জীবই নিত্যবদ্ধ।

প্র। বদ্ধমুক্ত জীব কত প্রকার?

উ। দুই প্রকার (১) বিকচিত-চেতন অর্থাৎ সাধক-ভক্ত; (২) পূর্ণবিকচিত-চেতন অর্থাৎ (স্থায়ী) ভাবভক্ত।

প্র। নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত জীবসকল কোথায় থাকেন?

উ। এই মায়িক বিশ্বে।

প্র। নিত্যমুক্ত জীব কোথায় থাকেন?

উ। চিজ্জগতে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে।

প্র। মুকুলিত-চেতন জীবের তারতম্য কত প্রকার?

উ। অনেক প্রকার; তত্ত্বলাঘব-প্রক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে ছয় প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা— (১) অসভ্য মূর্খ নর, যেমন—পুলিন্দ, শবরাদি।

(২) সভ্যতা, জড়বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানাদিসম্পন্ন নর--যাহার নীতি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস নাই, যেমন--ম্লেচ্ছাদি।

(৩) নিরীশ্বর অথচ সুন্দর-নীতিপরায়ণ নর, যেমন--বৌদ্ধাদি।

(৪) কল্পিত-ঈশ্বরবাদ (বিশ্বাস) যুক্ত নীতি পরায়ণ; যেমন--কর্মবাদিগণ।

(৫) বাস্তব ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াও যে নর ভক্তি স্বীকার করে নাই।

(৬) নির্বিশেষবাদ-পরায়ণ নর; ইহাকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্র। ইহাদের তারতম্য কি প্রকার?

উ। আচ্ছাদিত-চেতন হইতে মুকুলিত-চেতন পর্যন্ত ভক্তিতত্ত্বের উপযোগিতার তারতম্যানুসারে ঐ সকল জীবের তারতম্য বিচারিত হয়। বিকচিতচেতন ও পূর্ণবিকচিত-চেতনের যে তারতম্য, তাহা স্পষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভই মোক্ষ

প্রশ্ন। মোক্ষ কত প্রকার?

উত্তর। লোকে—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যকে মোক্ষ বলে। তন্মধ্যে 'সাযুজ্যনির্বাণ' ও 'একত্ব' নামলব্ধ যে মোক্ষ-চিন্তা, তাহা নির্বিষেযবাদের অন্তর্গত ভ্রমবিশেষ; জীবের তাহা চিন্ত্যনীয় নয়; ব্রহ্ম-পক্ষ হইতে বিচার করিলে তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হয়। যখন যুগপৎ ভেদাভেদই সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, তখন ভেদনাশক একমাত্র অভেদবাদ স্থায়ী হইতে পারে না।

প্র। তবে প্রকৃত মোক্ষ কাহাকে বলি?

উ। বিশুদ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়-লাভই মোক্ষ।

প্র। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়কে কেন মোক্ষ বলিব?

উ। শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয় ও জড়সম্বন্ধ-মোচন যুগপৎ উপস্থিত হয়। মোচন-কার্যটী ক্ষণিক উপস্থিত হইয়া ফলদান করতঃ ভক্তিতে পর্যবসিত হয়। কৃষ্ণচরণামৃত-পানানন্দই নিত্যফলরূপে অবস্থিত; অতএব আর কাহাকে মোক্ষ বলিব?

প্র। একটী উদাহরণ দিয়া বলুন।

উ। দীপ প্রজ্বলিত হইলে অন্ধকার-নাশ ও আলোক যুগপৎ উদিত হয়। অন্ধকার-নাশ-মোক্ষ স্থানীয় তত্ত্ব এবং দীপালোক কৃষ্ণচরণামৃতস্থানীয় তত্ত্ব। দীপালোক—নিত্য; আর অন্ধকার-নাশ নিত্য নয়, কোন সময় হইয়া থাকে; আলোক প্রকাশই নিত্যতত্ত্ব।

নবম অধ্যায়

অমল কৃষ্ণভজনই মোক্ষজনক

প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতলাভরূপ মোক্ষ কি করিলে পাওয়া যায়?

উত্তর। অমল কৃষ্ণভজন করিলে কৃষ্ণচরণামৃত লাভ হয়।

প্র। অমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলে?

উ। জড়বদ্ধজীব কৃষ্ণসাম্মুখ্যলাভের জন্য যে সাধ্যমত মলশূন্য ভজন করেন, তাহারই নাম কৃষ্ণ ভজন।

প্র। কৃষ্ণ-ভজনের মল কি কি?

উ। ভোগবাঞ্ছা, নির্বিশেষগতি-বাসনা ও সিদ্ধি কামনা---এই তিনটী ভজন-মল।

প্র। ভোগবাঞ্ছা কাহাকে বলে?

উ। ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখভোগ, পারত্রিক স্বর্গাদিভোগ ও শুষ্কবৈরাগ্যগত শান্তিসুখ, এই তিন প্রকার ভোগবাঞ্ছা।

প্র। ইন্দ্রিয়-বিষয়-ত্যাগ, পরকালে সুখজনক ধর্মত্যাগ ও বৈরাগ্য বিসর্জন করিলে কিরূপে দেহরক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল সাধিত হইবে এবং বিষয়াগ্রহ-জনিত কষ্ট নিবৃত্তি হইবে?

উ। ইন্দ্রিয়বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে না, জগন্মঙ্গলজনক ধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না এবং শান্তিজনক বৈরাগ্যকে অনাদর করিতে হইবে না। তত্তদ্বিষয়ে যে ভোগবাঞ্ছা ও আগ্রহ, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

প্র। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়?

উ। বর্ণাশ্রমধর্ম-পালন পর্যন্ত সমস্ত শারীরিক মানসিক সামাজিক কার্য কর। ঐ সকল কার্য এইরূপে কর, যেন তদ্দ্বারা তোমার কৃষ্ণ-ভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলনকার্যের সুন্দর সাহায্য হয়; কোন প্রকারেই যেন তদ্দ্বারা ঐ অনুশীলনের প্রতিবন্ধকতা না হয়। যে কিছু অবসর পাও তাহাতে সাক্ষাৎ অনুশীলন-কার্যের দ্বারা ভক্তিবৃত্তির পুষ্টি কর; তাহা হইলে কর্ম, ধর্ম ও বৈরাগ্য একত্র তোমার পরমোন্নতির সাধক হইবে।

প্র। জড়ীয় কর্মসমূহই চিত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ, তাহা করিতে গেলে কিরূপে চিৎস্বভাবের পুষ্টি হইবে?

উ। সমস্ত বিষয়ে বিষয়জ্ঞানে ও বিষয়-সম্বন্ধে কৃষ্ণভক্তিজনিত ভাববিশেষকে মিশ্রিত কর। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত কর; কৃষ্ণপ্রসাদ-সেবন, কৃষ্ণগুণানুকীর্তন, কৃষ্ণচরণ-স্পৃষ্ট তুলসীচন্দন-আঘ্রাণ, কৃষ্ণকথার শ্রবণকীর্তন, কৃষ্ণ সম্বন্ধী ব্যক্তি ও বস্তুর স্পর্শন ও কৃষ্ণদর্শন ইত্যাদি ক্রিয়াসকলদ্বারা তোমারআত্মার কৃষ্ণানুরক্তি উদ্দীপিত কর। ক্রমশঃ সকল কর্মই কৃষ্ণার্পিত হইলে তাহারা ভাবোদয়ের বাধক না হইয়া সাধক হইয়া পড়িবে।

প্র। যদি শরীর-যাত্রার জন্য সামান্য কর্ম স্বীকার করি এবং অভ্যাসদ্বারা-নিবৃত্তি করি, তাহা হইলে জ্ঞান-সমাধিক্রমে কৃষ্ণভক্তি উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে কি না?

উ। না। চিত্তগতরাগ ইন্দ্রিয়-বিষয় লইয়া আছে; যম, নিয়ম ও প্রত্যাহার-বিষয়ে চেষ্টা করিলেও তাহার ইন্দ্রিয়-বিষয়-নিবৃত্তি দুর্ঘট; যেহেতু রাগকে যতক্ষণ আর একটী সুন্দর বিষয় না দেখাইবে, সে পর্যন্ত রাগ পূর্ববিষয় ত্যাগ করিবে না। রাগের স্রোতোমুখে যদি উৎকৃষ্ট বিষয় রাখ, তবে তাহাকে অবলম্বন করত তদ্‌গত হইয়া পড়িলে পূর্ববিষয় সহজেই পরিত্যক্ত হইবে। অতএব পূর্বে যে প্রণালী উক্ত হইয়াছে, তাহাই অমল কৃষ্ণভজন।

প্র। তবে সমল কৃষ্ণভজন কাহাকে বলি?

উ। কর্মাগ্রহবুদ্ধি, যোগচেষ্টা ও নির্বিশেষ-মুক্তি বাঞ্ছার সহিত যে কৃষ্ণভজন তাহা 'সমল'; তদ্দ্বারা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি লাভরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না।

প্র। অমল কৃষ্ণভজনের সংক্ষেপ ব্যবস্থা বলুন।

উ। নিষ্পাপ ভাবে শরীর ও সংসারযাত্রা-কার্যে যাহা কিছু ন্যায়পর হইয়া করা যায়, তাহাকে কৃষ্ণভক্তির সহকারিরূপে 'গৌণী ভক্তি' বলিয়া অবলম্বন কর; যে কিছু অবসর পাও, তাহাতে কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাৎ অনুশীলন কর।

প্র। সাক্ষাৎ অনুশীলন কত প্রকার ও কি কি?

উ। নয় প্রকার; যথা--- ১। কৃষ্ণকথা শ্রবণ; ২। কীর্তন; ৩। কৃষ্ণ-স্মরণ; ৪। পাদসেবন; ৫। অর্চন; ৬। বন্দন; ৭। দাস্য; ৮। সখ্য; ৯। আত্মনিবেদন।

প্র। এ সকল অনুশীলনদ্বারা কি হইবে?

উ। ভাবোদয়ক্রমে প্রেমোদয় হইবে।

প্র। বাক্যের দ্বারা বলা যায় না; তাহা রস; অতএব আস্বাদনদ্বারা অবগত হও।

প্র। সাধনকালে কি কি বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্তব্য?

উ। বিকর্ম, অকর্ম, কর্মজড়তা, শুষ্কবৈরাগ্য, শুষ্কজ্ঞান ও অপরাধ হইতে সতর্ক হইতে হয়।

প্র। বিকর্ম কতগুলি ও কি কি?

উ। বিকর্ম অনেক প্রকার; নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবল পাপ, যথা--- (১) দ্বেষ, (২) নিষ্ঠুরতা, (৩) ক্রূরতা, (৪) জীবহিংসা, (৫) পরস্ত্রীলোভ, (৬) ক্রোধ, (৭) পরদ্রব্যলোভ, (৮) স্বার্থপরতা, (৯) মিথ্যা, (১০) অবমাননা, (১১) গর্ব, (১২) চিত্তবিভ্রম, (১৩) অপবিত্রতা, (১৪) জগন্নাশকার্য ও (১৫) পরের অপকার।

প্র। অকর্ম কি কি?

উ। নাস্তিকতা, অকৃতজ্ঞতা ও মহৎসেবার অভাব।

প্র। কর্ম কি?

উ। পুর্ণ্যকর্ম-সকলকে কর্ম বলে; পুণ্যকর্ম অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান--- (১) পরোপকার, (২) গুরুজনের সেবা (৩) দান, (৪) জগদ্‌বৃদ্ধি, (৫) সত্য, (৬) পবিত্রতা, (৭) সরলতা, (৮) ক্ষমা, (৯) দয়া, (১০) অধিকার অনুসারে কার্য করা, (১১) যুক্তবৈরাগ্য ও (১২) অপক্ষপাত বিচার।

প্র। কর্মজড়তা কি?

উ। পুণ্যকর্মদ্বারা যে জড়ীয় লাভ হয়, তাহাকে যথেষ্ট মনে করিয়া চিদুন্নতি যত্ন হইতে পরান্মুখ হওয়ার নাম কর্ম-জড়তা।

প্র। শুষ্ক বৈরাগ্য কি?

উ। চেষ্টা করিয়া যে বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়, তাহার নাম শুষ্ক বা ফল্গু-বৈরাগ্য; ভক্তি বৃদ্ধি হইলে যে বৈরাগ্য স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিরক্তি 'যুক্তবৈরাগ্য'।

প্র। শুষ্কজ্ঞান কি?

উ। যে জ্ঞান চিত্তত্ত্বের বিশেষকে দেখিতে না পায়,তাহার নামই শুষ্কজ্ঞান।

প্র। অপরাধ কত প্রকার?

উ। অপরাধ দুই প্রকার---সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

প্র। অমল-ভজন সংক্ষেপতঃ কি প্রকার?

উ। অনাসক্তভাবে সংসার স্বীকার করত শুদ্ধজ্ঞানলাভপূর্বক সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্তন করিলে অমল ভজন হয়।

দশম অধ্যায়

শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান তিনটী প্রমাণ

প্রশ্ন। প্রমাণ কি?

উ। যাহাদ্বারা সত্য নিরূপিত হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে।

প্র। প্রমাণ কয় প্রকার?

উ। তিন প্রকার।

প্র। কি কি?

উ। শব্দ,প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্র শব্দ প্রমাণ কাহাকে বলি?

উ। স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞানাবতারস্বরূপ অখিল-বেদই শব্দপ্রমাণ--ইহাই সর্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু ঐ প্রমাণ ব্যতীত প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না।

প্র। কেন প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা 'ঈশ্বর ও পরলোক' লক্ষিত হয় না?

উ। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানসকলই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ; অনুমান কেবল তদ্দৃষ্টে কোন প্রকার ব্যাপ্তি-বোধ। ইহারা কেবল জগতের জ্ঞান দান করিতে পারে।

প্র। তবে পরমার্থতত্ত্বে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কেন স্বীকার করি?

উ। শব্দপ্রমাণ-দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, তাহার পারিপাট্যসিদ্ধকার্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান কার্যকারক হইয়া থাকে।

(এই 'বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালা' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক রচিত ও প্রচারিত প্রথম গুটি)

শ্রুতি-তাৎপর্য্য

নিগম-শাস্ত্র---অত্যন্ত বিপুল। তাহার কোন অংশে 'ধর্ম্ম', কোন অংশে 'কর্ম্ম', কোন অংশে 'সাংখ্য জ্ঞান' এবং কোন অংশে 'ভগবদ্ভক্তি' বিস্তীর্ণরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐসমস্ত ব্যবস্থার পরস্পর সম্বন্ধ কি এবং কখনই বা কোন্ ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থান্তর স্বীকার করা কর্ত্তব্য,---এরূপ ক্রমাধিকার-তত্ত্ব ঐ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বল্পায়ুবিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণমেধাযুক্ত কলিজাত জীবগণের পক্ষে উক্ত বিপুল শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূর্ব্বক অধিকার-ক্রমে কর্ত্তব্য নির্ণয় করা---অতীব কঠিন। অতএব ঐ সমস্ত ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত ও সরল বৈজ্ঞানিক মীমাংসা---নিতান্ত আবশ্যক। দ্বাপরান্ত-কালপর্য্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া কেহ কর্ম্মকে, কেহ যোগকে, কেহ সাংখ্য-জ্ঞানকে, কেহ তর্ককে, কেহ বা অভেদ ব্রহ্মবাদকে 'একমাত্র গ্রাহ্য মত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতেছিলেন। তদ্দ্বারা ভারতভূমিতে খণ্ডজ্ঞান-জনিত অসম্পূর্ণ মতসমূহ পাকস্থলীগত অচর্ব্বিত খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত করিয়াছিল।

যে সকল গ্রন্থে 'কর্ম্ম' বা জ্ঞানকে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থ তত্তদ্ব্যবস্থার অধিকারীদিগের পক্ষেই কল্যাণপ্রদ। সেই সেই ব্যবস্থাকে 'চরম-ব্যবস্থা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট না করিলে, তাহা ত্যাগ করিয়া অবস্থান্তর স্বীকারস্থলে সেই ব্যবস্থার অধিকারীদিগের নিতান্ত অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা,—এরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম-শাস্ত্রে কর্ম্মকে ও জ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞানকে 'সর্ব্বোত্তম' বলা হইয়াছে। এই প্রকার কৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা এস্থলে বিচার করা যাইতেছে না, কেবল উক্ত কৌশল যে বহুতর-শাস্ত্রে অবলম্বিত হইয়াছে, ইহাই বিজ্ঞাত হউক। যে গ্রন্থে সাধনকালে কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তি এবং ফলকালে নিরুপাধিকপ্রীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই গ্রন্থই সর্ব্বজীবের নিতান্ত-শ্রেয়স্কর। উপনিষৎ সমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদগীতা---সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্র। স্থলবিশেষ আবশ্যকতা-মতে ঐ সকল শাস্ত্রে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'মুক্তি', 'ব্রহ্মলাভ' ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু চরম-মীমাংসাস্থলে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই।

সরল-বুদ্ধিদ্বারা আলোচনা করিলে জীবের জড় বদ্ধাবস্থাকে শোচনীয় অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। শোচনীয় অবস্থা হইতে কোন মঙ্গলময় বিশুদ্ধ অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। সেই বিশুদ্ধ অবস্থাকে 'উপেয়' বা 'প্রয়োজন' বলি; যদ্দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে 'উপায়' বলি। শাস্ত্রকারগণ---কেহ 'যজ্ঞ'কে, কেহ 'যোগ'কে, কেহ 'তর্ক'কে, কেহ 'পুণ্য'কে, কেহ 'বৈরাগ্য'কে, কেহ 'তপস্যা'কে, কেহ 'ধর্ম্মযুদ্ধ'কে, কেহ ঈশ্বরোপাসনা'কে, কেহ 'ধর্ম্ম'কে, কেহ 'গুরূপসত্তি'কে, কেহ 'প্রায়শ্চিত্ত'কে ও কেহ 'দান'কে (প্রয়োজনপ্রাপ্তির) 'উপায়' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবম্বিধ নানা নামে অবৈজ্ঞানিকরূপে অভিহিত হইয়া উপায়তত্ত্ব অসংখ্য হইয়া উঠিল। কালে বিজ্ঞান ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, কাযে-কাযেই সংখ্যার লাঘব হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে, ঐ সকল উপায়---ভিন্ন ভিন্ন তিনটী তত্ত্বের অধীন; ঐ তিনটী তত্ত্বের নাম---'কর্ম্ম', 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'।

স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিশুদ্ধ-বিচারদ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীবের সিদ্ধসত্তা---চিন্ময়ী। মাতৃগর্ভে উৎপত্তি---কেবল ঐ সিদ্ধসত্তার জড়বদ্ধা-দশামাত্র। অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্যশক্তি ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত চিৎতত্ত্বের জড়-সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তর্গত নহে। অতএব উভয়দশা-ভেদে, জীব দুইপ্রকার---'মুক্ত' ও 'বদ্ধ'। মুক্তজীব---দুই প্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হন নাই (অর্থাৎ নিত্যমুক্ত) এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত)। উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রাতীত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধজীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবে নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞান---প্রেম-বৃত্তির উপাধি বিশেষ। সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্যধর্ম্মকে স্পর্শ করে, তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতারূপ উপাধি সহকারে প্রেমবৃত্তি 'বিকৃত' হইয়া ধর্ম্ম (পুণ্য কর্ম্ম) রূপ একটি আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে 'জ্ঞান'-রূপে আর এক প্রকার আকার পাইয়া থাকে; সাধন-ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে 'সাধনভক্তি'-রূপ আকারটীই বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য লক্ষণ, অপর দুইটি আকার---জড়সম্বন্ধ-রূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর-সত্ত্বে কর্ম্ম---অপরিহার্য্য। শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করা যায়, তন্মধ্যে যে সকল কর্ম্ম-জগতের অমঙ্গলজনক সে সকলকে 'বিকর্ম্ম'

বা 'কুকর্ম্ম' বলে; মঙ্গলজনক কর্ম্ম না করার নামই 'অকর্ম্ম' যে-সকল কর্ম্ম---জগন্মঙ্গলজনক, সেই সকলকে 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম--চারিপ্রকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্ম্ম মাত্রেরই একটি একটি অবান্তর ফল আছে; যথা, আহারের ফল---শরীর-পোষণ ও বিবাহের ফল---সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে দৃষ্টি করিলে শান্তিই ঐ সকল ফলের 'চরম ফল' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়-যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কর্ম্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক শারীরিক, ও মানসিক কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গযোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম,—এই চারিটী 'শারীর' যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা---ইহারা 'মানস'-যোগ এবং সমাধি---'আধ্যাত্মিক' যোগ। এই সমুদয়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। বেদে ও মন্বাদি বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম-বিহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক-কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের আপাততঃ অবান্তর ফলসমূহ কথিত হইয়াছে বটে কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শান্তি-লক্ষণ ফলেরই উল্লেখ দেখা যায় না। অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতিপাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া, কৈবল্য-পাদে কেবল 'শান্তি'কেই 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্ম্মই প্রথমে সুখভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে; কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শান্তি সুখকেই ' শ্রেষ্ঠ' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্যবদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি---'ভুক্তি' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাবমাত্র, স্বয়ং 'সুখবিশেষ' নহে। তখন কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎসুখের অন্বেষণ হয়। অভেদ-ব্রহ্মসুখ-পর্য্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবা-সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই 'কর্ম্ম' 'ভক্তি'-রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে কর্ম্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সে কর্ম্ম---ভগবদ্-বহির্ম্মুখ; তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলা যায়। ভগবৎসেবা-পরায়ণ তাদৃশ কর্ম্মের নাম 'সাধনভক্তি' হয়, তখন কর্ম্ম-নাম থাকে না।

জড়বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিন্ময়-তত্ত্ব, অতএব তাহার পক্ষে জ্ঞানালোচনা—স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা—চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয়-জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিগ-জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধ-জ্ঞানালোচনা। দর্শন-শ্রবণাদিময় জড়ীয় 'বিষয়-জ্ঞান'ই 'জড়ীয় জ্ঞান'। ধ্যান-ধারণাকল্পনা-বিভাবনাময় মানস-জগতের জ্ঞানকেই 'লৈঙ্গিকজ্ঞান' বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক-জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত 'সমাধি' অথবা সাংখ্যযোগীর অতন্নিরসন প্রক্রিয়াদ্বারা স্থগিত করিলে, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক-জ্ঞান-রূপ 'কূট সমাধি' হয়। এই স্থলে শাঙ্করীয় অভেদ-ব্রহ্মবাদ অথবা 'পাতঞ্জলীয়' ঈশ্বর সাযুজ্যরূপ কৈবল্যবাদ উদিত হয়। নিরুপাধিক চিৎতত্ত্বের শুদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের 'সাক্ষাদ্দর্শন' বা 'কূটসমাধি'র ব্যতিরেক ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধচিৎতত্ত্বের সহজ প্রকাশ হয়; তাহার নাম—'সহজ সমাধি' বা 'শুদ্ধজ্ঞান'; এই জ্ঞানই ভক্তি-পোষক। জ্ঞানালোচনাদ্বারা বদ্ধজীব প্রথমে জড়-জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুগত ধর্ম্ম এবং বস্তুসকলের মিলনাবস্থায় সেই সমস্ত ধর্ম্ম উদিত হইলে ঐ সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে; কখনও বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্ত্তা ও পালয়িতৃরূপ ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করতঃ তাঁহার প্রতি একপ্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে; কখনও বা এই জগৎকে 'নশ্বর' জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদ ব্রহ্মবাদের কল্পনা করে; কখনও বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্ব্বাণকেই 'সুখ' বলিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্‌যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা করুক না কেন, অভেদ-চিন্তা ও নির্ব্বাণ-চিন্তাকে 'অকিঞ্চিৎকর' জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম-তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই ভক্তি হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান-ফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্ম্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি' ও জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্-বহির্ম্মুখ এবং যে স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে স্থলে জ্ঞানকে 'সাধন, ভক্তি' বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে, ভক্তির নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নাই; কেবল কর্ম্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্য অবস্থাকেই 'ভক্তি' বলা যায়; এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আস্বাদনবৃত্তির পরিচালনাকে 'কেবলা', 'অকিঞ্চনা' বা 'অনন্যা' ভক্তি বলা যায়; তাহার অন্যতর নাম—প্রেম; আর আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনাকে 'জ্ঞান' বলে। আস্বাদশূন্য বিচার চরমে প্রায়ই অভেদব্রহ্মবাদ বা নির্ব্বাণবাদরূপে অনর্থকে আনয়ন করে। জীব—স্বভাবতঃই 'আস্বাদন' প্রধান। কেবল বিচারময় হইতে গেলে স্ব-স্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেম-প্রাচুর্য্যক্রমে বিচার-বৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা—'নিত্য'; অতএব তাহার আলোচনাবৃত্তিও 'নিত্য'। আলোচনা-বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্য্যও সুতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থাভেদে জীবের কার্য্য—দুই প্রকার, অর্থাৎ 'নিরুপাধিক' ও 'সোপাধিক'।

জড়-সঙ্গক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি, সেই উপাধিক্রমে জড়ীয় শরীরে ও ঐ শরীরের অনুগত সমস্ত ব্যাপারে যে 'অহংতা' ও 'মমতা' জন্মে, তাহাই জীবের 'জড়াভিমান' বা 'দেহাত্মাভিমান'। জড়বদ্ধ জীবের কার্য্য—'সোপাধিক'; আর যাঁহারা জড়ে বদ্ধ হন নাই বা যাঁহারা ভগবৎকৃপাবলে জড়মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য—'নিরুপাধিক'। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কার্য্যের নামই 'ভগবৎসেবা', আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কার্য্যের নামই 'কর্ম্ম'। জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক অবস্থায় জীবের কর্ম্মানুষ্ঠান—অপরিহার্য্য। জীবের স্বরূপ-তত্ত্বে প্রেম-সেবাই 'সহজধর্ম্ম'; সেই ধর্ম্ম বদ্ধ অবস্থাতেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং আছে। বহির্ম্মুখ কর্ম্মের প্রবলতা প্রযুক্ত তাহা সুপ্ত প্রায় থাকে। সৎসঙ্গ ক্রমে যে সকল জীবে উক্ত বহির্ম্মুখতা খর্ব্ব হয়, ঐ সকল জীবে সেবাবৃত্তির প্রবলতা হয়; তখন তাহাকে 'কর্ম্মমিশ্রা সাধনভক্তি' বলে। সেবাবৃত্তি প্রচুররূপে বলবতী হইলে কর্ম্ম ক্রমশঃ ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ স্ব স্বরূপকে পরিত্যাগ করে; তখন উহা কেবলা ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

জড়যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায় মানবদিগের কর্ম্ম জ্ঞানশূন্য নয়। যে কর্ম্ম মানবকর্ত্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্ম্ম

শূন্যতা লাভ করে না; আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটি কর্ম্ম বিশেষ; এজন্য স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক-বিচারে 'কর্ম্মের স্বরূপ' ও 'জ্ঞানের স্বরূপ---পৃথক্; তদ্রূপ কার্য্যকালে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, তাত্ত্বিকবিচারে কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরুপাধিকী চিন্ময়ী প্রেমসেবাই ভক্তির 'সিদ্ধস্বরূপ'। যদিও জড়বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা সহজ নয়, তথাপি তদ্বিষয়ে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা---সহজে প্রতীত হয়। যাঁহারা রুচিক্রমে ভক্তি তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাঁহারাই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হন।

ভক্তি---দ্বিবিধা অর্থাৎ 'কেবলা' ও 'প্রধানীভূতা'। কেবলা ভক্তি-স্বতন্ত্রা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-গন্ধ-শূন্য; তাহাকেই 'নিরুপাধিক প্রেম', 'নিরুপাধিক-সেবা', 'অনন্যা ভক্তি', 'অকিঞ্চনা ভক্তি' ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। 'প্রধানীভূতা ভক্তি'---তিন প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে কর্ম্মে বা যে জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম্ম বা জ্ঞানের ভক্তিদাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম্ম বা জ্ঞানের সহিত যে ভক্তিবৃত্তি আছে, তাহাকেই 'প্রধানীভূতা ভক্তি' বলা যায়। যে কর্ম্মে বা জ্ঞানে ভক্তিবৃত্তির প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্য্যা করে, সেই কর্ম্মের নামই 'কর্ম্ম' ও সেই জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান'; ঐ কর্ম্ম বা জ্ঞানকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি---স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন-স্বরূপ। অতএব তত্ত্ব বিচারদ্বারা কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কাশীর শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি—)

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ।
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি' তা'র উঠাইল বিবাদ।।
'পরিণাম'-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি।।
বস্তুতঃ 'পরিণাম'-বাদ সেই সে প্রমাণ।
'দেহে আত্ম-বুদ্ধি' হয় বিবর্তের স্থান।।
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম।।
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি।।
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।।

(আ ৭।১২১-২৬)

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।
ষড়্‌বিধ—ঐশ্বর্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম।

(আ ৭।১৩৮)

তাঁ'রে নির্বিশেষ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্ধ-স্বরূপ না মানিলে, পূর্ণতা হয় হানি।।

(আ ৭।১৪০)

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পুরীধামে শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—)

অপাদান, করণ, অধিকরণ--কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন।। (ম ৬।১৪৪)

ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার।। (ম ৬।১৫২)

বেদব্যাস-কৃত ব্রহ্মসূত্রে পরিণামবাদই উপদিষ্ট, বিবর্তবাদ উপদিষ্ট নয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য পরিণামবাদে 'ঈশ্বর বিকারী হ'ন, বলিয়া সূত্রার্থ পরিবর্তন করতঃ বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণাম ও বিবর্ত-শব্দদ্বয়ের অর্থ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার ৫৯ সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে,---

সতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।।

কোন সত্যবস্তু অন্যরূপ গ্রহণ করিলে তাহাতে যে পৃথগ্ বস্তু-বুদ্ধি, তাহার নাম-পরিণাম বিকার মাত্র। দৃষ্টান্ত, যথা---দুগ্ধ হইতে দধি। অন্য বস্তু নাই, অথচ অন্য বস্তু বলিয়া তাহাতে যে ভ্রম, তাহাই বিবর্ত। দৃষ্টান্ত, যথা---রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এই তাৎপর্য লইয়া শাঙ্করীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই জীব ও জড়াত্মক জগৎ কখনই ঈশ্বরের পরিণাম হইতে পারে না। যদি পরিণাম মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের একটি বিকৃত অবস্থা বলিয়া মানিতে হয়। দুগ্ধ যেমন অম্লযোগে দধিরূপে বিকৃত হয়, জগৎকে সেরূপ ঈশ্বরের বিকৃতি বলিতে হয়। অতএব পরিমাণবাদ অগ্রাহ্য। সর্প নাই, তথাপি অজ্ঞানতাবশতঃ একটি রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় ও সেই ভয় হইতে নানাপ্রকার ফলোৎপত্তি হয়। জগৎ সেইরূপ। জগৎ নাই, অথচ অজ্ঞানে যে জগৎকে বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাই বিবর্ত। ইহা মানিলে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবর্তবাদ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে, বিবর্তবাদের স্থল নাই। জীব জড়দেহে যে আত্মবুদ্ধি করে, তাহাতে রজ্জু সর্পের উদাহরণ লগ্ন হয় এবং তাহাই বিবর্ত। কিন্তু জড়দেহ মিথ্যা নয়, অতএব ঈশ্বর বিবর্তভাবে জড়দেহ বা জড়জগৎ হইয়াছেন অথবা জীব-স্বরূপ হইয়াছেন---এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত হেয়। ব্যাসসূত্রে পরিণাম স্বীকৃত হইয়াছে। পরিণাম পরিত্যাগ করিলে সর্বজ্ঞ-ব্যাসকে ভ্রান্ত বলিতে হয়। বস্তুতঃ দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি সেইরূপ ঈশ্বর-ইচ্ছায় জীব ও জড়রূপে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের

পরিণাম নাই, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির বিচিত্র-প্রভাবানুসারে পরিণতি কখনই ঈশ্বরকে বিকারী করিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত-বস্তু অপ্রাকৃত-তত্ত্বের উদাহরণ সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি কোন অংশে উদাহৃত হইয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে স্পষ্ট করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে যে, প্রাকৃত চিন্তামণি নানা রত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে। অপ্রাকৃততত্ত্বে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে সেইরূপ মনে করুন। অনন্ত জীবময় জৈবজগৎ এবং চতুর্দশ-লোকান্তর্গত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা ইচ্ছা-মাত্র সৃজন করিয়াও পরমেশ্বর সম্পূর্ণ বিকারশূন্য থাকেন। 'বিকার-শূন্য' শব্দদ্বারা এরূপ মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল নির্বিশেষ। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম সর্বদা ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। কেবল নির্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি স্বীকৃত হয় না। অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা তিনি নিত্য সবিশেষ। কেবল নির্বিশেষ মানিলে অর্ধস্বরূপমাত্র মানা হয় এবং তাহাতে পূর্ণতার হানি হয়। সেই পরতত্ত্বে অপাদান, করণ ও অধিকরণরূপে তিনটী কারণত্ব বিশেষরূপে শ্রুতিগণকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; যথা, (তৈত্তিরীয়, ৩য় বল্লী, ১ ম অনুবাকে)—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্-ব্রহ্মেতি।।"

'যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে',—এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের অপাদান-কারকত্ব সিদ্ধহয়। 'যাঁহা কর্তৃক জাত হইয়া সমস্ত জীবিত আছে'—এই বাক্যদ্বারা করণ-কারকত্ব লক্ষিত হয়। 'যাঁহাতে গমন ও প্রবেশ করে' এই বাক্যদ্বারা ঈশ্বরের অধিকরণকারকত্ব বিচারিত হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণদ্বারা 'পরতত্ত্ব' বিশিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার বিশেষ, অতএব ভগবান্ সর্বদা সবিশেষ। এরূপ ভগবান্ কখনই কেবল নিরাকার হইতে পারেন না। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত-আকার।

শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় 'ভগবৎ-সন্দর্ভ'-১৬ সংখ্যায় ভগবত্তত্ত্ববিচারে বলিয়াছেন যে,—"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব জীব প্রধানরূপেণ চতুর্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্যান্তরমণ্ডলস্থিত-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।"

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্ধা অবস্থান করেন। সূর্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, সূর্য-মণ্ডল,তাহার বহির্গতরশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত

প্রতিফলন, এই অবস্থার কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দমাত্র-বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম,সঙ্গী সমস্ত ব্যবহার্য উপকরণই স্বরূপবৈভব। নিত্যমুক্ত, নিত্যবদ্ধ অনন্ত জীবগণই জীব। মায়া, প্রধান ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই 'প্রধান'-শব্দবাচ্য। এই চতুর্ধা প্রকাশ নিত্য-পরমতত্ত্বের একত্ব প্রতিপাদক। পরম তত্ত্বে নিত্যর্বিরুদ্ধব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীববুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব, কেননা জীববুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

শ্রীজীব গোস্বামী এই মতকে 'সর্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণবজগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্ব মতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। (শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—এই) পূর্ব বৈষ্ণবাচার্যগণের সিদ্ধান্তিত মত সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিকভেদে সম্প্রদায়ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পুরণ করতঃ শ্রীমধ্বের 'সচ্চিদানন্দ নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের 'শক্তিসিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত—তদীয়-সর্বস্বত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের 'নিত্যদ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত'কে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।

কেবল-ভেদ বা কেবল-অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ সকলই শ্রুতিশাস্ত্রের একদেশসম্মত, অন্যদেশবিরুদ্ধ; কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-মত বেদের সর্ব দেশ-সম্মত সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তিসম্মত।

হরেঃ শক্তেঃ সর্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্য-বিষয়ে।।

শ্রীকৃষ্ণ

সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি অনাদি। তিনি সকলের আদি। শাস্ত্রে তাঁহার নামান্তর গোবিন্দ---সকল কারণের কারণ। যথা, শ্রীসনাতন শিক্ষায়; —

"কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।।
সর্ব-আদি, সর্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্বাশ্রয়, সর্বেশ্বর।।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' পর নাম।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁ'র গোলোক--নিত্যধাম।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০। ১৫২-১৫৫)

জৈবজগতেই ঈশ্বরস্বরূপে অনুভূতি লক্ষিত হয়। পরমেশ্বর মানবকে যে অনুভববৃত্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারাই উচ্চ জীবসকল ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করে। মানবের অনুভববৃত্তি তিন প্রকার---স্থূলদেহগত জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মদেহ বা মনোগত বোধশক্তি এবং জীবাত্মস্বরূপগত চিদ্দর্শনবৃত্তি। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক---এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় তদ্দ্বারা যে বাহ্য বোধ হয় সে কেবল জড়জ্ঞানমাত্র। মনোগত জড়জ্ঞান-প্রতিফলিত চিন্তা, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিদ্বারা জড়জ্ঞান ও চিদাভাস দর্শন-মাত্র ঘটে। সুতরাং এই দুইপ্রকার জ্ঞান-বৃত্তিই প্রাকৃত। ঈশ্বর-স্বরূপ চিদানন্দ-তত্ত্বানুভূতি ঐ দুই বৃত্তির দ্বারা সম্ভব হয় না। সুতরাং আত্মবৃত্তিকে আশ্রয় না করিলে আর ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন হয় না। যে মানবগণ জড় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা আসন, প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি যোগাঙ্গের আশ্রয় ব্যতিরেক চিন্তাদ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্ট জগতের আত্মা বোধ করিয়া পরমাত্মদর্শনরূপ একটি সমাধি কল্পনা করেন। এ কার্যেও সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত দৃষ্টি প্রাপ্ত হন না। কেবল প্রাকৃতজ্ঞান নিষেধপূর্বক একটি খন্ডবোধ লাভ করেন। যে মানবগণ তদপেক্ষা অধিকতর ব্যতিরেক চিন্তাদ্বারা প্রাকৃত রূপাদির ধিক্কার করতঃ একটী নিরাকার নির্বিকার পরমেশ্বর স্বরূপ কল্পনা

করেন, তাঁহারাই ব্রহ্ম দর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন ভাণ মাত্র। অতএব সনাতনকে প্রভু বলিলেন; —

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি---তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্---ত্রিবিধ প্রকাশে।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১৫৭)

আবার বলিয়াছেন,—

"মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিম্বা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১৪৬)

ফলকথা এই যে, জীব দ্রষ্টৃস্বরূপে যখন ঈশ্বর দর্শন করিতে চান, তখন নিজে যে অধিকার হইতে বীক্ষণ করেন, সেই অধিকারের দ্রষ্টব্য ঈশ্বররূপ দেখেন। কর্মযোগে পরমাত্মা, জ্ঞানযোগে ব্রহ্ম এবং ভক্তিযোগে ভগবান্ আমাদের সম্বন্ধে লক্ষিত হন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ-তত্ত্বকেই তত্ত্ব বলেন।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।"

(ভাঃ ১/২/১১)

সেই অদ্বয় চিদ্বিগ্রহকে আপন আপন অধিকৃত যন্ত্রদ্বারা পৃথক পৃথক দর্শন করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।

সেই ভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহারা কৃষ্ণকে সামান্য নরস্বরূপ ও নরবৎ বিলাসবান্ মনে করিয়া অবহেলা করেন, তাঁহাদের তত্ত্ববোধে বিশেষ ক্ষুদ্রতা লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তৎসম্বন্ধে শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের মর্মাবলম্বনপূর্বক মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথাঃ---

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।।
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্।।

স্বয়ংরূপ স্বয়ংপ্রকাশ---দুইরূপে স্ফুর্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি।।”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১৬৪-১৬৬)

সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি ‘ভগ’। যে পুরুষ তদ্‌যুক্ত, তিনিই ভগবান্‌। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্‌; যেহেতু স্বভাবতঃ তাঁহাতেই সমস্ত ভগবত্তার চরম প্রকাশ। কৃষ্ণ অপেক্ষা উচ্চ বা কৃষ্ণের সমান আর কেহ নাই। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে গোলোকে নিত্য অবস্থান করেন। তদেকাত্ম পুরুষগণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য করিয়া থাকেন। মহাবিষ্ণুই কৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার। কারণসমুদ্রে তিনি শয়ন করেন। তাঁহার অংশ গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষদ্বয়। রাম-নৃসিংহাদি অবতার পুরুষের অংশকলা মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌, পুরুষাবতারের মূল। অচিন্ত্যশক্তিবলে কৃষ্ণ সর্বোপরি থাকিয়াও যুগবৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন। উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। ব্রহ্মসংহিতায়; —

“যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্‌।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।”

যোগশাস্ত্রে ও বেদে যে পরমাত্মার উল্লেখ আছে, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের এক অংশ।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্‌।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।।

(ভাঃ ১০/১৪/৫৫)

এই কথা দুইটির শাস্ত্রপ্রমাণ বহুতর আছে এবং তর্কশাস্ত্রাদির যুক্তি সহজে ইহা বুঝিতে পারে না। সূর্যস্বরূপ হইতে যেরূপ আলোক সৌরজগতে সর্বত্র ব্যাপ্ত, সেই রূপ চিদানন্দস্বরূপ অপ্রাকৃত সর্ববিক্রমযুক্তকৃষ্ণসূর্য হইতে তাঁহার অসীম কিরণ সর্বস্বরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপে ব্যতিরেক চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের চিত্তে নিরাকারাদি ব্যতিরেকধর্ম দ্বারা প্রতিভাত হইয়াছেন। জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রবিষ্ট কৃষ্ণাংশকে যোগিগণ পরমাত্মা বলিয়া অনুসন্ধান করেন। প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকাররূপ নিরাকার নির্বিকার ধর্মগুলি খণ্ডবিৎ পণ্ডিতদিগের উপাসনার বিষয় হইয়াছে। নরপূজা বা গুণপূজা পাছে

আমাদিগকে অধিকার করে, এই আশঙ্কায় খণ্ডবিৎ পণ্ডিতাভিমানী পুরুষগণ নিরাকার নির্বিকার আশ্রয়পূর্বক অবশেষে প্রেমধনে বঞ্চিত হন।

অসৎসংস্কার হইতেই এরূপ পবিত্র জৈবধর্মের বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণসৌন্দর্য যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয়, তাঁহারা নিরাকারাদি ব্যতিরেক বুদ্ধি হইতে উদ্ধৃত হইয়া অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করেন। জীবের ভাগ্য ফলে এরূপ অনন্ত সুখ লাভ হয়। দুর্ভাগ্যফলে সামান্য প্রাকৃতবিজ্ঞান বঞ্চিত বুদ্ধি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রসারিত হইতে পারে না। কৃষ্ণ অনাদি অনন্ত অপ্রাকৃত কালে সর্বোচ্চ গোলোকপতি হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভৌমজগতে স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাক্রমে গোলোকস্থ ব্রজের সহিত আপনাকে আপনি অবতীর্ণ করিয়াও সর্বদা শুদ্ধ সবিশেষ ধর্মে বিচরণ করেন। এই সকল কৃষ্ণলীলা আত্মার বিশুদ্ধ সমাধি হইতে জীব অবগত হইয়া থাকেন। চর্মচক্ষু ইত্যাদিতে উপলব্ধ হন না। কখন কখন কৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বারা চর্মচক্ষে উদিত হইয়াও অনুদিত -প্রায় থাকেন। কৃষ্ণলীলা নিত্যা, প্রাকৃত দেশ কালে অপরিচ্ছিন্না। কেবল বিশুদ্ধ আত্মগত ভক্তিচক্ষুতে তাহা দেখা যায় এবং ভক্তিমনে তাহা ধ্যাত হয়।

যথা; ভাগবত ১/৭/৪-৭—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।।

যতদিন প্রাকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহঙ্কারে সেই পরতত্ত্বের প্রতি চিত্ত ধাবিত না হয়, ততদিন সেই তত্ত্ব সহজে দূরে অবস্থিতি করে। তৃণাদপি সুনীচ চিত্তে যখন ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণকে ডাকেন, তখন ভাগ্যবান্ লোকে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা অসীম আনন্দভোগ করেন। ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধোদয়ে আর প্রাকৃত অহঙ্কারে

মুগ্ধ থাকিয়া নামাপরাধী হন না। কৃষ্ণানুশীলনে জাতি, বর্ণ, প্রাকৃতবিদ্যা, রূপ, বল প্রাকৃত বিজ্ঞানাদি বল, উচ্চপদ, ধন, রাজ্য প্রভৃতি কিছুই কার্য করে না। এতন্নিবন্ধন বর্ণাভিমানী প্রভৃতির পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব স্বভাবতঃ সুদূরবর্তী। এই সকল হেতুবাদ বিচার করিলে বর্তমান কৃষ্ণতত্ত্বের অবজ্ঞার কারণ সহজে প্রতীত হইবে। যথা ভাগবতে (১১/৫/৯)----

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ।।

প্রাকৃত বিজ্ঞানের দুর্দশা এই যে, সে স্বীয় অধিকারাতীত সকল তত্ত্বই জানিতে চায়। অপ্রাকৃত তত্ত্বে তাহার অধিকার নাই, তথাপি নির্লজ্জভাবে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তে আবদ্ধ হয়, শেষে নিজেও বিকৃত হইয়া নিরস্ত হয়। জীবের সৎসঙ্গজনিত দৈন্যে কৃষ্ণকৃপা উদয় হয়। তাহাতেই তাহার অপ্রাকৃত তত্ত্বে অধিকার জন্মে। কেবল জড়ীয় বিচারবলে কখনই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় না।

ভজনে দ্বিজত্ব

"গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ।
সংস্কৃতশ্চাদিগুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ।।"

---ব্রহ্মসংহিতা।

অনুবাদ। তদনন্তর বেদমাতৃ-গায়ত্রীময় পারিপাট্য শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে স্ফূর্তি লাভ করতঃ স্বয়ম্ভূ-ব্রহ্মার অষ্টকর্ণকুহরদ্বারে মুখপদ্মে প্রবেশ করিল। পদ্মযোনি সেই গীতনিঃসৃতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদি গুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কৃতি লাভ করতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাৎপর্য। কৃষ্ণের মুরলীবাদন-সচ্চিদানন্দময় শব্দবিশেষ, সুতরাং সমস্ত বেদের আদর্শ তাহাতে বর্তমান। গায়ত্রী একটি বৈদিক ছন্দ; তাহাতে সংক্ষেপে একটি ধ্যান ও প্রার্থনা থাকে। কাম-গায়ত্রী আবার সমস্ত গায়ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তাহাতে যে ধ্যান ও প্রার্থনা আছে, তাহা সম্পূর্ণ চিদ্বিলাসময়; সেরূপ আর কোন গায়ত্রীতে নাই। অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয়, সে কাম-গায়ত্রী; ** এই গায়ত্রীতে শ্রীগোপীজনবল্লভের পরিপূর্ণধ্যানানন্তর তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত অনঙ্গলাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। চিজ্জগতে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট

রসাশ্রিত প্রেম-চেষ্টা নাই। সেই গায়ত্রী ব্রহ্মার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র ব্রহ্মা দ্বিজত্বসংস্কার লাভ করতঃ সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন। যে যে জীব এই গায়ত্রী তত্ত্বতঃ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পুনরায় অপ্রাকৃত জন্মলাভ হইয়াছে। জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক সংসারে স্বভাব ও বংশানুসারে যে দ্বিজত্ব লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা 'অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ'-রূপ এই দ্বিজত্ব লাভ উৎকৃষ্ট, কেননা চিদ্বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-জন্ম লাভ হয়, তদ্দ্বারাই চিজ্জগৎ প্রাপ্তি-রূপ জীবের চরম-মহিমা।

(ব্রহ্মসংহিতার দ্বিজত্ব সম্বন্ধে এই শিক্ষা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত তাৎপর্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত 'তত্ত্বসাগর'-বচন---"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রস বিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম।।" এবং এই শ্লোকব্যাখ্যায় শ্রীল সনাতন গোস্বামীর—"নৃণাং সর্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।" উক্তি প্রভৃতি অনুসরণ ক্রমে প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকে উপনয়ন-সংস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র দিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন,—

"জাগতিক আভিজাত্য-গৌরববাদিগণ নিজেরা প্রকৃত আভিজাত্য লাভ করিতে না পারিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, —এরূপ বলিয়া থাকেন; ইহাতে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকারস্বরূপ বৃত্তদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম-সংস্থাপন-কার্য যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণব সেবা বলিয়া জানিবে।"

কৃষ্ণলীলায় তর্ক তার্কিকের কুণ্ঠিতবুদ্ধির পরিচয়মাত্র

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্।।"

---শ্রীভাগবত ১০/৩৩/৩৫

গোলোকে সকলেই চিন্ময়। সেখানে সামান্য যুক্তিবাদী ধার্মিকদিগের গতি নাই। সেখানে বিধিউল্লঙঘন লইয়া কখনই বিতর্ক হইতে পারে না। সেখানে কৃষ্ণ একমাত্র নায়ক। তদীয় পরাশক্তির বিভূতিগণ মূর্তিমতী হইয়া কোটি কোটি

লক্ষ্মীগণরূপে তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রকোষ্ঠবিশেষে সেই শক্তিগণকে গোপীভাবে পরকীয় উজ্জ্বলরসে স্থিত করিয়া অচিন্ত্যশক্তিক্রমে যে অপূর্ব রমণ করিতেছেন, তাঁহার প্রপঞ্চপ্রকট এই বৃন্দাবন-লীলা। তদুভয় বস্তুতঃ এক সেখানে কৃষ্ণলীলা পোষণের জন্য গোপীসকল পতিভাবে অন্য গোপসকলকে বরণ করিয়া কৃষ্ণকে অধিকতর সুখদান করিতেছেন। সমুদায়ই আত্মরূপে কৃষ্ণের অংশ, আত্মশক্তিরূপ স্বরূপশক্তির অংশ। স্বয়ং কৃষ্ণ ও স্বয়ং স্বরূপশক্তি রাধার যে চিন্ময়-দেহভাক্ ক্রীড়া, তাহা নিত্য, অনবদ্য ও পবিত্র। এই ব্যাপারে যাঁহার যত চিৎ-প্রভাব-প্রাপ্তি, তাঁহার ততই নির্দোষ-দৃষ্টি; তথায় সমস্ত দেহী গোপীদিগের ও তদীয় পতিদিগের ভিতরে অন্তশ্চর ও বাহিরে কৃষ্ণরূপে অধ্যক্ষ। এরূপ কৃষ্ণলীলায় জড়ীয় ধর্মের তর্ক বিফল। সে তর্ক তার্কিকের কুণ্ঠিত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র।

রামায়ণ-মহাভারত সমীক্ষা

রামায়ণ গ্রন্থ কাব্য-মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহাকে ইতিহাস বলা যায়। ঐ গ্রন্থ বাল্মীকি-রচিত। বাল্মীকি ঋষি রামচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন। যে রামায়ণ বাল্মীকির নামে এখন প্রচলিত আছে, তাহাই বাস্তবিক বাল্মীকির সম্পূর্ণ রচনা, এমত বোধ হয় না। নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ ও লবকুশের রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ কীর্তন ইত্যাদি বিচার করিলে বোধ হয়, ঐ গ্রন্থমধ্যে রাম-চরিত্রসূচক অনেক শ্লোক বাল্মীকি কর্তৃক রচিত হইয়া লবকুশ কর্তৃক পরিগীত হয়, পরন্তু তাহার অনেক দিন পরে অন্য কোন পণ্ডিত কর্তৃক ঐ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া লিপিবদ্ধ হয়। উহার বর্তমান আকৃতি মহাভারত রচনার পরে প্রচারিত হইয়াছে অনুমান করি, যেহেতু জাবালিকে তিরস্কার করিবার সময় রামচন্দ্র তাঁহার মস্তকে দুষ্ট শাক্যমত * বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব বর্তমান কলেবরটী খ্রীষ্টের পূর্বে ৫০০ বৎসরের মধ্যে নির্মিত হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে। লিখিত আছে, মহাভারত ব্যাসদেবের রচিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ব্যাস যুদ্ধিষ্ঠিরের সময়ে বেদ বিভাগপূর্বক বেদব্যাস পদবীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকর্তৃক ভারত রচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে না। কেননা, ভারতে জনমেজয় প্রভৃতি তৎপরবর্তী রাজাদিগের বর্ণন আছে। বিশেষতঃ মহাভারতে মানব-শাস্ত্রের উল্লেখ থাকায় মহাভারতের বর্তমান খ্রীষ্টের পূর্ব সহস্র বৎসর মধ্যে নির্মিত হওয়া অনুমিত হয় (১)। ইহাতে স্থির হয় যে, বেদব্যাস ভারত-গ্রন্থের কোন আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাসান্তর কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরে মহাভারত নামে প্রকাশ হয়। লোমহর্ষণ নামক কোন শূদ্রবংশীয় পণ্ডিত মহাভারতগ্রন্থ নৈমিষারণ্য-ক্ষেত্রে ঋষিদিগের নিকট পাঠ করেন। বোধ হয়, তিনিই মহাভারতের বর্তমান কলেবর সৃষ্টি করেন, কেননা ব্যাসদেবের কৃত ২৪০০ শ্লোক তৎকালে লক্ষ শ্লোক হয়। এখন বিবেচ্য এই যে, লোমহর্ষণ কোন্ সময়ের লোক। কথিত আছে যে বলদেবের হস্তে তাহার মৃত্যু হয়; ইহাতে বোধ হয় যে পণ্ডিত ও ভক্ত হইলে শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণতুল্য মাননীয় হইবে, এই বাক্য দৃঢ়ীকরণার্থে তাৎকালিক বৈষ্ণবসমাজে ঐ আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক ঐ সভা বলদেবের অনেক

(১) পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ।। (মহাভারতম্)

পরে স্থাপিত হয়। যে লোমহর্ষণ ব্যাসশিষ্য বলিয়া কথিত হইয়ছে, সেই ব্যক্তি যে ঐ সভায় বক্তা ছিলেন, ইহাতেও সন্দেহ হয়। বোধ হয়, বলদেবের সময় ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ বৈদিক ইতিহাস ব্যাখ্যা কালে হত হন। কিন্তু তাহার বহুদিন পরে (জনমেজয়ের সভায় বৈশম্পায়নের বক্তৃতার বহুদিন পরে) তৎপদস্থ অন্য কোন সৌতি মহাভারত বক্তৃতা করেন। কালক্রমে পূর্ব আখ্যায়িকা ঐ সময়ের ইতিহাসে সংযুক্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধের বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয় যে, অজাতশত্রুর পূর্বে বার্হদ্রথদিগের পরে সৌতি (২) কর্তৃক মহাভারত কথিত হয়। নৈমিষারণ্যক্ষেত্রের বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, যেকালে শান্তস্বভাব ঋষিগণ চন্দ্র-সূর্যবংশের লোপ দৃষ্টি করিলেন, তখন ক্ষত্রাভাবে তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাশ্রিত মনে করিয়া নিমিষক্ষেত্রের বিজন দেশে বাস করতঃ শাস্ত্রালোচনায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। নৈমিষারণ্য সভা-সম্বন্ধে আরও একটী অনুমান হয়। মহাভারতের যুদ্ধের পর নন্দিবর্ধনের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে কোন সময় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বৈষ্ণবদিগের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, পারমর্থিক তত্ত্বে সকল মানবেরই অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণসমূহের মোক্ষধর্মে অধিকার নাই। জন্মান্তরে ব্রাহ্মণজাতিতে উদ্ভূত হইয়া অপর জাতীয় শান্তস্বভাব ব্যক্তিরা মোক্ষানুসন্ধান করিবেন। এই দুই বিরুদ্ধমতের বিবাদসূত্রে বৈষ্ণবগণ সূতবংশীয় পণ্ডিতদিগকে উচ্চাসন দান করতঃ নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের পূজনীয়তা প্রদর্শন করান। ঐ সভায় অর্থবশীভূত সামান্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে ব্রহ্মসভা বলিয়া বৈষ্ণবদিগের পোষণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণসকল কর্মকাণ্ডকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সূতকে গুরুরূপে বরণ করতঃ পাপাত্মক কলিকাল পার হইবার একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করেন, তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। (৩) যেপ্রকারেই হউক, ঐ সভা ভারতযুদ্ধের অনেক পরে সংস্থাপন হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

---

(২) ঐ সৌতিই মহাভারত রচনা সম্বন্ধে শেষ ব্যাস। পুষ্করতীর্থের সন্নিকট অজয়মীর নগরে তাঁহার নিবাস ছিল; যেহেতু তীর্থযাত্রাক্রমবর্ণনে আদৌ পুষ্কর তীর্থ দর্শন করিতে বিধান করিয়াছেন।

(৩) কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ম্। অসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ।। ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্। কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্।। (ভাঃ ১।১।২১-২২ শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতার উপক্রমণিকা হইতে)

দর্শন ও পুরাণ সমীক্ষা

ভারত রচনার অনতিবিলম্বেই দর্শনশাস্ত্র রচিত হয়। ভারতবর্ষে ৬ টী দর্শন প্রবলরূপে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কণাদ, (পূর্ব) মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই বৌদ্ধমত প্রচারেরপর উৎপন্ন হইয়াছে। দার্শনিক ঋষিগণ আদৌ নিজ নিজ গ্রন্থ সূত্ররূপে রচনা করেন। বৈদিক সূত্রসকল যেরূপ স্মরণের সাহায্যের জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল, দার্শনিক সূত্রসকল সেরূপ নয়। ব্রাহ্মণেরা যখন বৌদ্ধদিগের প্রবল মতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, তখন বেদশাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষৎসকলপ্রথমে রচনা করিয়া যুক্তি ও স্বমতস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা ক্রমশঃ সৌগত, মাধ্যমিক, যোগাচরা প্রভৃতির স্বমতের দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল তখন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ন্যায়, পরে সাংখ্য ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ছয়টী বিচারশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সূত্ররূপে গ্রন্থ রচনাপূর্বক স্বশিষ্যেতর কাহারও হস্তে না পড়ে, এরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সময় হইতে আন্বিক্ষিকী বিদ্যারূপ কোন বৈদিক ন্যায় তাৎকালিক গৌতমঋষি কর্তৃক রচিত হইয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু আবশ্যক মতে ঐ সামান্য গন্থের স্থলে ব্রাহ্মণেরা গৌতমের নামে বর্তমান অক্ষপাদ রচনা করেন। সৌগত মত নিরসনার্থে গৌতমসূত্র যত্ন দেখা যায়। কাণাদশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের অনুগত। সাংখ্যশাস্ত্রেও বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে অনেক সিদ্ধান্ত দেখা যায়। পাতঞ্জল মতটী সাংখ্যের অনুগত। জৈমিনীকৃত (পূর্ব) মীমাংসা বৌদ্ধনিরস্ত কর্ম কাণ্ডের পক্ষসাধনমাত্র। বেদান্ত-শাস্ত্র যদিও সকলের কনিষ্ঠ, তথাপি ইহাই মূল উপনিষৎ বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় পূর্বোল্লিখিত আন্বিক্ষিকী বিদ্যার রূপান্তর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব দর্শনশাস্ত্রসমূদয়ই খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব হইতে খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পর পর্যন্ত এই ৮০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে।

পুরাণসকল দর্শনশাস্ত্রের পরে প্রকাশিত হয় বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও মহাভারতে যে পুরাণসকলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সেগুলি কেবল বৈদিক আখ্যায়িকা। অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রচারিত; তন্মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণটি সর্ব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেননা ইহাতে ভবিষ্যৎ রাজাদের উল্লেখ নাই। মহাভারতের সময়-নিরসন, ধর্মশাস্ত্র

ব্যাখ্যা, সূর্য-মাহাত্ম্য ও দেবীমাহাত্ম্য এই সকল মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে। চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত রাজা সুরথের গল্প তাহাতে সন্নিবেশিত থাকায় ছোটনাগপুরস্থ চিত্রনাগবংশীয় রাজাদের রাজ্য কোল-জাতি কর্তৃক পরিগৃহীত হইলে পর, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে অনুমিত হয়। "কোলাবিধ্বংসিন্নঃ" শব্দদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সময় ভারতবর্ষে ব্রাত্যাধিকার প্রবল ছিল বুঝিতে হইবে। অতএব খ্রীষ্টের ৫০০ শত বৎসর পরে ঐ পুরাণ রচিত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের সম্মান অধিক এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরেই উহা রচিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থ কোন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত কর্তৃক রচিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু তদ্গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মানবেরা সুস্বাদু দ্রব্যসকল আহারান্তে তিক্ত দ্রব্য অবশেষে ভোজন করিবেন। এই প্রকার ব্যবহার দক্ষিণ প্রদেশে প্রচলিত আছে। গ্রন্থকর্তা স্বদেশনিষ্ঠ আস্বাদটী গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আর্যাবর্তের লোকেরা অবশেষে মিষ্টান্ন ভোজনে আহার সমাপ্ত করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টের প্রায় ৬০০ বৎসর পর ঐ পুরাণ প্রকাশিত হয়। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি আর আর পুরাণসকল খ্রীষ্টের ৮০০ বৎসর পরে লিখিত হয়, যেহেতু ঐ সকল পুরাণে অনেক আধুনিক মতের আলোচনা আছে শঙ্করাচার্য নামক অদ্বৈতবাদীর মত প্রচারের পর ঐ সকল গ্রন্থ হইয়াছিল। শাঙ্করভাষ্যে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় বিষ্ণুপুরাণ শঙ্করের পূর্বে প্রচারিত ছিল, বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত সমীক্ষা

সম্প্রতি আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে সর্বশাস্ত্র চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতের উদয়-কাল বিচার করিতে হইবে। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়গণ আমাদের বাক্য-তাৎপর্য্য না বুঝিয়া এবম্বিধ শাস্ত্রকে আধুনিক বলিয়া হতশ্রদ্ধ হতে পারেন, অতএব এই বিচার তাঁহাদের পক্ষে পাঠ্য নয়। বাস্তবিক শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ" শব্দ-প্রয়োগদ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। সমস্ত নিগম শাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরমফল বলিয়া শ্রীভাগবত-গ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন। * প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিলবেদ, অখিলবেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য সত্যসমূহ জীব সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ সূর্যস্বরূপ ঐ পরমহংস-সংহিতা জাজ্বল্যরূপে উদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দর্শন করুন; যাঁহাদের কর্ণ আছে তাঁহারা শ্রবণ করুন; যাঁহাদের মন আছে তাঁহারা শ্রীভাগবতের সত্যসকলের নিদিধ্যাসন করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতাপীড়িত পুরুষেরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন। চৈতন্যাত্মা ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাবলোকন পূর্বক তাঁহাদের অন্ধতা দূর করুন।

শ্রীভাগবতের জন্ম নাই, যেহেতু উহা সনাতন, নিত্য ও অনাদি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে কোন্ সময়ে কোন্ দেশে ও কোন্ মহাত্মার চৈতন্যে ঐ গ্রন্থরাজের প্রথম উদয় হয়, তাহা নিরূপণ করা অতীব বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, যাঁহারা কোন বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম নহেন, সেই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের জন্য কথিত হইয়াছে যে, যৎকালে ব্যাসদেব সর্বশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াও সন্তোষ পাইলেন না, তখন তত্ত্বদর্শী নারদের উপদেশক্রমে সরস্বতীতীরে সমাধিদ্বারা পরমার্থ দর্শনপূর্বক শ্রীভাগবত প্রকাশ করিলেন। যে যে মহাপুরুষেরা পরমার্থশাস্ত্র সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা ব্যাসপদ প্রাপ্ত হইয়া জনগণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেন। ব্যাস শব্দে এস্থলে বেদব্যাস হইতে ভাগবত কর্তা ব্যাস পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন সর্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্বক অনির্বচনীয় পরমার্থ তত্ত্বের

---

* নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।। (ভাঃ ১।১।৩)

গূঢ়াবস্থান নির্ণীত না হইল, তখন বাক্য ও মনকে তদ্বস্তু হইতে নিরস্ত করিয়া পরমার্থবিদ্যাবিশারদ ব্যাসদেব সমাধি অবলম্বনপূর্বক পরমতত্ত্বের অনুভব ও অনুবর্ণন রূপ, শ্রীভাগবত রচনা করিলেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ দ্রাবিড়দেশে প্রায় সহস্র বৎসর হইল প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। স্বদেশনিষ্ঠতা মানবজীবনের সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ, অতএব মহাপুরুষগণও ঐ প্রবৃত্তির কিয়ৎ পরিমাণে বশবর্তী হইয়া থাকেন। ভাগবত গ্রন্থে অনতি-প্রাচীন দ্রাবিড়দেশের যেরূপ মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে, তাহাতে ভাগবত-লেখক ব্যাস মহোদয়ের স্বদেশ বলিয়া ঐ দেশটী লক্ষিত হয়। * যদি অন্য কোন শাস্ত্রে দ্রাবিড়দেশের তদ্রূপ মাহাত্ম্যোল্লেখ হইত, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করিবার আমাদের অধিকার থাকিত না। বিশেষতঃ অত্যন্ত আধুনিক একটি তদ্দেশীয় তীর্থকে উল্লেখ করায় আরও আমাদের তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির হইতেছে। তদ্দেশপ্রচারিত বেঙ্কট-মাহাত্ম্য (সম্বন্ধে) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চোলতীর্থের স্থাপন হয়। কোলাপুর সেতারার দক্ষিণ চালুক্য রাজারা খ্রীষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে চোলদিগকে পরাজয় করতঃ ঐ সকল দেশে একটী বৃহৎ রাজ্য স্থাপনা করেন। অতএব ঐ সময়েই চোললক্ষ্মী কোলাপুর যান এবং বেঙ্কট তীর্থের স্থাপনা হয়। এতন্নিবন্ধন নবম শতাব্দীতে শ্রীভাগবতের অবতার স্বীকার করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় না। দশম শতাব্দীতে শটকোপ, যামুনাচার্য ও রামানুজ বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ প্রচার করেন। তাঁহারাও দ্রাবিড় দেশীয় ছিলেন, অতএব তাঁহাদের কর্তৃক ভাগবত-গ্রন্থ সম্মানিত হওয়ায় নবম শতাব্দীর পরে ভাগবতের উদয়কাল নিরূপণ করিতে পারি না। বিশেষতঃ একাদশ শতাব্দীতে যৎকালে শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকা করেন, তখন ঐ গ্রন্থের পূর্বকৃত হনুমদ্ভাষ্য প্রভৃতি কয়েকটী টীকা প্রচলিত ছিল। অতএব এতদ্বিষয়ে আর অধিক বিচারের আবশ্যক নাই; কেবল বক্তব্য এই যে, ঐ গ্রন্থের রচয়িতার আশ্রমিক নামটী অবগত হইবার কোন উপায় দেখি না। তিনি যিনিই হউন, সেই মহাপুরুষ ব্যাসদেবকে আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা-সহকারে সারগ্রাহী জনগণের গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা করি।

---

* কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ। তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী। যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।।

গীতার জন্মরহস্য

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'জ্ঞানবিভাগযোগাত্মক' চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, তিনি পূর্বে সূর্যকে অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলেন। সূর্য তাহা মনুকে এবং মনু সেই যোগ ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। এই প্রকারে পরম্পরা-প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিসকল অবগত হইয়া থাকেন। সেই যোগ অনেক কাল গত হওয়ায় নষ্টপ্রায় হইয়াছিল; তাহাই তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন, যেহেতু অর্জুন তাঁহার ভক্ত ও সখা। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন জাগতিক জড়ীয় ঐতিহাসিকগণের যুক্তি অবতারণ অভিনয় করিয়া বলিলেন---"হে কৃষ্ণ! সূর্যের জন্ম পূর্বকালে হইয়াছিল, আর তুমি ইদানীন্তন জন্মগ্রহণ করিয়াছ; সুতরাং তুমি যে উক্ত যোগ পূর্বে সূর্যকে উপদেশ করিয়াছিলে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?" শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিতেছেন,--)

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।
যদা-যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনজর্ন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।" (গীতা ৪।৫-৯)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরম-ঈশ্বরত্ব হেতু আমি সে সমুদয় স্মরণ করিতে পারি। তুমি অণুচৈতন্য জীব, সে সমুদয় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখন জগতে অবতীর্ণ হই, তোমার ন্যায় সিদ্ধভক্ত, আমার লীলাপুষ্টির জন্য আমার সহিত জন্মলাভ কর, কিন্তু আমি একমাত্র সর্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি।

যদিও আমি এবং তোমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি সমস্ত ভুতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়-স্বরূপ; স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্বক তদ্দ্বারা সম্ভূত হই। কিন্তু জীবসকল আমার মায়াশক্তিপ্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করে; তাহাতে তাহাদের পূর্বজন্মস্মৃতি থাকে না। জীবের কর্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেবতির্যগাদি-রূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃই হইয়া থাকে। জীবের ন্যায় আমার বিশুদ্ধ চিৎশরীর লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠাবস্থায় আমার যে নিত্য শরীর তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল, প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর; আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব তদ্দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজ জ্ঞান দ্বারা এই মাত্র তোমাদের জানা কর্তব্য যে অবিচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধ রূপে জড়জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সেই স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চবিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়া দ্বারা জীব চালিত হয় তাহাও আমার প্রকৃতি বটে, কিন্তু আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে চিৎশক্তিকে বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি এক, কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি এবংপ্রকার নানাবিধ প্রভাবযুক্ত।

আমার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে, আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভুত্থান হয়, তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার-নির্বাহক বিধিসকল অজেয়। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ-সকল বিধি কোন অনির্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কাল-দোষক্রমে অধর্ম প্রবল হয়। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তিসহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্মগ্লানি নিবৃত্ত করি। এই ভারত-ভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয়। আমি দেবতির্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত

ইচ্ছাপূর্বক উদিত হই, অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্তজদিগের রাজ্যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্মকে স্বধর্ম বলিয়া স্বীকার করে ততটুকু ধর্মের গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতার-রূপে আমি তাহাদের ধর্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম-ধর্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় বলিয়াই তদ্দেশবাসী আমার প্রজা- সকলের ধর্ম-সংস্থাপন করণার্থে আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরম ফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণমধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, ভক্তকৃপা জনিত আকস্মিক প্রথা-সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে।

রাজর্ষি প্রভৃতি আমার যে সকল ভক্ত---তাঁহাদের সত্তায় আমি শক্ত্যাবেশ করতঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরম ভক্ত সাধুগণের অভক্ত-ব্যক্তিগণ হইতে সংরক্ষণার্থ আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে রক্ষা করি, অসাধুদিগকে পৃথক করিয়া নাশ্য ধর্মে ব্যবস্থাপিত করি এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য-স্বধর্ম সংস্থাপন করি। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, এই কথাদ্বারা কলিকালেও আমার অবতার হয়— ইহা স্বীকার করিবে। কলিকালের অবতার কেবল কীর্তনাদি দ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন; তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজননিস্তারকাবতার কর্তৃক দুষ্কৃত-বিনাশ ব্যতীত অসুর বিনাশ কার্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য।

অচিন্ত্য চিৎশক্তিদ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম আমি অঙ্গীকার করি, তাহা পূর্বোক্ত মত তত্ত্ববিচার ক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি দেহ ত্যাগপূর্বক পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন না, কিন্তু আমার চিচ্ছক্তি প্রকাশরূপ হ্লাদিনী-শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানাভাবে আমার জন্ম, কর্ম ও প্রপঞ্চ-প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। কর্ম-জড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্তদ্বারা কর্ম-জড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধুকৃপাব্যতীত তাহাদের বিমলভক্তি উদিত হয় না।

শ্রীঅর্থপঞ্চক

তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্যই অর্থপঞ্চক

শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারী জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ, পুরুষার্থ-স্বরূপ, উপায়-স্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপ-রূপ পাঁচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

(ক) জীবের স্ব-স্বরূপ— ১। নিত্য, ২। মুক্ত, ৩। বদ্ধ, ৪। কেবল, ৫। মুমুক্ষু।

(খ) ঈশ্বরের পর-স্বরূপ— ১। পর, ২। ব্যূহ, ৩। বিভব, ৪। অন্তর্য্যামী, ৫। অর্চ্চাবতার।

(গ) পুরুষার্থ-স্বরূপ— ১। ধর্ম্ম, ২। অর্থ, ৩। কাম, ৪। আত্মানুভব, ৫। ভগবদনুভব।

(ঘ) উপায়-স্বরূপ— ১। কর্ম্ম, ২। জ্ঞান, ৩। ভক্তি, ৪। প্রপত্তি, ৫। আচার্য্যাভিমান।

(ঙ) বিরোধী-স্বরূপ— ১। স্বরূপবিরোধী, ২। পরত্ববিরোধী, ৩। পুরুষার্থ-বিরোধী, ৪। উপায়বিরোধী, ৫। প্রাপ্যবিরোধী।

(ক) জীবের স্ব-স্বরূপ

১। নিত্যজীব---সর্ব্বদা সংসার-সম্বন্ধ-দোষ রহিত ভগবদানুকূল্যমাত্র ভোগ-যুক্ত, বৈকুণ্ঠনাথের মন্ত্রণাযোগ্য ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকরণে সমর্থ, ঈশ্বরের সর্ব্বাবস্থায় কৈঙ্কর্য্যশীল বিষ্বক্সেনাদি অমরবৃন্দ।

(২) মুক্তজীব---ভগবৎপ্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃতিসম্বন্ধজনিত ক্লেশমল নিবৃত্ত হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল, স্তবপরায়ণ, সন্তোষানন্দ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান মুনিগণ।

(৩) বদ্ধজীব---পাঞ্চভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী, আত্ম-দর্শন-স্পর্শনে অযোগ্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানজনক দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরুদ্ধ অসেব্য সেবা, ভূতহিংসা, পরদার-পরদ্রব্যাপহরণ করতঃ সংসার বর্দ্ধক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ।

(৪) কেবল জীব---কেবল জীব একা। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্য বস্ত্বাভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষণ পান করেন। যোগাদি বাসনার্জ্জিত কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবই কেবল জীব।

(৫) মুমুক্ষুজীব---মুমুক্ষু-জীবসকল সংসারদাবাগ্নি-তপ্ত হইয়া সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জন্য জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত আত্মবিবেক লাভ করতঃ প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় হেয়পদার্থ সমূহ স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্ব স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃ-সুখী, নিত্য অপ্রাকৃত-স্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্মবিবেকে অশক্ততা বশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পূর্ব্বে দুঃখিত থাকা বোধ করেন। আত্মপ্রাপ্তি সাধক জ্ঞানযোগ নিষ্ঠাফল স্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থ বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ।

(খ) ঈশ্বরের পরস্বরূপ

(১) পরতত্ত্ব—পর-শব্দে পরমেশ্বর। নিত্যবর্ত্তমান, আদি, জ্যোতিরূপ পরবাসুদেব।

(২) ব্যূহতত্ত্ব—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার--কর্ত্তা সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধঃ।

(৩) বিভবতত্ত্ব—রাম-কৃষ্ণাদি অবতার।

(৪) অন্তর্যামীতত্ত্ব—দুইপ্রকার। দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ।

(৫) অর্চ্চাবতার—দাসগণের অভিমত নাম ও রূপ বিশিষ্ট উপাস্য মূর্ত্তি। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন হইয়াও অশক্তপ্রায়, পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামীপ্রায় মন্দিরে বর্ত্তমান।

(গ) পুরুষার্থ-স্বরূপ

(১) ধর্ম্ম---প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ বৃত্তির নাম ধর্ম্ম।

(২) অর্থ---বর্ণাশ্রমানুরূপ ধন-ধান্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক দেবতা-পিতৃ-কর্ম্মে ও প্রাণি-রক্ষা-বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশ-কাল-পাত্র বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মবুদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ।

(৩) কাম---কাম দুই প্রকার, ইহা-লৌকিক ও পারলৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধান্য, অন্ন, পানীয়, দারা পুত্র, মিত্র, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুসুম, তাম্বূল, বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি বিষয়ানুভব-জনিত সুখ-স্পৃহা।

(৪) আত্মানুভব---দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র অনুভব কেবল আত্মানুভব হয়। ইহাই এক প্রকার মোক্ষ।

(৫) ভগবদনুভব---ভগবদনুভবই পরম পুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ--কর্ম্ম ও পুণ্য-পাপনাশে--"অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি"--তাপত্রয়াশ্রিত এই ছয় বিকার-রহিত হইলে ভগবৎ-স্বরূপ আবরণ-পূর্ব্বক বিপরীত জ্ঞানোৎপাদক সংসার-বর্দ্ধক স্থূল-শরীর পরিত্যাগ করতঃ সুষুম্নানাড়ী দ্বারে শিরঃ কপাল ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্ম-শরীরে অর্চ্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক বিরজা-স্নানে সূক্ষ্ম শরীর ও বাসনা রেণু দূর করতঃ সকল তাপ নিবর্ত্তক শ্রীবিগ্রহ-করস্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্বস্বরূপ পঞ্চোপনিষন্ময় জ্ঞানানন্দ-জনক, ভগদনুভবপর তেজোময় অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীট-যুক্ত অমরগণ মধ্যে মহামণি-মণ্ডপে ভূ-শ্রী-লীলাসহিত বর্ত্তমান পরব্যোমনাথকে নিত্য অনুভবপূর্ব্বক তদীয় নিত্য কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।

(ঘ) উপায়-স্বরূপ

(১) কর্ম্ম---যজ্ঞ,দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যা-বন্দন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্য-ক্ষেত্র-বাস, কৃচছচান্দ্রায়ণ, পুণ্য-নদী-স্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, ফল-মূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎ-সমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপনাশাদি কার্য্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ।

(২) জ্ঞান---আত্ম-তত্ত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগের সহকারী ঐশ্বর্য্যের প্রধান স্থান। হৃদয়-মণ্ডল ও আদিত্য-মণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্মীর সহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদাধারীরূপে অনুভব। এই শেষোক্ত জ্ঞান ভক্তিযোগের সহকারী।

(৩) ভক্তি---তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ-স্মৃতিবিস্তার-রূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্যবৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ এই যে তাহা প্রারব্ধ-

কর্ম্ম-নিবৃত্তি উপায়রূপ সাধ্য-সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়।

(৪) প্রপত্তি---ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানুভবরূপ যে উপেয় ভাবকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুই প্রকার, আত্মরূপ-প্রপত্তি ও দৃপ্তরূপ প্রপত্তি। নির্হেতুক ভগবৎ প্রসাদে শাস্ত্রাভ্যাস, আচার্য্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ, দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্ভজন্ম-জরাব্যাধি-মরণাদি নিবর্ত্তকত্ব বিচারপূর্ব্বক গত্যন্তরশূন্য আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া নমস্কার করতঃ নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন করতঃ একান্ত অনুগত হওয়ার নাম আর্ত্তরূপ-প্রপত্তি। দৃপ্ত-প্রপত্তি যথা,---দৃপ্ত-প্রপন্ন-পুরুষ স্বর্গ-নরকে বিরক্তি-পূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তি মানসে আচার্যোপদেশ-ক্রমে উপায় স্বীকার পূর্ব্বক বিপরীত-প্রবৃত্তি নিবৃত্তিপূর্ব্বক বেদ-বিহিত বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান বাচিক, মানসিক ও কায়িক ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরিত্ব ব্যাপ্যত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সম্পুর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব, নিয়াম্যত্ব, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষ্যত্ব, ভোগ্যত্ব, অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপানুসন্ধান করেন।

(৫) আচার্য্যভিমান---আমি অশক্ত ও দীন এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপন দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

(ঙ) বিরোধী-স্বরূপ

(১) স্বরূপ-বিরোধী---দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহে আত্মাভিমান, ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্ব-তন্ত্রতা এই কয়েকটী স্বরূপ-বিরোধী।

(২) পরত্ব-বিরোধী---দেবতান্তরে পরত্ব-প্রতিপত্তি, সমত্ব-প্রতিপত্তি, ক্ষুদ্র দেবতা বিষয়ে শক্তিযোগ-প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব-প্রতিপত্তি, অর্চ্চাবতারে অশক্তি-যোগপ্রতিপত্তি এইগুলি পরত্ব-বিরোধী।

(৩) পুরুষার্থ-বিরোধী---ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভুক্তিমুক্তিরূপ পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা এই দুইটী পুরুষার্থবিরোধী।

(৪) উপায়-বিরোধী—উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি, উপায়ে লাঘব বুদ্ধি এবং উপেয়-তত্ত্বে গৌরব, এই তিনটী উপায়-বিরোধী।

(৫) প্রাপ্তি-বিরোধী—প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অনুতাপশূন্য গুরূপসত্তি, ভগবদপচার, গুরুতর অন্যাপচার প্রভৃতি প্রাপ্তি—বিরোধী।

এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষ ব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমানুরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকারপূর্ব্বক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা, বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্য-সাধনে অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, ইতর বিষয়ে অরুচি, স্বদেহে অরুচি, স্বরূপ-জ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীমদ্গৌড়ীয় মতে—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্যরস বিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্য-রস ও মাধুর্য্যমূলক কৃষ্ণ-দাস্য-রসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণ-দাস্য-রসেও এই অর্থপঞ্চকের উপদেশ-সকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দাস্য-রসে বিশ্রম্ভ ভাব হইলে সখ্য-রস হয়। তাহাতে আবার স্নেহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ ও স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুরভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্তসমূহ আমাদের গৌড়ীয়-প্রেম-মন্দিরের ভিত্তিস্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

বেদান্ত দর্শন

গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রকাশ

আমরা শ্রীযুত কৃষ্ণগোপালভক্ত সম্পাদিত বেদান্তদর্শন পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, সটীক গোবিন্দ-ভাষ্য, তথা শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি-কৃত বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যে-সকল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ন্যায় উদিত হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও ভক্তসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের সংস্থাপন করিয়াছেন; এমন কি, যে সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতে কিছুমাত্র আচার্য্যত্ব-সম্মান লাভ করেন নাই।

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্তসকল উপনিষৎ আকারে নিত্য বর্ত্তমান। উপনিষদ্বাক্যসকল সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বোধ্য। এক বাক্যের অর্থের সহিত অন্য বাক্যের কি সম্বন্ধ তাহা সহজে বুঝা যায় না, সুতরাং বিদ্যার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। আত্মজ্ঞান ও জীবের কর্ত্তব্যতা কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় হৃদয়ে আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষদ্বাক্যের বিষয় বিভাগপূর্ব্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব মীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচার-নৈপুণ্যমাত্র নয়; কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক আর্য্য-গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞান সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অন্য কোন শাস্ত্রে পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন।

সারদাপীঠে শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক বৌধায়ন-ভাষ্য সংগোপিত

ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করাও জীবের পক্ষে সহজ নয়, সূত্রপাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয় এরূপ নয়, সূত্রের ভাষ্য ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না, অথবা কোন সদ্গুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এস্থলে কঠিন এই যে, সূত্রের যথার্থ ভাষ্য কোথায় পাওয়া যায় অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদ্গুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়। বৌধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু যত্নসহকারে শ্রীরামানুজ স্বামী সেই ভাষ্য সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রী-ভাষ্য রচনা-করেন---এরূপ সংস্কৃত প্রপন্নামৃত গ্রন্থে দেখা যায়। সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থানবিশেষ। শঙ্কর স্বামী অনেক যত্নে ঐ বৌধায়ন-ভাষ্য নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্কর স্বামী সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্য স্বীয় শারীরক ভাষ্য রচনা করেন, সেই ভাষ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্য বৌধায়ন-ভাষ্যকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এরূপ জনশ্রুতি আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য

বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন যে, যে-কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম তাহা সফল হইল না, আমি স্বয়ং কোন ভাষ্য না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে? শ্রীনারদের উপদেশে তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন, সেই সময় সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতেছিল, ব্যাসদেব তখন শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

শঙ্করস্বামি-কর্ত্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যদ্বয় সংগোপন

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌধায়ন ঋষি তদীয় গুরুর আজ্ঞায় একটি রীতিমত ভাষ্য প্রস্তুত করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটী ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদাজ্ঞা পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্য মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করতঃ পূর্ব্বোক্ত উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বেদান্তের মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া সূত্রের যথার্থ অর্থ জগৎকে দিয়াছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর রসাশ্রিত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদেগাবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দভাষ্যের আবিষ্কার করেন। শ্রীমদেগাবিন্দ-ভাষ্য অন্য সকল ভাষ্যের মধ্যে অধিক উপাদেয় হইবে সন্দেহ কি? মায়াবাদ-দূষিত পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, ভক্তমণ্ডলীতে গোবিন্দভাষ্যের তুল্য আর মাননীয় গ্রন্থ নাই--ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন পাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে। বলদেব নিজভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন--তত্র প্রথমে লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। দ্বিতীয়ে সর্ব্ব শাস্ত্রবিরোধঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মাপ্তি সাধনানি। চতুর্থে তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি। যত্র নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালু শান্ত্যদিমান্ অধিকারী। সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ। বিষমো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্ত-গুণ গণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ। প্রয়োজনন্ত্বশেষ-দোষবিনাশপুরঃসরস্তৎ সাক্ষাৎকার ইত্যুপরিস্পষ্টং ভাবি। যস্যাং খলু বিষয়-সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি। ন্যায়াধিকরণং। বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যং। সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদিবিষয়তয়া বহুবিধাপি ন বিতায়তে।

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী প্রভু ইহার এই প্রকার অনুবাদ করিয়াছেন---এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায় সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয়। দ্বিতীয়ে সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ পরিহার। তৃতীয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। চতুর্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম-ধর্ম্ম, নির্ম্মল-চিত্ত, সৎ প্রসঙ্গ-লুব্ধ, শ্রদ্ধালু, শমদমাদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের অধিকারী। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্তগুণগণ অচিন্ত্যানন্দশক্তি-সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষবিনাশ পুরঃসর তৎসাক্ষাৎকারই ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিষয়,সংশয়, পূর্ব্ব পক্ষ, সিদ্ধান্ত

ও সঙ্গতি এই পাঁচটীই ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই ন্যায়। বিচারযোগ্য বাক্যের নাম বিষয়। এক ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানা প্রকার অর্থ বিচারের নাম সংশয়। প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্ব্বপক্ষ। প্রামাণিক-রূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম সঙ্গতি। এই সঙ্গতি বহুবিধ, তাহা বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না; শাস্ত্রার্থাবগতিতে স্থানবিশেষ স্বয়ংই বিবৃত হইবে।

গোবিন্দ-ভাষ্য অতি উপাদেয়, সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই পাঠ্য

এই গ্রন্থের পাঠক মহাশয়গণ দেখুন যে, এই সূত্রভাষ্য কিরূপ উপাদেয়, আবার গোস্বামী যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা কিরূপ প্রাঞ্জল ও নির্দ্দোষ। অতএব বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ উপকার-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি সকলেই যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করুন। অনেকেই মনে করেন 'আমি বৈষ্ণব', কিন্তু কি-কি বিষয় জানিলে ও কি-কি করিলে জীব বৈষ্ণবপদবাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠ করা আবশ্যক। এই গোবিন্দ-ভাষ্য-বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ

"ভগীরথ পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া পিতৃকূল উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্‌বধি নানাশাস্ত্রে গঙ্গা-মহিমা পরিকীর্তিত হইতেছে। যাঁহারা গঙ্গা মানেন না, মহিমায় তাঁহারা উপহাস করেন। সম্প্রতি রসায়ন বিজ্ঞানবিৎ একজন সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত আমাদের ভাগীরথীকে উচ্চ সম্পদ প্রদান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। প্রকৃতরূপে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া তিনি জানিয়াছেন, গঙ্গাজল সম্পূর্ণরূপে নির্মল, তাহাতে কোন্ প্রকার অপবিত্রতা অথবা দূষিত কীটাণুসত্তা কিছু মাত্র নাই পৃথিবীর যাবতীয় নদনদীতে প্রচুর পরিমাণে অপবিত্র পদার্থ বিদ্যমান আছে, ভারতের গঙ্গা সর্বাংশে সে দোষ বর্জিত এবং সর্বতোভাবে পবিত্র। .... একপাত্র গঙ্গাজল তিনি সূক্ষ্মরূপে রূপ ভাগ (Analysis) করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত গঙ্গামাহাত্ম্য সমস্তই সত্যই সত্য। স্বদেশে পৌঁছিয়া তিনি এই মহৎ আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় তথাকার সমস্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন, গঙ্গা কেবল একাকিনীই পবিত্র নহেন, গঙ্গার সহিত যে সকল নদনদীর যোগ থাকে, সে সকল স্রোতের জলও পবিত্র হয়। বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা ইহা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শাস্ত্রে গঙ্গার মাহাত্ম্য যে প্রকারে লিপিবদ্ধ, তাহা যদি সেরূপ না হইয়া ঐরূপ বৈজ্ঞানিক মতানুসারে লিখিত থাকিত, অজ্ঞলোকে তাহা হইলে গঙ্গাকে এতদূর আদর করিত না। ধর্মের গৌরব করিয়া আমাদের শাস্ত্রকার মহাশয়েরা সকল বিষয়েই যে প্রকার পবিত্র ধর্ম ভাব আনিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যে পরিমাণে উপকার হইতেছে, নীরস বিজ্ঞানের প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহারা যদি সেই প্রমাণের উপর সাধারণ বিধি-ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন, আমাদের বোধ হয় তাহা হইলে ভারতের ধর্মভাব কখনই এতদূর বিশ্বজনীন হইতে পারিত না।"

প্রাকৃত বস্তুর মধ্যে গঙ্গার মহিমা যথেষ্ট নয়। প্রাকৃত জগতে চব্বিশটি তত্ত্ব আছে। জীব পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। জীবের স্থূল দেহে চব্বিশটি প্রাকৃত তত্ত্ব আছে। জীবের আত্মা ঐ চব্বিশ তত্ত্বের অতিরিক্ত। তাহা প্রকৃতির অতীত বলিয়া অপ্রাকৃত শব্দে অভিহিত। পরব্রহ্মও সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত তত্ত্ব। পরব্রহ্মের নামান্তর বিষ্ণু।

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' এই কথাগুলি বেদের মধ্যে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। সেই বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গাদেবী উৎপন্না হইয়াছেন। সুতরাং গঙ্গার জলসত্ত্বার যে কিছু প্রাকৃত মহিমা আছে, ইহা সর্ব শাস্ত্র-সম্মত। মার্কিন পণ্ডিত মহাশয় এবং পত্রিকার লেখক মহোদয় গঙ্গার প্রাকৃত মহিমাতে মুগ্ধ হইয়াছেন,—

কিন্তু সে মহিমা অপেক্ষা অনন্ত মহিমা গঙ্গাদেবীতে বিরাজমান। শুদ্ধভক্ত মণ্ডলী একথা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, গঙ্গার নিকট বাস করিলে এবং গঙ্গার জল পান করিলে হরিভক্তি উদয় হয়। যে জল পরম কারুণিক পরমেশ্বরের চিন্ময় পাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত, সে জলে যে হরিপাদপদ্মে ভক্তি উদয় করাইবার শক্তি আছে তাহা ব্যাসাদি মহর্ষিগণ সর্বত্র গান করিয়াছেন জীবাত্মা কলুষিত হইয়া জড় জগতে হরিবিস্মৃতি-দুঃখে মগ্ন আছেন। গঙ্গাজলে অবগাহন করতঃ যখন তিনি হরিগুণ গান করেন, তখন তাঁহার চিত্তে ভক্তি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে। গঙ্গার এই পরমগুণ কেবল ভাগ্যবান্ লোকেই অনুভব করিতে পারেন। যাঁহারা ভাগ্যহীন তাঁহারা কেবল প্রাকৃত গুণেই আবদ্ধ থাকেন। যদি বল, অনেকেই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল পান করেন কিন্তু কখনই হরিভজন করেন না, তাহাতে কথা এই যে বস্তুতে যে গুণ আছে তাহা প্রতিবন্ধকশূন্য বস্তুতেই ব্যাপ্ত হয়।

Electricity (তড়িৎ) নামক বস্তুগুণ Good Conductor বস্তুতে ব্যাপ্ত হয়। যে Bad conductor বস্তু তাহাতে সে গুণ ব্যাপ্ত হয় না। তদ্রূপ জীবগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ বিশেষ অপরাধ করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিরূপ Electricity সম্বন্ধে Bad conductor; হরিনাম বলে যাঁহারা পাপ করেন তাঁহারা নামাপরাধী। গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যের ভরসায় যাঁহারা পাপ করেন তাঁহারা গঙ্গাদেবীর প্রতি বিষম অপরাধী। অন্য সমস্ত পাপ গঙ্গাস্নানে দূর হয় কিন্তু উক্ত উপরাধ গঙ্গাস্নানে দূর হয় না। যাঁহাদের এই অপরাধ আছে, তাঁহারা Bad conductor যে গঙ্গার অনন্ত মহিমা অনুভবে সমর্থ হয় না। এই কারণেই আজকাল গঙ্গার চিন্ময়ী শক্তি অনেকের উপলব্ধিতে আসে না, কেবল প্রাকৃত জল ধর্ম সকলই তাঁহাদের বুদ্ধিগোচর হয়।

কলি

কলি সকল উৎপাতের কারণ।

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ।।

(ভাঃ ১২।৩।৪৩)

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গভীর অর্থপূর্ণ বচনটী পাঠ করিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখের কারণ আমরা বুঝিতে পারি। সম্প্রদায়-দীক্ষা লাভ করিয়া অর্চ্চন-মার্গে প্রবেশ করিয়াও প্রেমলাভ করি না। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও আমাদের বিশুদ্ধা কৃষ্ণমতি জন্মে না। অনেক ব্রতাদি আচরণ করিয়াও আমরা নির্ম্মল ভক্তি লাভ করি না। গোস্বামি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমরা সরল গৌরভক্তি অর্জ্জন করিতে পারি না। অভ্যাগত বৈষ্ণবের নিকট ভেক ধারণ করিয়াও আমরা কেবল সংসার উপাসনা করিতে থাকি। কলিই আমাদের সকল উৎপাতের একমাত্র কারণ হইয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করে।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্যোপাসনা পাষণ্ড-মত

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত উপাস্য দেবতার উপাস্য এবং জগতের পরমগুরু। কৃষ্ণোপাসনা সকল জীবের সার্ব্বকালিক কর্ত্তব্য হইলেও জীবসকল কলিকালে পাষণ্ড-মত ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাকে প্রায় ভুলিয়া থাকে এবং তৎপ্রতি অকৃত্রিম ভক্তি-ধর্ম্ম আচরণ করে না। এই শ্লোকের অর্থ আবার আর এক শ্লোকে রূপান্তরে কথিত হইয়াছে। যথা,—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।

(ভাঃ ১২।৩।৪৪)

সংসারী জীব সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ ও দুঃখে আতুর। যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম পতিত, স্খলিত বা বিকল হইয়া উচ্চারণ করিলে সেই ম্রিয়মান জীব সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন, হায়! কলিকালে তাঁহারা সেই পুরুষের নাম-যজন-রূপ একমাত্র যজ্ঞে তাঁহাকে উপাসনা করেন না।

নাম-কীর্ত্তনই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু

মূল তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মই জীবের বন্ধন। সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য নাম-সঙ্কীর্ত্তন একমাত্র উপায়। কেবল জ্ঞানই জীবের গতি নয়, কিন্তু ভক্তিই জীবের উত্তমা গতি। কলি এরূপ অধর্ম্ম-বন্ধু ও জীব -শত্রু যে, তাহার এই নির্দ্দিষ্ট কালে জীবকে সঙ্কীর্ত্তনরূপ নির্ম্মল ধর্ম্মে স্থির হইতে দেয় না। সঙ্কীর্ত্তনকে কলিকালের একমাত্র ঔষধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র হইলেও কলিকালের একটী মহাগুণ আছে, অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিলে সহসা জীব মুক্তসঙ্গ হইয়া পরা-ভক্তিকে লাভ করেন।

এখন দেখ ভাই! শাস্ত্র বলিতেছেন যে, সকল উপায় পরিত্যাগ করিয়া জীব কলিতে কেবল কীর্ত্তন করিবেন, আবার বলিয়াছেন যে, কলিতে জীব কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা প্রায়ই করে না। ইহার হেতু কি?

বাসনাজাত চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত ও কর্ম্মের বশ

মনুষ্যের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন বিষয়-বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করে, কিন্তু চিত্ত-প্রবৃত্তি অপরাজিত থাকিয়া প্রেয়ঃ বিষয়ে ধাবমান হয়, বিবেককে স্থির হইতে দেয় না। অনেকেই বিদ্যাভ্যাস করিয়া এবং সল্লোকের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারেন যে, মদ্যপান ও মাংস ভোজন করা মন্দ, কিন্তু লালসাক্রমে ঐ সকল কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন না। শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ সকলই জানেন যে, হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি নাই; তথাপি সামান্য কর্ম্ম-মীমাংসার বশবর্ত্তী হইয়া চিত্ত-প্রবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া থাকেন। প্রাক্তনীয় ও আধুনিক বাসনা হইতেই চিত্ত-প্রবৃত্তির জন্ম হয়।

সাধুসঙ্গ ও নামে রুচি হইতেই চিত্ত-সংযম হয়, যুক্তিদ্বারা নহে

বহুতর সৎসঙ্গ ও সদালোচনা ব্যতীত চিত্ত-প্রবৃত্তির বল কম হয় না। কেবল যুক্তি-জনিত বিবেক কিছুই করিতে পারে না। অতএব ভক্তি-মীমাংসকগণ লিখিয়াছেন যে,—

সল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্য অপ্রতিষ্ঠতা।।

(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩২)

যে জীবের হরিনামে স্বল্পা রুচি অর্থাৎ চিত্ত-প্রবৃত্তি হইয়াছে, সেই জীবের ভক্তি হয়। কেবল যুক্তিদ্বারা কখনই ভক্তি হয় না। বেদে কেবল যুক্তির অপ্রতিষ্ঠা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিহত-জীবের হরিনামে রুচি সহজে হয় না।

বিবেক দ্বারা তাঁহারা শুনিয়া থাকেন, যে---

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

(বৃহন্নারদীয় ৩৩।১২৬)

কলিতে ধর্ম্মের নামে পাপাচার ও কপটতা

যখন চিত্ত-প্রবৃত্তি বেশ্যালয়ে বা মদ্যে বা সুবর্ণ প্রয়াসে টানিয়া লয়, তখন কলি-হত-জীব কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ চরিত্রের দোষ বাঁচাইতে গিয়া নানা পথ অবলম্বন করে। যুক্তিদ্বারা দেখাইতে থাকে যে, কিয়ৎ পরিমাণ মদ্য ও মাংস ভোজন না করিলে মনুষ্যের বল রক্ষা হয় না। বেশ্যা-গমন ইত্যাদি যে মানবের আবশ্যক-পাপকার্য্য, তাহা নানা ভঙ্গীতে বলিতে থাকে। কপট-ভক্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে। হরিনাম কীর্ত্তন যে ভাল কর্ম্ম তাহা দেখাইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল করিয়া প্লেগ, মহামারী ও অন্যান্য পাপনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে স্বার্থ-সাধক নগর-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকে। কর্ম্মিগণ অর্থপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া একটী কপট পন্থা বাহির করে। নাস্তিকগণ শূন্যের বা শূন্যপ্রায় কল্পিত-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া চালাইতে চায়। প্রতিদিনই জগতে এই প্রকার কপট ক্রিয়া চলিতেছে। আবার উহাদের কথা এই যে, ভাল বস্তুর ভাণও ভাল। এই উপদেশ দিয়া তাঁহারা কপট বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কলির সেবা করিতেছেন।

কলির অধিকার ও স্থান-নির্ণয়

কলিই এই সমস্ত উৎপাতের মূল। কলির অধিকার বর্জ্জন করিয়া যাঁহারা

চলিতে পারেন, তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেন। আমরা নিজ নিজ উপকারের জন্য কলির অধিকার বিচার করিয়া দেখাইব।

শ্রীমদ্ভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে---কোন সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্ম্মবলে কলিকে নিগ্রহ করিলে কলি তাঁহার নিকট কোনও একটি যাচ্ঞা করিল। পরীক্ষিৎ কহিলেন---ওরে অধর্ম্মবন্ধো! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে অন্য কোন স্থান পাইবে না। চারিটি অধর্ম্ম স্থান তোমাকে দেওয়া গেল।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ।।

(ভাঃ ১।১৭।৩৮)

কলির প্রার্থনামতে তাহাকে রাজা চারিটী স্থান অর্পণ করিলেন। দ্যূতক্রীড়া, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ---এই চারিটী যথা ঘটে, সেই স্থান কলিকে দিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।।

(ভাঃ ১।১৭।৩৯)

একত্রাবস্থান যাচ্ঞা করায় রাজা তাহাকে স্বর্ণ; পরে অসত্য ব্যবহার, মন, কাম, রজ, বৈর---এই কয়েকটীও দান করিলেন।

কলি-পঞ্চক ও তাহার স্থান-চতুষ্টয়

এই কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখুন। যদি কলি হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করিতে বাঞ্ছা থাকে তবে দ্যূতক্রীড়া-স্থান, পান, স্ত্রীসঙ্গ ও পশুবধ হইতে নিরস্ত থাকা আবশ্যক সর্ব্বত্রই সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থের প্রয়োজন সেই সেই স্থানে স্বভাবতঃ অসত্য ব্যবহার, মদ, কাম, রজ, বৈর বিরাজমান। উক্ত চারিটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ আলোচিত হইলে বিষয়টী বিশদ হইবে।

(১) দ্যূত-ক্রীড়া---কলির স্থান

আদৌ দ্যূতক্রীড়া স্থানের বিচার হউক। অপ্রাণী বস্তুদ্বারা ক্রীড়া যেস্থলে হয়, তাহাই দ্যূতক্রীড়া স্থান। তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দীরূপ যত প্রকার ক্রীড়া আছে, সে-সব স্থানকে দ্যূতক্রীড়া স্থান বলা যায়। অধুনাতন লটারী-গৃহকেও

দ্যূতক্রীড়ার স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতি রাজন্য-বর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যূত-ক্রীড়া-স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায় দ্বারা অর্থলাভ জন্য বিষম কলহ ও সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে, সে-সব স্থানে অনেকের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই নাশ হইতেছে। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহপ্রিয়তা লাভ করে। তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পারে না। কলি যে দ্যূতক্রীড়া স্থানে বাস করে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? পথে যাইতে যাইতে আমরা অনেক বিপণী দেখিতে পাই--যেখানে কতকগুলি মানব মিলিত হইয়া তাস, শতরঞ্চ ও পাশা ক্রীড়া করিতে থাকে। ক্রীড়াপ্রিয় বিপণীপতি ক্রেতাগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না; ক্রমে ক্রমে ক্রেতার সংখ্যা লাঘব হইয়া যায় এবং অল্প কালের মধ্যে বিপণী নষ্ট হয়। কখন কখন চৌরগণ বিপণীপতির ক্রীড়াসক্তি দেখিয়া বিপণীর দ্রব্য অপহরণ করে। বিপণীপতির সহিত যাহারা খেলিতে আইসে, তাহারা বিপণীর দ্রব্য যোগেযাগে স্থানান্তরিত করিয়া বিপণীপতিকে উৎসন্ন করে। ভাই দেখ, দ্যূতক্রীড়া কি ভয়ানক! অনেক ভদ্রলোক অসৎসঙ্গে পীড়িত হইয়া ক্রীড়া-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অসৎ হইয়া যায়। এই জন্য দাস-গোস্বামীর খুড়া কালিদাস মহাশয় অসৎ জনের অনুনয়ে ক্রীড়া করিতে বসিয়া নিরন্তর হরিনামোচ্চারণ দ্বারা আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিতেন। যিনি উত্তম, ধার্ম্মিক বা ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অবশ্যই দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ করিবেন।

(২) পান—কলির স্থান

এখন পানরূপ কলির স্থানটী বিচার করা যাউক। আসব-মাত্রই পান। পান কোনস্থলে দ্রব জলীয়, কোনস্থানে ধুম্রাকার। তন্ত্রে বলিয়াছেন,—

> পর্ণপুগৌ তাম্রকূটস্তরিতা মদিরা সুরা।
> ব্রতবিধ্বংশিনো হ্যেতে বলিনশ্চোত্তরোত্তরাঃ।।
> নাগবল্ল্যা প্রবর্দ্ধন্তে বিলাসেপ্সাঃ সুদুর্জ্জয়াঃ।
> গুবাকেন সদা চিত্তাচাঞ্চল্যং পরিলক্ষ্যতে।।
> তাম্রকূটাৎ মতিভ্রংশো জাড্যং বৈমুখ্যমেবহি।
> তরিতা সেবনাদ্‌বুদ্ধিনাশঃ কিল ভবিষ্যতি।।

অহিফেনং ধুম্রপানং মদ্রিকা চাষ্টসংখ্যকা।
স্বল্পকালে প্রকুর্ব্বন্তি দ্বিপদাংশ্চ চতুষ্পদান্।।
এতে চোপাধয়ঃ শশ্বৎ বহির্ম্মুখেষু কল্পিতাঃ।
দুর্ব্বৃত্তকলিনা সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তিনিবৃত্তয়ে।।

পর্ণ (তাম্বূল), গুবাক, তামাক, গাঁজা, মদিরা ও সুরা—এই সকল আসব ব্রতধ্বংসকারী। ইহারা উত্তরোত্তর বলবান্। পর্ণ সেবনে সুদুর্জ্জয় বিলাসেপ্সা বৃদ্ধি হয়। গুবাক দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্য উদয় হয়। তাম্রকূটের দ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজা সেবনে বুদ্ধি নাশ হয়। অহিফেন, ধূম্রপান ও অষ্টপকার মদ্রিকা অল্পকালের মধ্যে দ্বিপদগণকে চতুষ্পদ-তুল্য করিয়া ফেলে। এই উপাধিসকল বহির্ম্মুখ জীবের ভক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্ত কলি সৃষ্টি করিয়াছে।

অন্য তন্ত্রে যথা,—

সংবিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসং তারিকা তরিতা তথা।
ইত্যষ্টৌসিদ্ধিদ্রব্যাণি ভক্তিহ্রাসকরাণি বৈ।
স্বকার্য্যসিদ্ধয়ে সাক্ষাৎ কলিনা কল্পিতানি হি।।

ভাং, কালকূট, তামাক, ধুস্তুর, আফিং, খর্জ্জুর রস, তাড়ি ও গাঁজা—এই আটটী সিদ্ধি দ্রব্য। স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য কলি সাক্ষাৎ কল্পনা করিয়াছে।

অন্য তন্ত্রে মদিরা বিষয়ে,—

মাধ্বিকমৈক্ষবং দ্রাক্ষ্যং তালখর্জ্জুরপানসং।
মৈরয়ং মাক্ষিকং টাঙ্কং মাধুকং নারিকেলজং।
মুখ্যমন্নবিকারোত্থ মদ্যং দ্বাদশধা স্মৃতম্।।

মাধ্বিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষা, তাল, খর্জ্জুর, পনসজাত, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজাত ও অন্নজাত—এই প্রকার দ্বাদশ জাতীয় মদ্য। মূল শ্লোকে পান শব্দের অর্থে স্বামী লিখিয়াছেন—'পানং মদ্যাদিঃ।' মদ্যাদি শব্দে এই সমস্ত আসবকে বুঝিতে হইবে। তাম্বূল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নবিকার পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রতনাশক মদ্য। যিনি ধর্ম্ম বাসনা করেন, তিনি অবশ্য এই সকল আসব হইতে

পৃথক থাকিবেন। আসব দ্বারা বৈরাগ্য ও ভজনের উপকার হয়---এরূপ কথা কেবল আসব-পরতন্ত্র লোকের আত্মরক্ষা বাক্যমাত্র।

(৩) স্ত্রী—কলির স্থান

এখন স্ত্রী শব্দের বিচার করা যাউক। স্ত্রী শব্দে ধর্ম্মপত্নী এবং অধর্ম্মপত্নী উভয়কেই বুঝায় বটে। এস্থলে ধর্ম্ম-পত্নীর কথা নয়, কেননা শাস্ত্রমতে,---

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।

(উদ্বাহ তত্ত্ব)

ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত বর্ত্তমান হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও পঞ্চতম পুরুষার্থরূপ ভক্তিকে সেবা করিবেন---ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্য বিধি। বিবাহিত পত্নীর সহায়তায় জীবন নির্ব্বাহ করিলে কলিদোষ লাগে না। যেস্থলে পুরুষ স্ত্রৈণভাবে আপনার পত্নীর বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, সেইখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান। ধর্ম্ম-শূন্য স্ত্রীসঙ্গেই কলির বল। বৈষ্ণব ঋষিগণ, অম্বরীষাদি রাজগণ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাসাদি গৃহস্থ ভক্তগণ ইহার উদাহরণ। এই কারণেই শ্রীমহাপ্রভু সন্নাসিগণকে গৃহস্থ বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ডে অষ্টম অধ্যায়,---

বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি।
তিহোঁ সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি।।
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডপাত।।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তাঁর।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার।।
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত।।
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি' বৈষ্ণবেরে।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে।।

শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা।।

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৪৯-১৫৩, ১৬২)

ধর্ম্মপত্নীর আদর সর্ব্বশাস্ত্রে আছে। অধর্ম্ম পত্নীর তিরস্কার সকলেই গান করেন, তথাপি সহজিয়া ও বাউলগণ পরস্ত্রী লইয়া উপাসনার ভাণে কলির কবলে নিরন্তর পড়িয়া অবশেষে মহারৌরবে পতিত হন। বেশ্যালয়ে যে-সমস্ত উৎপাত হয় তাহা এস্থলে বলা বাহুল্য। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গই যে কলির কার্য্য তাহাতে ভ্রম নাই। ধর্ম্মপত্নীর সাহায্যে ভক্তি সাধনোপযোগী জীবন নির্ব্বাহ করা এবং অধর্ম্ম পত্নী বা উপপত্নীতে রত হওয়া---দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় জানিতে হইবে। অধর্ম্মাশ্রিত-স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই কলির অধিকারে থাকে, অতএব তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিবে।

(৪) সূনা—কলির স্থান

সূনা অর্থে প্রাণীবধ।। ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণীবধ যথায় হয়, সেস্থান কলির একান্ত স্থান। অতএব নারদ বলিয়াছেন,---

নহ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজো গুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ।।
হন্যন্ত পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মনমানৈরিমং দেহমজরা মৃত্যু নশ্বরম্।।

যেখানে প্রেয় জড়সেবা,তথায় বুদ্ধিভ্রংশকারী অন্য রজোগুণের প্রয়োজন নাই। শ্রী-মদ-রূপ রজোগুণ হইতে সৎকুল জন্মাদির বৃথা অভিমান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও আসবসেবা অর্থাৎ মদ্য, ধূম্রাদি পান, নরগণের পরস্পর বিষয় লইয়া যুদ্ধ, জিহ্বা-লাসসায় জীববলি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবহত্যায় কলি বাস করেন।

কলি-পঞ্চক সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য

রজোগুণ হইতেই অর্থলোভ হয়। সুতরাং অর্থের সুব্যবহার অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা ও ভাগবতসেবা এবং বিশুদ্ধরূপে জীবন নির্ব্বাহ ব্যতীত যে সুবর্ণাসক্তি, তাহাতে কলির বাস নিত্য আছে। অনৃত অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ ও কপট ব্যবহার

দ্বারা মনুষ্য-স্বভাব অত্যন্ত দূষিত হয়। তাহাও কলির বাসস্থান। মদ কলির প্রিয় স্থান। ভাগবত বলেন,---

শ্রিয় বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্মরেনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ।।
(ভাঃ ১১।৫।৯)

জড়ীয় শ্রী-রূপ-বিভূতি, উত্তম কুলে জন্মাভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সন্ন্যাস, রূপ ও বল---এই ছয় প্রকার মদ হইতে ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধ হয়। ঐ সমস্ত কলির বাসস্থান। বৈর যে কলির বাসস্থান তাহাতে সন্দেহ কি?

অতএব কৃষ্ণ বলিয়াছেন,---

অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চৈনং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।।

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ্য করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহার প্রতি বৈরসাধন করিবে না। কাম যে কলির স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণসেবার কাম অপ্রাকৃত, তাহার নাম প্রেম। ইন্দ্রিয় সেবার কাম প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান। তাহা অবশ্য পরিত্যাগ করিবে।

কলির অধিকার ত্যাগ না করিলে কখনই হরিভজন হইবে না। পাঠক, বিশেষ মনোযোগে এই প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন।

বেণচরিত্র সমীক্ষা

বেণচরিত্র আর্য-ইতিহাসের একটি প্রধান পর্ব। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বেণরাজা একাদশ পুরুষ। এস্থলে বিচার্য এই যে, মনু ও তদ্বংশীয় মহাপুরুষেরা কোথায় বাস করিতেন। শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে কথিত আছে যে, মনু ব্রহ্মাবর্তেই বাস করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত হইতে দক্ষিণ এবং কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাংসে মনুর বহির্ম্মতী নগরী ছিল। ব্রহ্মর্ষি-দেশের সীমা তৎকালে নির্ণীত না হওয়ায় ঋষিগণ মনুর নগরকে ব্রহ্মাবর্তান্তর্গত বলিয়া উত্তর করিয়া থাকেন। বাস্তবিক মনুর নগর সরস্বতীর দক্ষিণপূর্ব হওয়ায় ঐ নগর ব্রহ্মর্ষিদেশস্থিত, কহিতে হইবে। কর্দম প্রজাপতির আশ্রম বিন্দুসর হইতে মনু যৎকালে নিজপুরীতে প্রত্যাগমন করেন তৎকালে প্রথমে সরস্বতীর উভয় কুলে ঋষিদিগের আশ্রম দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ সরস্বতী পরিত্যাগপূর্বক কুশ-কাশ মধ্যে নিজ নগরে গমন করিলেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। মনুসম্বন্ধে তাহাদের দ্বিতীয় বিচার এই যে, মনু কি জন্য ক্ষত্রিয় হইলেন। ব্রহ্মার পুত্রসকল প্রজাপতি -নামে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। তখন স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মসদৃশ হইয়া কি জন্যই বা অধস্থ পদ গ্রহণ করিলেন। বোধ হয় প্রথম যখন আর্যেরা ব্রহ্মাবর্ত স্থাপন করেন, তখন সকলেই একবর্ণ ছিলেন; কিন্তু বংশবৃদ্ধিকরণার্থে স্ত্রীলোকের অভাব হওয়ায় অজ্ঞাতকুলশীল একটী বালক ও বালিকাকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে আর্যত্ব প্রদানপূর্বক আর্যমতে বিবাহিত করিলেন। তাঁহারাই স্বায়ম্ভুব মনু ও তৎপত্নী শতরূপা। তাঁহাদের কন্যারা ঋষিদিগকে বিবাহ করিয়া আর্যকুলকে সমৃদ্ধ করেন। প্রকাশ্যরূপে অনার্যদিগের কন্যাগ্রহণ-কার্যটী আর্যগৌরবের ব্যাঘাত বিবেচনা করিয়া পালিত দম্পতিকে স্বায়ম্ভুবত্ব ও আর্যত্ব প্রদান করতঃ তাঁহাদের কন্যা-গ্রহণরূপ কৌশল অবলম্বিত হয়। কিন্তু তদ্বংশজাত পুত্রগণকে শুদ্ধার্যদিগের সহিত সাম্যদান করিতে অস্বীকার করতঃ তাহাদিগকে ক্ষত্র-নামে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। ক্ষত হইতে ত্রাণ করিতে সক্ষম যিনি, তিনি ক্ষত্র; এরূপ ব্যুৎপত্তি রঘুবংশের টীকায় মল্লিনাথ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। মনু ও তদ্‌বংশকে আর্যমধ্যে পরিগণিত করিয়াও তাঁহাদিগকে ব্রহ্মাবর্ত-সংস্থাপক মূল আর্যগণ হইতে ভিন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে আপনারা ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ক্ষত্রবংশীয় মহোদয়গণকে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষাকর্তা-স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। শুদ্ধ ব্রহ্মাবর্ত ভূমিতে উত্তর-পশ্চিম অবলম্বন-পূর্বক পঞ্চনদস্থ অসুরকুল হইতে

রক্ষাকর্তাস্বরূপ দেবতাদিগের বাস ছিল। সরস্বতী নদীর তীরে ঋষিগণ বাস করিতেন। তদ্দক্ষিণপশ্চিমদিকে দাক্ষিণাত্য অসভ্যজাতি হইতে ব্রাহ্মণদিকের রক্ষাকর্তাস্বরূপ মনু ও মনুবংশের অবস্থান হইল। মানব রাজারা দৈব-রাজ্যের অধীন ছিলেন। ইন্দ্রদেবতা সকলের সম্রাট। দেবগণ যে অংশে বাস করিতেন, তাহার নাম ত্রিপিষ্টপ, অর্থাৎ সর্বোচ্চ তিনটী ভূমি। সর্বোচ্চভাগে ইন্দ্রের পুরী উত্তরদিকে সংহতি ছিল। ঐ পুরীর অষ্টদিক্, মধ্য ও উপরিভাগ লইয়া দিগ্‌পালেরা বাস করিতেন। গ্রন্থবিস্তারভয়ে এবিষয়ে এস্থলে আধুনিকমত আর অধিক বলা যাইবে না। এস্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিয়া এ বিষয় ত্যাগ করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পুরুষে কশ্যপের পুত্রগণ দৈবরাজ্য সংস্থাপন করেন। ব্রহ্মা হইতে কশ্যপ পর্যন্ত প্রাজাপত্য ও মানব-রাজ্য ছিল, তৎপরে দৈবরাজ্য প্রবৃত্ত হইল। দৈবরাজ্য প্রবল হইলে দেবাসুরের যুদ্ধ হয়। দৈবরাজ্যটী সময়ক্রমে যত নিস্তেজ হইল মানব রাজ্যের তত প্রবলতা হইতে লাগিল। স্বায়ম্ভুব মানব-রাজ্য অধিক দিন ছিল না। বৈবস্বত মানব রাজ্য প্রবল হইয়া উঠিলে ক্রমশঃ স্বায়ম্ভুব মানব-রাজ্য নির্বাণ হয়। বৈবস্বত মনু সুর্য্যের পুত্র। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা তাঁহার জননীর নাম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও বোধ হয় পোষ্যপুত্র ছিলেন, অথবা কোন অনার্য-সংযোগে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার ভ্রাতাদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইতে না পারিয়া স্বায়ম্ভুব মনুর দৃষ্টান্তে ক্ষত্রত্ব স্বীকার করিলেন। এ বিষয়ে আধুনিকমত অধিক আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। বেণরাজা কালক্রমে দেবতাদিগকে হীনবল দেখিয়া দৈবরাজ্যের সংস্থানভঙ্গে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাহাতে দেবতাদিগের পারিষদ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বধ করেন এবং তাঁহার উভয় হস্ত পেষণ করিয়া অর্থাৎ উভয় পার্শ্বভূমি অন্বেষণ করিয়া পৃথূনামক মহাপুরুষ ও অর্চিনাম্নী সংযোজনপূর্বক রাজ্যভার দিলেন। পৃথুরাজার সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রামাদিপত্তন, কৃষিকার্যের আবিষ্কার, উদ্যান প্রস্তুত ইত্যাদি নানাবিধ সাংসারিক উন্নতি সংঘটন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্বন্ধে বিতর্ক

চারি বৎসর হইল, আমি প্রচারকার্য্য বন্ধ করিয়া কোন নির্জ্জন গুহায় ভজন করিতেছিলাম। অদ্য কোন কোন বৈষ্ণবের অনুরোধে লোকালয়ে আসিয়া প্রথমেই একটী বিষয়সম্বন্ধে দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। শুনিলাম, কোন কোন আচার্য্যসন্তান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পৃথক্ মন্ত্রে উপাসনা ও তাঁহার জন্মদিনে উপবাসপূর্ব্বক ব্রতপালন নাই। এই ব্যবস্থাটী আচার্য্যসন্তানদিগের পক্ষে যোগ্য কিনা, ইহার বিচারের পূর্ব্বেই আমি কিছু বলিতে চাই। মহাপ্রভুর নিজমন্ত্র আছে কিনা, এই কথার বিতর্ক কি জন্য উঠিল? যে আচার্য্যসন্তান এই বিতর্ক উঠাইলেন, তিনি কি সরলহৃদয়ে এ বিষয়ের আন্দোলন করিলেন, অথবা পারমার্থিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোন অভিপ্রায়দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছেন? গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে কোন প্রকার দোষ না থাকে, এরূপ ইচ্ছাক্রমে কি এই বিতর্ক উদয় হইল? অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে তাহা নয়। কেননা যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তিনি অবশ্য যথার্থ দোষের সংশোধনের প্রয়াস করিতেন। হে ভক্তবৃন্দ! এই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে চারি শত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থ উদয় হইয়াছে। সেই সকল অনর্থ সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা আচার্য্যসন্তানদিগের প্রধান কার্য্য। আচার্য্য-শব্দের অর্থ কি? যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দেন তিনিই আচার্য্য। কেবল বিতর্ক উৎপন্ন করিয়া সাংসারিক উন্নতি লাভ করিলে আচার্য্যত্ব লাভ হয় না। গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের যাঁহারা আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনর্থসকল দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমি দুই একটী অনর্থের উল্লেখ করিতেছি। আজ কাল গৌড়ীয়সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবগণ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারেন। যথাঃ—

১। পূজাপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ।

২। ভিক্ষাশ্রমগত অভ্যাগত বৈষ্ণবগণ।

৩। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাস্থিত প্রাপ্তভগবদ্দীক্ষ পুরুষগণ।

৪। 'বৈষ্ণব জাতি' বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ।

এই চারিশ্রেণী বৈষ্ণবের মধ্যে যিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধী আচরণ করেন, তিনি সম্প্রদায়ের অনর্থের মূল। আমি কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক

কিছুই বলিব না। অতএব যদি কাহারও আচরণের বিরুদ্ধ বাক্য হয় তিনি কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি উক্ত চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণবগণের যে যে প্রধান অনর্থ আছে সহৃদয়তার সহিত তাহার আলোচনা করিব।

পূজ্যপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ যথাশাস্ত্র সৎপাত্র থাকিয়া উপযুক্ত পাত্রকে মন্ত্রদান করিবেন। এতৎসম্বন্ধে পরস্পর-পরীক্ষা বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হইলেও কার্য্যে প্রচলিত হয় না। তন্নিবন্ধন গুরুশিষ্যের উভয়েরই পতন ও তৎসঙ্গে সম্প্রদায়বিকার অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অধিকারবিচার যেখানে থাকে না, সেখানে সকলই বৃথা। হায়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম কতদূর কলুষিত হইল।

ভিক্ষাশ্রমী বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও অধিকার-বিচারভ্রষ্ট হওয়ায় অনেক প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। ভিক্ষাশ্রমগমনের পূর্ব্বেই সেই আশ্রমের অধিকার লাভ করা উচিত। আজকাল তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

বর্ণাশ্রমস্থিত বৈষ্ণবদিগের ভক্তিতত্ত্ব-চর্চার নিতান্ত অভাব হওয়ায় সদসৎ-বিবেচনাশূন্য হইয়া তাঁহারা যার তার সঙ্গ ও অযথা সম্মান করিয়া করিয়া নিজের চিত্ত কলুষিত করিতেছেন। চিত্ত শোধনপূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তি আশ্রয় করাই জীবের কর্ত্তব্য; তাহা হইতেছে না। তাহাতে সাধুসঙ্গের অভাব হয়।

আজকাল মন্ত্রাচার্য্যদিগের অমনোযোগে বৈষ্ণবদিগের শুদ্ধভক্তিবিচার প্রায় রহিত হইতেছে। জাতি বৈষ্ণবগণ বিশুদ্ধভক্তিরহিত হইলেও বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান পাইবার দাবী করিয়া থাকেন এবং সেই দাবী অবিবেচক বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবদ্বারা সম্মানিত হইতেছে।

আমি অদ্য অনর্থগুলির দিঙ্‌মাত্র দেখাইলাম আবশ্যক হইলে পৃথক্ পৃথক্ সকল কথাই বিচার করিব। এই সকল অনর্থ বিদূরিত করিবার জন্য উপরোক্ত চারিপ্রকার বৈষ্ণবের সম্মিলন পূর্ব্বক একটী সম্প্রদায়-দোষ-শোধনী সভা হওয়া আবশ্যক। আমি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে, পূজ্যপাদ মন্ত্রাচার্য্যগণ এইরূপ একটী সভা সংস্থাপনপূর্ব্বক উক্ত অনর্থসকল যাহাতে শোধন হয় তাহার যত্ন করুন মন্ত্রাচার্য্যদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের শ্রীগৌরাঙ্গে অনন্য-ভক্তি আছে, তাঁহারা তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়কে নির্দ্দোষ রাখিবার জন্য স্বভাবতঃ ব্যস্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, যথার্থ সম্প্রদায়-দোষ দূরীকরণের যত্ন না

করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে বৃথা বিতর্ক কেন উঠিয়াছে বুঝিতে পারি না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন, একথার যখন কোন বিতর্ক নাই, তখন তৎসম্বন্ধে বৈধ-উপাসনা ও রাগমার্গীয় উপাসনার মধ্যে যে অনিবার্য্য পার্থক্য আছে, তদ্অবলম্বন পূর্ব্বক একটী বৃথা বিতর্ক উঠাইবার, কি আবশ্যকতা ছিল? অনুরাগিগণ বৈধ আচার্য্যদিগের মত লইয়া কার্য্য কখনই করেন না ও করিবেন না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন,—

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।" বৈধ ব্যবস্থাপক যদি রাগানুগার জন্য ব্যবস্থা করিতে যান, তাহা হইতে 'কামারের দই পাতা'র ন্যায় তাঁহার ব্যবস্থা কখনই ভাল হইবে না। কোন রাগানুগা ভক্ত বৈধভক্তদিগের অনুষ্ঠেয় কোন বিধির নিন্দা করিলে যেরূপ অবিচার হয়, অনুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্রাচার্য্যের বিধি নির্ম্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকার চর্চ্চা হইয়া উঠে। তাহাতে কেবল বিবাদ হয়, কোন ফল হয় না। আমি কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক জানাইতেছি যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসনাসম্বন্ধে বৈধ ও রাগানুগাদিগের যে পৃথক্ উপাসনা পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা বিনষ্ট করিবার জন্য কেহ যেন চেষ্টা না করেন। এ সম্বন্ধে আমার আর কোন কথা না কহিতে হইলেই আমি বড় সুখী হই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অভিধেয় তত্ত্ব

জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই

ভগবানের নাম দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ; জগৎ সৃষ্টি হইতে মায়ার গুণ অবলম্বনপূর্বক যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণসম্বন্ধীয়—'সৃষ্টিকর্তা', 'জগৎপাতা', 'বিশ্বনিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম; আবার মায়াগুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কয়েকটী নামও গৌণ-নাম-মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত গৌণনামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্য বর্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ময় ও মুখ্য। 'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দ্দন', 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', 'গোবিন্দ', 'গোপাল', 'রাম' ইত্যাদি সমস্তই মুখ্যনাম; এ সমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎ স্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্য বর্তমান। এই নাম জড়জগতে মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্বশক্তিসম্পন্ন--মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াকে ধ্বংস করিতে---প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্তমান জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। অতএব বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

---হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন, হরিনামই আমার জীবন; এই কলিকালে নাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।

নামের অনন্তশক্তি। পাপানলদগ্ধ জীবের পক্ষে হরিনাম অখিলপাপের উন্মূলক; যথা গারুড়ে---

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্তিতে সর্বপাতকৈঃ।

পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব।।

—সিংহরবে ভীত মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ অবশেও হরিনাম কীর্তিত হইলে সর্বপাপ দূর হয় এবং কীর্তনকারী তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন।

নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল দুঃখই নামকর্তৃক শমিত হয়; সর্বব্যাধিনাশকত্বধর্মও নামে আছে; যথা স্কান্দে—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্তনাৎ।

তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্।।

—যাঁহার স্মরণ ও নাম-কীর্তন হইতে আধিব্যাধিসমূহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সেই অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি।

হরিনামকারী ব্যক্তি কুল-সঙ্গ্যাদি (পংক্তি) পবিত্র করেন; যথা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—

মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্তয়ন্নানিশং হরিম্।

শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ।।

—মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায় ও তিনি পংক্তিপাবন হন (অর্থাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)।

নামপরায়ণ ব্যক্তির সর্বদুঃখের উপশম হয়; যথা, বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণে—

সর্বরোগোপশমং সর্বোপদ্রবনাশনম্।

শান্তিদং সর্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্তনম্।।

অনুক্ষণ হরির নামকীর্তনে সর্বপ্রকার রোগের উপশম, সকল উপদ্রবের নাশ এবং সর্বপ্রকার অশুভের শান্তি হইয়া থাকে।

নামোচ্চরণকারীর কলি-বাধা থাকে না; যথা বৃহন্নারদীয়ে—

হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।

ইতি রটন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ।।

—যাঁহারা নিত্যকাল 'হরে', 'গোবিন্দ', 'জগন্ময়', 'বাসুদেব' এই বলিয়া নামসমূহ কীর্তন করেন, তাঁহাদের উপর কলির আধিপত্য থাকে না।

নাম কীর্তন করিবামাত্র নারকীর উদ্ধার হয়; যথা নারসিংহে—

যথা যথা হরের্নাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ।।

—নারকিগণ যে যে স্থানে হরিনাম কীর্তন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

হরিনাম উচ্চারণ করিলে প্রারব্ধকর্ম বিনষ্ট হয়; যথা, ভাগবতে (১২।৩।৪৪ শ্লোকে) দেখা যায়—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তৎ কলৌ জনাঃ।।

—আহা! যাঁহার প্রিয় নাম মুমূর্ষু ও আতুর অবস্থায় এবং পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে, বা বিবশ হইয়া গ্রহণ করিলেও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ হয়, কলিকালে (দুর্বুদ্ধি) জনগণই তাঁহার যজন করে না।

হরিনাম সর্ববেদের অধিক; যথা স্কান্দে—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ।।

—হে তাত! ঋক্, যজুঃ, সামাদি বেদপাঠের কিছুই প্রয়োজন নাই। গোবিন্দাদি হরিনামই একমাত্র কীর্তনীয়। তুমি তাহাই সর্বদা গান কর।

হরিনাম সর্বতীর্থের অধিক; যথা বামনপুরাণে—

তীর্থকোটীসহস্রাণি তীর্থকোটীশতানি চ।
তানি সর্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানি কীর্তনাৎ।।

—শত সহস্রকোটী তীর্থসেবার সমগ্র ফল বিষ্ণুর নামকীর্তন হইতে লাভ করা যায়।

হরিনামের আভাসও সর্বসৎকর্মের অনন্তগুণে অধিক; যথা স্কান্দে—

গোকোটীদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্তেন সমং শতাংশৈঃ।।

—সূর্যগ্রহণে কোটী-গোদান, প্রয়াগ-গঙ্গাদিতে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ ও পর্বত-পরিমাণ সুবর্ণদান—এইসব গোবিন্দকীর্তনাভাসের শতাংশের সমও নহে।

হরিনাম সর্বার্থ দান করেন; যথা স্কান্দে—

এতৎ ষড়্‌বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরম্।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্তনম্।।

—অনুক্ষণ বিষ্ণুর এই নামকীর্তনই জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্‌বর্গের বিনাশ ও কামাদি রিপুসমূহের নিগ্রহকারী এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের মূল।

হরিনামে সর্বশক্তি আছে; যথা স্কান্দে—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ।।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানসাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্বাঃ স্থাপিতা স্বেযু নামসু।।

শ্রেষ্ঠদেবগণের সর্বপাপনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী শক্তিসমূহ—যাহা দান, ব্রত, তপ, তীর্থক্ষেত্রাদিতে বর্তমান এবং রাজসূয়াশ্বমেধাদি যজ্ঞে এবং অধ্যাত্মবস্তুর জ্ঞানে নিহিত আছে, ভগবান্ শ্রীহরি সে সমুদয় শক্তিই আকর্ষণ করিয়া নিজ নামে অর্পণ করিয়াছেন।

হরিনাম সর্বজগতের আনন্দকর; যথা ভগবদ্‌গীতায় (১১।৩৬)—

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা, জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।"

—হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য-সঙ্কীর্তনদ্বারা জগৎ প্রকৃষ্টরূপে হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, নাম তাঁহাকে জগদ্বন্দ্য করেন। যথা বৃহন্নারদীয়ে—

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্বত্র বন্দিতাঃ।।

—যাঁহারা নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসুদেব, জনার্দন প্রভৃতি নাম কীর্তন করেন, তাঁহারা সর্বত্র বন্দিত হন।

নামই একমাত্র অগতির গতি; যথা পাদ্মে—

অনন্যগতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিতাঃ।।
সর্বধর্মোজ্ঝিতাঃ বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেপি ধার্মিকাঃ।।

---যে সকল মানবের আর অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয়ভোগী, পরদ্রোহী, জ্ঞানবৈরাগ্যবিহীন, ব্রহ্মচর্যাদি তপোবর্জিত, সর্বধর্মাচারবিহীন, তাহারা একমাত্র বিষ্ণু নামানুশীলনদ্বারা যে (পরমা) গতি লাভ করে, সমুদায় ধার্মিক মিলিত হইয়াও সেই গতি প্রাপ্ত হন না।

শ্রীহরিনাম সর্বদা সর্বত্র সেব্য; যথা, বিষ্ণুধর্মোত্তরে---

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নাম্নিলুব্ধকো।।

---হরিনাম লোভীর পক্ষে হরিনাম-গ্রহণে দেশকালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি-বিষয়ে নিষেধ নাই।

মুমুক্ষুদিগকে নাম অনায়াসে মুক্তি দান করেন; যথা বারাহে---

নারায়ণাচ্যুতানন্ত-বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্তয়েদ্ভুবি যাতি মল্লয়তাং সা হি।।

---জগতে যে মানব নারায়ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বাসুদেব প্রভৃতির নাম সর্বদা কীর্তন করেন, তিনি ভক্তিযোগদ্বারা আমাতে যুক্ত হন।

গারুড়ে---

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নবনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনম্।।

হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি মুক্তি (স্বরূপপ্রাপ্তি) বাসনা করেন, তবে গোবিন্দনাম-কীর্তন করুন্; হে নরনাথ! যিনি সাংখ্য ও যোগাদিতে রত, তিনিও সংকীর্তনপ্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

হরিনাম জীবকে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি করান; যথা নন্দীপুরাণে---

সর্বত্র সর্বকালেষু যেঽপি কুর্বন্তি পাতকম্।
নামসঙ্কীতনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।।

যিনি সর্বত্র সর্বকালে পাপকর্মাদিতে রত, তিনিও সঙ্কীর্তনপ্রভাবে শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

হরিনাম ভগবানের প্রসন্নতা উৎপত্তি করান; যথা বৃহন্নারদীয়ে—

নামসঙ্কীর্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্প্রপীড়িতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ।।

হে বিপ্রগণ, ক্ষুধা তৃষ্ণাদিক্লিষ্ট অবস্থা সত্ত্বেও বিষ্ণুর নাম কীর্তন করিলে তাঁহার প্রতি অধোক্ষজ অত্যন্ত প্রীত হন।

হরিনাম ভগবান্‌কে বশীকরণে সমর্থ; যথা মহাভারতে—

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্।।

দ্রৌপদী দূরবাসী আমাকে 'হে গোবিন্দ' বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই ঋণ অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইতেছে না।

হরিনামই স্বভাবতঃ জীবের পরমপুরুষার্থ; যথা স্কান্দে ও পাদ্মে—

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জনম্।
জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্ যদ্দামোদরকীর্তনম্।।

এই দামোদর-নামকীর্তনই একামাত্র মঙ্গল, একমাত্র নিত্যধন এবং জীবনের একমাত্র ফল।

ভক্তিসাধনের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে হরিনাম কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ; যথা বৈষ্ণবচিন্তামণিতে—

অঘচ্ছিৎস্মরণং বিষ্ণোর্বাহ্বায়াসেন সাধ্যতে।
ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্তনং তু ততো বরম্।।

বিপন্নাশন বিষ্ণুর নামস্মরণদ্বারা পাপ দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু তাহা বহু আয়াসে সাধিত হয়, আর ওষ্ঠস্পন্দন হইলেই (কৃষ্ণোচ্চারণ হইবা মাত্র) তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তন হইয়া যায়।

বিষ্ণুরহস্যে—

যদভার্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্তনম্।।

সত্যযুগে ভক্তির সহিত হরির অর্চন ও শত শত যজ্ঞাদিদ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, কলিযুগে গোবিন্দকীর্তনদ্বারা তাহা সমস্তই লব্ধ হয়।

ভাগবতে (১২।৩।৫২)—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠান ও দ্বাপরে পরিচর্যাকারীর যাহা লাভ হয়, কলিকালে হরিকীর্তনদ্বারা তৎসমুদয় লাভ হইয়া থাকে।

পাঠকগণ এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, হরিনাম-কীর্তন সকল সৎকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা, সৎকর্মমাত্রই উপায় স্বরূপ হইয়া তদুদ্দিষ্ট ফলপ্রদানপূর্বক নিরস্ত হয়, বিশেষতঃ সৎকর্ম যেরূপেই হউক্, জড়ময়; কিন্তু হরিনাম চিন্ময়, সুতরাং উপায়স্বরূপ হইয়াও তিনি ফলকালে স্বয়ং উপেয়স্বরূপ। আবার বিচার করিয়া দেখুন ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই হরিনামকে আশ্রয় করিয়া আছে।

হরিনাম চিন্ময়—এই তত্ত্বটী নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে গেলে অক্ষরস্বরূপ নাম কিরূপে চিন্ময় হইতে পারেন, তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্র বলেন,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।

(—পদ্মপুরাণ)

—কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত, কেননা নাম-নামীতে ভেদ নাই।

নাম ও নামী পরস্পর অভেদতত্ত্ব, এতন্নিবন্ধন নামীরূপ কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময় গুণ তাঁহার নামে আছে; নাম সর্ব্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব; হরিনামে জড় সংস্পর্শ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত, যেহেতু কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হয় নাই; নাম স্বয়ং কৃষ্ণ,

অতএব চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ; নাম চিন্তামণি-স্বরূপে যিনি যাহা চান, তাহাকে দিতে সমর্থ।

নামাক্ষর কি রূপে মায়িকশব্দের অতীত হইতে পারে?

---এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জড়জগতে হরিনামের জন্ম হয় নাই। চিৎকণ-স্বরূপ জীব শুদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহার চিন্ময়শরীরে হরিনাম-উচ্চারণের অধিকারী; জগতে মায়াবদ্ধ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধনামের উচ্চারণ করিতে পারেন না, কিন্তু হ্লাদিনী-কৃপায় স্ব স্বরূপের যে সময়ে ক্রিয়া হয়, তখনই তাঁহার নমোদয় হয়। সেই নমোদয়ে মনোবৃত্তিতে শুদ্ধনাম কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের ভক্তিপূত-জিহ্বায় নৃত্য করিবার সময় বর্ণাকারে প্রকাশিত হন; ইহাই নামের রহস্য।

প্রশ্ন। মুখ্যনামসকলের মধ্যে কোন্ নাম অতিশয় মধুর?

উত্তর। শতনামস্তোত্র বলিয়াছেন---

বিষ্ণোরেকৈকং নামানি সর্ব্ববেদাধিকং মতম।
তাদৃক্‌নামসহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতম্।।

---বিষ্ণুর একটী নাম সর্ব্ববেদের অধিক তাদৃশ সহস্র নাম একটী রামনামের তুল্য।

আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলিয়াছেন---

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যং ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।।

---অপ্রাকৃত সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে ফল, কৃষ্ণনামের একবারমাত্র আবৃত্তিতে সেই ফল।

কৃষ্ণনামাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাম আর নাই। অতএব আমার প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ যে ''হরে ''কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ'' ইত্যাদি নাম শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই করিতে থাক।

প্রশ্ন। হরিনাম-সাধনের পদ্ধতি কি?

উত্তর। তুলসীমালায় বা তদভাবে করে সংখ্যা রাখিয়া নিরন্তর নিরপরাধে হরিনাম করিবে; শুদ্ধনাম হইলে নামের ফল যে প্রেম, তাহা পাওয়া যায়। সংখ্যা রাখিবার তাৎপর্য এই যে, সাধকের ক্রমশঃ নামালোচনা বৃদ্ধি হইতেছে

কিনা, জানা যায়। তুলসী হরিপ্রিয় বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদবুদ্ধি পূর্ব্বক নাম করিবে।

প্রশ্ন। সাধনাঙ্গ নববিধা বা ৬৪ প্রকার। একাঙ্গ নাম নিরন্তর করিলে অন্য-অঙ্গ-সাধনের সময় কিরূপে পাওয়া যাইবে?

উত্তর। ইহাতে কঠিন কি? চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ নববিধ ভক্তির অন্তর্গত। শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনেই হউক্ বা নির্জনে নাম-সাধনেই হউক, নববিধ ভক্তির সর্ব্বত্র আলোচনা হইতে পারে। শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কৃষ্ণনাম শুদ্ধভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি হইলে নামসাধন হইল। যেখানে শ্রীমূর্ত্তি নাই, সেখানে শ্রীমূর্ত্তি স্মরণপূর্বক শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সমস্ত নববিধ অঙ্গের সাধন হইতে পারে। যাঁহাদের সুকৃতিক্রমে নামকীর্ত্তনে বিশেষ স্পৃহা জন্মে, তাঁহারা নিরন্তর নামকীর্তন করিতে করিতে সকল ভক্ত্যাঙ্গের কার্য করিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্তনাদির মধ্যে শ্রীনামকীর্তন সর্বাপেক্ষা প্রবল সাধনা। কীর্তনানন্দ-সময়ে অন্য কোন সাধনাঙ্গের পরিচয় না আসিলেও তাহাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন। নিরন্তর নাম কিরূপে হয়?

উত্তর। নিদ্রাকালব্যতীত দেহব্যাপারাদির নির্বাহকালে এবং অন্যসময়ে সর্বদা নাম কীর্তন করার নাম নিরন্তর নামকীর্তন। নাম-সাধনে কোনপ্রকার দেশ, কাল ও অবস্থাজনিত নিষেধ নাই।

হৃদয়েশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সত্যরাজ খাঁনকে বলিয়াছিলেন যে, যিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন তিনি বৈষ্ণব; যিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করেন, তিনি বৈষ্ণবতর; যাঁহাকে দেখিলে অন্যের মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম। সুতরাং যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত কখন কখন কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপদবী লাভ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। শুদ্ধকৃষ্ণনাম ও তদিতর যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহাও বলুন্।

উত্তর। সম্পূর্ণ-শ্রদ্ধোদিত অনন্যভক্তিতে যে কৃষ্ণনামের উদয় হয়, তাহাকেই 'কৃষ্ণনাম' বলে; তদিতর যে কিছু নামের মত লক্ষিত হয়, তাহা—হয় নামাভাস, নয় নামাপরাধ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। হরিনামকে 'সাধ্য' বলিব, না 'সাধন' বলিব?

উত্তর। 'সাধনভক্তি'র সহিত যখন নাম হইতে থাকে, নামকে 'সাধন' বলিতে পার; আবার যখন 'ভাব' ও 'প্রেমভক্তি'র সহিত নাম হয়, তখন নামকেই 'সাধ্যবস্তু' জানিবে। সাধকের ভক্তির অবস্থাক্রমে নামের সঙ্কোচ ও বিকাশের প্রতীতি হয়।

প্রশ্ন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপের পরিচয়ভেদ আছে কিনা?

উত্তর। কিছুমাত্র পরিচয়-ভেদ নাই; কেবল একটী রহস্য আছে যে, 'স্বরূপ' অপেক্ষা 'নাম' অধিক কৃপা করেন---স্বরূপের প্রতি ও নামের প্রতি যে অপরাধ কৃত হয়, তাহা স্বরূপ কখনও ক্ষমা করেন না, কিন্তু স্বরূপের প্রতি অপরাধ ও নিজের প্রতি অপরাধ কৃষ্ণনাম কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন। নামাপরাধ অবগত হইয়া তাহা যত্নপূর্বক বর্জন করতঃ নাম করিতে হইবে। কেননা, নিরপরাধ না হইলে শুদ্ধনাম হয় না।

সদ্‌গুণ ও ভক্তি

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তির ছয়টী মাহাত্ম্যের মধ্যে শুভদত্ব একটী মাহাত্ম্য বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে। শুভ কত প্রকার এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে,---

শুভানি প্রীণনং সর্বজগতামনুরক্ততা ।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১/১/৮)

ভক্তি যে-পুরুষে উদিতা হন তিনি সমস্ত জগৎকে প্রীতি দান করেন এবং সর্ব জগতের অনুরাগভাজন হন। তিনি অনায়াসে সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হন এবং সমস্ত পবিত্র সুখলাভ ও অনেক অন্যপ্রকার শুভ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এই সকলকে শুভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ভক্তপুরুষ যে-সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন হন তাহা নিম্নলিখিত ভাগবত-বচনে কথিত হইয়াছে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্রসমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

(ভাঃ ৫/১৮/১২)

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয় তাঁহাতে সমস্ত গুণের সহিত দেবতাগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসৎবহির্ব্যাপারে যাঁহার মন ধাবমান এমত অভক্তজনের মহদ্‌গুণ কিরূপে হইতে পারে। স্কন্ধপুরাণে লিখিত আছে; —

এতেন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।
অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শান্তাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্।।

হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি গুণসকল হইবে ইহা অদ্ভুত নয়, যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর-পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও

বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদি---গুণসকলও হরি-সেবা-কামনা-যুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।

সদ্গুণ সকল চরিতামৃতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা; ---

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।।
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ।।
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ মৌনী।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২/৭৫-৭৭)

এই সমস্ত সদ্গুণ ভক্তির সহচর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল অগ্রে সঞ্চিত হইলে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব হয়, কি ভক্তিদেবী আবির্ভূতা হইলে এই সকল গুণগণ স্বয়ং ভক্তকে আশ্রয় করে?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ভক্তিশাস্ত্রমতে জীবের কোন প্রকার ভক্তি-বাসনারূপ-সুকৃতিবলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধা হইলে জীব সাধু পদাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বেও তাহার অনেক অনর্থ অর্থাৎ সদ্গুণ বিরোধী ধর্ম থাকে। ভজন করিতে করিতে যে সমস্ত অনর্থ অনায়াসে ভক্তি ও সাধুসঙ্গ বলে দূরীভূত হয় এবং তাহাদের স্থানে সদ্গুণসকল সহজেই উদিত হইয়া পড়ে। যে পর্যন্ত অনর্থ নাশ ও সদ্গুণ প্রকাশ না হয়, সে পর্যন্ত ভজনাভাস বা নামাভাস হইতে থাকে। অনর্থনাশ ও সদ্গুণ প্রকাশ একদিকে, ও শুদ্ধভজন বা শুদ্ধনাম অন্যদিকে---যুগপৎ হইয়া থাকে। এই অবস্থার পরে আর অনর্থ বা পাপে সাধকের রুচি হয় না। অতএব শ্রীমহাপ্রভুর বাক্য (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৭); —

এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ ক্ষয় ।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ।।

কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্তি, গাম্ভীর্য, সরলতা, মৈত্রী, ফল-দক্ষতা, অসৎ কথায় ঔদাসীন্য,

পবিত্রতা, তুচ্ছকামত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদয় হয়। অন্য গুণ উদয় করিবার প্রয়াস করা ভক্তজনের পক্ষে বিধেয় নয়। শুদ্ধভক্তির অনুশীলনই যথেষ্ট। অনর্থহানি ও সদ্‌গুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে।

যোগাভ্যাসে যে যম, নিয়ম প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে তাহা কষ্টকল্প, বহুকালব্যাপী এবং অনেক অবান্তর ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে পর্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে পর্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ সাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিতশ্রদ্ধ পুরুষের সাধু সঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয়, তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধু-কৃপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

হে সদ্‌গুণশালী ভ্রাতৃবর্গ! আপনারা বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া লব্ধ সদ্‌গুণের উত্তম ফলরূপ ভক্ত সাধুর পদাশ্রয় করিয়া জীবন ও ধর্ম সফল করুন। সদ্‌গুণ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে ভক্তি হইবে এরূপ নয়। কিন্তু ভক্তি হইলে সদ্‌গুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে পর্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদ্‌গুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তি-বিহীন সদ্‌গুণ-সম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

শরীর-সত্ত্বে কর্ম—অপরিহার্য। শরীরযাত্রা নির্বাহের অন্য যে সমস্ত কার্য করা যায়, তন্মধ্যে যে সকল কর্ম জগতের অমঙ্গলজনক সে সকলকে 'বিকর্ম' বা কুকর্ম বলে। মঙ্গলজনক কর্ম না করার নামই 'অকর্ম'; যে সকল কর্ম জগন্মঙ্গল-জনক সেই সকলকে 'কর্ম' বলে। কর্ম চারি প্রকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্মমাত্রেরই একটি একটি অবান্তর ফল আছে; যথা, আহারের ফল শরীর-পোষণ ও বিবাহের ফল সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে দৃষ্টি করিলে শান্তিই ঐ সকল ফলের 'চরমফল' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড় যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীরপালক কর্ম; যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ-যোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম, এই চারিটী 'শরীর' যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা- ইহারা 'মানস' যোগ এবং সমাধি 'আধ্যাত্মিক' যোগ। এই সমুদয়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম। বেদে ও মন্বাদি বিংশতি ধর্মশাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম-বিহিত সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মের ব্যবস্থা আছে। যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্মের আপাততঃ অবান্তর ফলসমূহ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোন প্রকার শান্তি লক্ষণ ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্রে বিভূতিপাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া, কৈবল্যপাদে কেবল শান্তিকেই 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্মই প্রথমে সুখভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে; কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি শান্তি সুখকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্যবদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি শান্তি 'ভুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাবমাত্র, স্বয়ং 'সুখবিশেষ' নহে। তখন কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎসুখের অন্বেষণ হয়। অভেদ ব্রহ্মসুখ পর্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিযা যখন ভগবৎসেবাসুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই 'কর্ম' 'ভক্তি'রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে কর্মে

ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই, সেই কর্ম ভগবদ্‌বহির্মুখ; তাহাকেই 'কর্ম' বলা যায়। ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হইলে তাদৃশ কর্মের নাম 'সাধনভক্তি' হয়, তখন কর্মনাম থাকে না।

জড়বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিন্ময় তত্ত্ব, অতএব তাহার পক্ষে জ্ঞানালোচনা স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধ জ্ঞানালোচনা। দর্শন-শ্রবণাদিময় জড়ীয় বিষয়জ্ঞানই 'জড়ীয়জ্ঞান'। ধ্যান-ধারণা-কল্পনা-বিভাবনাময় মানস জগতের জ্ঞানকেই 'লৈঙ্গিক জ্ঞান' বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত 'সমাধি অথবা সাংখ্যযোগীর অতন্নিরসন প্রক্রিয়াদ্বারা স্থগিত করিলে জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞান-রূপ 'কূটসমাধি' হয়। এই স্থলে শাঙ্করীয় অভেদ-ব্রহ্মবাদ অথবা পাতঞ্জলীয় ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ কৈবল্যবাদ উদিত হয়। নিরুপাধিক চিৎ-তত্ত্বের শুদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের 'সাক্ষাদ্দর্শন বা কূটসমাধির ব্যতিরেক-ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধচিৎতত্ত্বের সহজ প্রকাশ হয় তাহার নাম 'সহজ সমাধি' বা 'শুদ্ধজ্ঞান'। এই জ্ঞানই ভক্তিপোষক। জ্ঞানালোচনাদ্বারা বদ্ধজীব প্রথমে জড়জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐ সকল বস্তুগত ধর্ম এবং বস্তুসকলের মিলনাবস্থায় সেই সমস্ত ধর্ম উদিত হইতে ঐসকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে; কখনও বা ঐ সকল বস্তু ও ধর্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্তা ও পালয়িতৃরূপ ঈশ্বরকে নির্দেশ করতঃ তাঁহার প্রতি এক প্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে; কখনও বা এই জগৎকে 'নশ্বর' জানিয়া নিজে বৈরাগ্য সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদ ব্রহ্মবাদের কল্পনা করে; কখনও বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিকত্ব ও নির্বাণকেই 'সুখ' বলিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্‌যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা করুক না কেন, অভেদ চিন্তা ও নির্বাণচিন্তাকে 'অকিঞ্চিৎকর' জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই ভক্তি হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান-ফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্মের অবান্তর ফল 'ভুক্তি' ও জ্ঞানের অবান্তর ফল 'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্‌বহির্মুখ এবং যে স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে স্থলে জ্ঞানকে 'সাধনভক্তি' বলা যায়।

শুদ্ধা ভক্তি

শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ '(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে (পূঃ বিঃ ১/৯) বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

শ্রীচরিতামৃতে (মধ্য ১৯।১৬৭) উক্ত হইয়াছে—

অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম।
আনুকূল্যে, সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।

সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা অনুকূলভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম কৃষ্ণভক্তি। ভক্তির উন্নতি বাঞ্ছা ব্যতীত সমস্ত বাঞ্ছারহিতভাবে এবং অন্য দেবাদিতে পৃথগীশ্বর বুদ্ধিতে পূজা না করিয়া কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার সহিত জ্ঞান ও কর্ম পরিত্যাগপূর্বক যে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই শুদ্ধভক্তি। কৃষ্ণের প্রতি রোচমানা প্রবৃত্তির নাম আনুকূল্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অনুশীলন জ্ঞান ও যোগ-মার্গেই সম্ভব। অতএব তাহা ভক্তি নয়। জ্ঞান বলিতে এ স্থলে সাংখ্য জ্ঞান ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকে বুঝিতে হইবে। জীব, জড় ও ভগবান্ ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান ও সম্বন্ধজ্ঞান স্বরূপসিদ্ধির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা ভক্ত্যানুশীলনের অন্তর্গত। কর্ম শব্দে স্মার্তদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য প্রায়শ্চিত্তাদি ভগবদ্বহির্মুখ কর্ম। কৃষ্ণ-পরিচর্যাদি কর্মপ্রায় হইলেও সেবানিষ্ঠা-লক্ষ্মণ-দ্বারা 'কর্ম' বলিয়া অভিহিত হয় না, ভক্তিনামেই পরিচিত। ভক্তির পূর্বে যে বৈরাগ্য হয়, তাহাও কর্মবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জীবের যে অহৈতুকী অব্যবহিতা আত্মবৃত্তি, তাহাই ভক্তিলক্ষণে লক্ষিত হয়। ভক্তির সাধনাবস্থায় চারিটি ক্রিয়ালক্ষণ ও সাধ্যা-বস্থায় দুইটী ক্রিয়ালক্ষণ। (১) অবিদ্যা (পাপবীজ), পাপবাসনা ও পাপ তথা অবিদ্যা (পুণ্যবীজ), পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সকল ক্লেশনাশই সাধনভক্তির প্রথম লক্ষণ। (২) জগৎ-প্রীণন, জগতের অনুরক্ততা, সমস্ত সদ্‌গুণ ও শুদ্ধসুখ প্রদান করাই দ্বিতীয় লক্ষণ। (৩) মোক্ষকে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া সাধন-ভক্তির তৃতীয় লক্ষণ। (৪) ফলভুক্তিতে গাঢ় আসক্তিরহিত না হইয়া সাধন-ভক্তির অঙ্গসকল চিরকাল অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি লাভ হয় না, এই সুদুর্লভতাই সাধন

ভক্তির চতুর্থ লক্ষণ। (ক) সান্দ্রানন্দবিশেষ-স্বরূপতা ও (খ) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীত্বই সাধ্য-ভক্তির নিত্য লক্ষণদ্বয়।

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা।।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১ম লঃ ১২)

সাধ্যভক্তিতেও পূর্ব চারিটি লক্ষণ যথাযথ লক্ষিত হয়। সাধ্যভক্তির প্রথমাবস্থাই ভাবভক্তি; তাহাতে প্রথম চারিটী লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে থাকে। সাধ্যভক্তির চরমাবস্থাই প্রেম। অতএব ভক্তির সাধনাবস্থায় সাধন- ভক্তি ও সাধ্যাবস্থায় ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। কেবল মুক্তি ভক্তিতত্ত্বকে অবরোধ করিতে পারে না। মুক্তি স্বল্পরুচির অনুগত হইলেই ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্ট করিতে পারে।

শ্রদ্ধার তারতম্যে ত্রিবিধ ভক্ত—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ' শ্রদ্ধা-অনুসারী।।
'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়।।

কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত জীবের অন্য উপায় নাই, জ্ঞান-কর্মাদি চেষ্টা ভক্তিশূন্য হইলে বিফল,---এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত যে ভক্ত্যুন্মুখী-চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যাঁহাতে দৃঢ় ও অটল, তিনি ভক্তির উত্তমাধিকারী, যাঁহাতে কিঞ্চিদ্দৃঢ় তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী, দৃঢ়তা নাই অথচ বিশ্বাসপ্রায় আছে অথচ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকেও ভয় হয় এরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার, তিনি ভক্তির কনিষ্ঠাধিকারী। কনিষ্ঠ অধিকারী দুই প্রকার অর্থাৎ কর্মজ্ঞানাধিকার-মিশ্র ও কর্মজ্ঞানাধিকার-শূন্য; কর্মজ্ঞানাধিকার-শূন্য কনিষ্ঠাধিকারী সাধুসঙ্গে উত্তম হইবেন, কর্মজ্ঞানাধি-কারমিশ্র কনিষ্ঠাধিকারিগণ বিশেষ কষ্টে ও অত্যন্ত সাধু-কৃপায় উন্নত হইতে পারেন।

পঞ্চ সংস্কার

যাঁহারা ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পঞ্চসংস্কারপদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। স্মৃতিতে পঞ্চসংস্কারের ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ।।

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটি সংস্কার দ্বারা ঐকান্তিকী ভক্তি উদয় হয়। তাপসম্বন্ধে স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে—

হরিনামাক্ষরৈ র্গাত্রমঙ্কয়েৎ চন্দনাদিনা।
স লোকপাবনোভূত্বা তস্য লোকমবাপ্নুয়াৎ।

যিনি চন্দনাদিদ্বারা স্বগাত্রে হরি-নামাক্ষর অঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া ভগবল্লোক প্রাপ্ত হন। 'শ্রী'-প্রভৃতি সম্প্রদায়ে তপ্ত চক্রাদি ধারণের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু কলিযুগপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদিদ্বারা হরিনাম-অঙ্কনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কলিজীবের পক্ষে উক্ত ব্যবস্থা সুখকর হইয়াছে।

পুণ্ড্র-শব্দে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র। ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের আকৃতি বহুবিধ। কেহ কেহ হরিপাদাকৃতি দ্বারা ঊর্ধ্বপুণ্ড্রকে বিশেষ শুভাবহ করিয়া থাকেন। ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের নামান্তর হরিমন্দির। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা ধারণ করা কর্ত্তব্য।

হরিদাসত্ববোধক কোন একটী নামগ্রহণকে নাম বলা যায়। যে সময়ে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা প্রদান করেন, সেই সময়েই তিনি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটী হরিভক্তি-সম্বন্ধসূচক নাম দিয়া থাকেন। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ে 'রামানুজদাস' এই শব্দটী সকল ভক্তের নামে সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—রামকৃষ্ণদাস রামানুজদাস, নারায়ণদাস রামানুজদাস ইত্যাদি। শ্রীমদ্গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীনিত্যানন্দদাস, শ্রীচৈতন্যদাস প্রভৃতি সাংস্কারিক নাম দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট লীলার সময়ে 'রত্নবাহু', 'কবিকর্ণপুর',

'প্রেমনিধি' প্রভৃতি পারমার্থিক নাম দেখা যায়। পরবর্তী ভক্তগণও 'ভাগবতভূষণ', 'গীতাভূষণ' প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। *

স্বীয় ইষ্টদেবের শ্রীমূর্তির অনুরূপ জপ্য মন্ত্রাদিকে মন্ত্র বলি। যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি উপাস্য, সে স্থলে অষ্টাদশ বর্ণাদি মন্ত্রই প্রশস্ত।

যাগ-শব্দে হরিপূজা। অর্চনমার্গের যে সকল অঙ্গাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাই এই পঞ্চসংস্কারোক্ত যাগের অঙ্গ।

হে ভক্তবৃন্দ! কুতর্ক পরিত্যাগপূর্বক পঞ্চসংস্কার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আপনারা হরিভজন করুন্। যদি ব্রজবাসীদিগের মধ্যে কাহারও কৃষ্ণসেবা-প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া আপনাদের হরিসেবায় লোভ উদয় হয় তাহা হইলে রাগানুগা-মার্গে কৃষ্ণভজন করিবেন। কিন্তু সেরূপ লোভ হয় নাই অথচ হরিভজনে রুচি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নববিধা ভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভজন করিতে থাকুন।

---

* সে দিবস কোন ভক্ত আমাদিগকে 'বৈষ্ণব' নামক একখানি পত্রিকা দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে এইরূপ নামগ্রহণ কর্তব্য নয়, এরূপ একটী আশ্চর্য সিদ্ধান্ত দেখা গিয়াছে। কোন কোন ভক্তগণ নিজ নিজ আচার্যকৃপাদত্ত 'ভক্তিভৃঙ্গ, 'ভক্তিরত্ন', 'ভক্তিনিধি' প্রভৃতি ভক্তিসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে নামসর্বস্য 'বৈষ্ণবের' কেন যে ঈর্ষা হইয়াছে বলা যায় না। কলি যত প্রবল হইতেছে পঞ্চসংস্কারাদির প্রতি ততই অবজ্ঞা হইতেছে দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যাহাদের কপটভক্তি, তাহারাই জগৎকে নানা প্রকারে ভ্রান্ত করিতেছে। আমরা এরূপ বৈষ্ণব বিদ্বেষবাক্য দেখিয়া বড়ই ভাবিত হইয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের প্রতি কৃপা করিয়া কলিদূষিত লোকদিগকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করুন্।

সম্প্রদায়-প্রণালী

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা 'সম্প্রদায়'-শব্দ শুনিবামাত্র চটিয়া উঠে। তাহারা বলিয়া থাকে যে সম্প্রদায়বিভাগদ্বারা মতভেদ ও মতভেদদ্বারা ধর্ম বিবাদ সমাজকে নষ্ট করে। তাহারা মনে করে যে সমাজের মধ্যে তাহারাই পণ্ডিত আর সকলেই নির্বোধ। বস্তুতঃ তাহাদের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান্, চিন্তাশীল ও পণ্ডিতলোক সম্প্রদায় স্বীকারপূর্বক ধর্মালোচনা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটি মত লইয়া আপনাদিগকে অসম্প্রদায়ী মনে করে। ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাহারা একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অসম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে সম্প্রদায়গত কোন কোন সংকীর্ণ মতও মানিতে হয় এবং কখন কখন স্বাধীনতার অভাবে কুফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে সম্প্রদায়প্রণালীতে দোষ অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ আছে। যাহাতে অধিকাংশ গুণ তাহাতে কিছু কিছু দোষ থাকিলেও তাহা পণ্ডিতের পক্ষে আদরের বস্তু। জগতে কি এমত আছে যাহা নির্দোষ? তবে কি জগতে অবস্থিতি করা পণ্ডিতের পক্ষে দূষণীয়? সুখ ও পুণ্যের সহিত যে সংসার করা যায় তাহা কি নির্দোষ? জীবের বর্তমান অবস্থায় ধর্মসংসারে অবস্থানব্যতীত আর উপায় কি? পরমার্থ আলোচনা করিবার সদুপায় কি, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। সংসারে চিত্তনিবেশ করা অনায়াসে সম্ভব। ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ করা অনেকের পক্ষে কঠিন। সংসারে অবস্থিত হইয়া আমরা জীবনযাত্রা সদুপায়ে নির্বাহ করিতে করিতে একান্তমনে পরমেশ্বরকে আরাধনা করিব, এরূপ সংকল্প করিয়া যাঁহারা দণ্ডায়মান হন তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে একটী সম্প্রদায় স্থির করেন। সম্প্রদায়ও জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। সরল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সম্প্রদায় নির্মাণ করতঃ তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন। অসরল অদূরদর্শী বিতর্কপ্রিয় ব্যক্তিগণ স্বরূপতঃ সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল আত্মবঞ্চনারূপ মন্দ ফল লাভ করিতেছেন।

ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই পবিত্র ভারতক্ষেত্রে কখনই সম্প্রদায়বিরুদ্ধ মত ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে পর্যন্ত ভারতের সংশ্রব হইয়াছে সেই অবধিই কোন কোন লোক সম্প্রদায়বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য ভূমিতে ধর্ম তদ্দেশোপযোগী আকৃতিসহকারে বিচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ সেই ধর্মের প্রতি অনাদর করতঃ সেই ধর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়প্রণালীর নিন্দা করিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় সংকীর্ণবুদ্ধি কয়েকজন লোক তাঁহাদের অনুগত হইয়া সম্প্রদায়ের নিন্দাপূর্বক দলবদ্ধ হইয়াছেন; তাঁহাদের সহিত কথোপকথন, তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ ও পুস্তিকা পাঠ করিয়া অল্প বয়স হইতেই অনেকের মনে একটী এমত কুসংস্কার হয় যে তাঁহারা 'সম্প্রদায়'-শব্দটী শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠেন। নিজের কুসংস্কারের মূল কখনই অনুসন্ধান করেন না। যাঁহারা এরূপ সম্প্রদায়বিরোধী, তাঁহাদিগের নিকট আমরা কৃতাঞ্জলিপূর্বক অনুরোধ করি যে, একবার নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন।

আমরা এবিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, সম্প্রদায়-প্রণালী জীবের পক্ষে নিতান্ত হিতকর। যদি কেহ পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া প্রেমফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিশুদ্ধ ভজনসম্প্রদায়ে অবিলম্বে প্রবেশ করুন। সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে সাধুপদাশ্রয়, সদ্ধর্মশিক্ষা, ধর্মালোচনা এবং ক্রম-বৈরাগ্য অনায়াসেই লাভ হইবে। যতদিন অসম্প্রদায়-বুদ্ধি প্রবল থাকিবে ততদিন জীবনান্ত তর্ক বিতর্ক করিয়াও আত্মপ্রসাদ পাইতে পারিবেন না। সম্প্রদায়স্থ কোন কোন ব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া কদাচার করেন দেখিয়া সম্প্রদায়প্রণালীকে নিন্দা করা অসার লোকের কার্য। সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্বক সম্প্রদায়কে পবিত্র করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্তব্য। বাজারে ভাল দ্রব্য সর্বদা পাওয়া যায় না এবং অনেক প্রকার কৃত্রিমতা চলিতেছে দেখিয়া বাজার-সংস্কার করাই বিধেয়, কিন্তু ঐ সকল কারণের জন্য বাজারপ্রণালী উঠাইয়া দিবার যিনি চেষ্টা করেন, তাঁহার বুদ্ধিকে কোন প্রকারে প্রশংসা করিতে পারি না। সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্যগণ জগন্মঙ্গল বিধান করিবার জন্যই সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কাপুরুষদিগের প্রযত্নে যদি সম্প্রদায় দূরীভূত হয়, তাহা হইলে আর মঙ্গল কোথায়? কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া প্রথমাচার্যগণ সম্প্রদায়

স্থির করেন। একথা নিতান্ত অনাদরণীয়। স্বীয় গৌরববৃদ্ধি ও অর্থপ্রাপ্তির জন্য কি পূর্বতন মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে সম্প্রদায়-মূল পত্তন করিয়াছিলেন? যাঁহারা নির্জন কুটীরে ফলমূল সেবন করিয়া জীবের মঙ্গলবিধানের জন্য স্বীয় পবিত্র সিদ্ধান্তসকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বার্থ কোথায়? অনেকেই নিজ নামও গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করেন নাই। যশাকাঙ্ক্ষাও যে তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না, এরূপ প্রতীতি হয়। অতএব পাশ্চাত্য দেশীয় সংকীর্ণপ্রজ্ঞ পুরুষদিগের কথায় আমরা সম্প্রদায়প্রণালীকে অনাদর করিতে পারি না। বাগাড়ম্বর ও পাণ্ডিত্য, ইহারা পৃথক্ বস্তু। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের যত বাগাড়ম্বর,তত পাণ্ডিত্য নাই। ভারতক্ষেত্রের গ্রন্থকারদিগের বাগাড়ম্বর অল্প, কিন্তু সারবত্তা অধিক। অল্পবয়স্ক যুবকগণ সভাবতঃ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাগাড়ম্বরের পক্ষপাতী। যখন তাহারা ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন পূর্বপ্রাপ্ত কু-সংস্কার তাহাদিগকে আর ছাড়িতে চাহে না।

অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃ সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজনলিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গসকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। বহুদিন পরে উন্নতি না দেখিলে কাজে কাজেই নৈরাশ্য উপস্থিত হয়; নৈরাশ্য হইলে সাধন ভজন সকলই পরিত্যক্ত হয়। একবার গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়া দেখুন, কেনই বা ভজনোন্নতি হয় না। সৌভাগ্যবান্ অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, অসৎসঙ্গ ক্রমে ভজনের উন্নতি হয় না। মহাপ্রভু বলিয়ছেন; —

"কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।"

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণবাচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলা যায়? বিবাহিত স্ত্রীর সহিত সহবাস করাকে কি স্ত্রীসঙ্গ বলে? এরূপ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিবাহ করিবার পূর্বে এই স্মৃতি বচন পাঠ করিয়াছিলেন; —

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতা সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।।"

গৃহকে গৃহ বলা যায় না। গৃহিণীর নামই গৃহ। গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে। আবার শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র অবলম্বন পূর্বক কলিজীব উদ্ধার হইয়া থাকে। বিবাহিত পত্নীর সহিত কৃষ্ণসংসার স্থাপন করিলে জীবের ভজনোন্নতির ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সাহায্য হয়। কৃষ্ণসেবার উপকরণস্বরূপ স্ত্রীপুত্র-অঙ্গীকারকে ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। বরং তত্ত্যাগে শুষ্ক বৈরাগ্যের বিশেষ অনাদর ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায়। বিবাহিত পত্নীকে কৃষ্ণদাসী ও তদ্‌গর্ভ জাত পুত্রকে কৃষ্ণদাস বলিয়া যে আনন্দলাভ করা যায়, তাহা ভক্তের পক্ষে কিছুমাত্র দূষণীয়

নয়। যদি বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যুক্তবৈরাগ্যের ব্যবস্থাক্রমে সহবাসাদি স্ত্রীসঙ্গ হইল না, তবে স্ত্রীসঙ্গ কাহাকে বলে? তদুত্তর এই যে, সঙ্গ-শব্দে আসক্তি। সেই বিবাহিত স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পড়িলে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায়। আসক্তি জীবের একটি নিত্যধর্ম। তাহা যদি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে অন্যত্র আসক্তি থাকে না। স্ত্রীতে আসক্তি করিলে সুতরাং কৃষ্ণাসক্তি খর্ব হয়। কৃষ্ণাসক্তিই ভক্তি। স্ত্রীতে যুক্ত বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণে আসক্তি করিলে স্ত্রীঙ্গ হইল না। বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর সহিত কোন প্রকার সহবাস করাকেও স্ত্রীসঙ্গ বলে। যুক্ত বৈরাগ্য বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। অন্য স্ত্রীর সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ, হেয় ও পাপময়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিবাহপদ্ধতির দ্বারা লব্ধ পত্নীর সহিত অনাসক্তরূপে সহবাসকে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায় না। সেরূপ গৃহস্থ পুরুষের সঙ্গও অসৎসঙ্গ নয়। অবৈধ পত্নী বা উপপত্নী গ্রহণই স্ত্রীসঙ্গ। যে পুরুষেরা তাহা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গও অসৎসঙ্গ। অতএব অনাসক্ত গৃহস্থ ভক্তের সঙ্গ ও স্ত্রীসহবাসরহিত অগৃহ বৈরাগী ভক্তের সঙ্গ সর্বদা ভজনানুকূল। অতএব স্ত্রী-সঙ্গী ও ভক্তিহীন গৃহস্থ বা বৈরাগীর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সৎসঙ্গে শ্রীহরিনাম সাধন করিলে সাধকের দিন দিন ভজনোন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্তব্য। প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায়, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।

সাধন

জীব স্বীয় ভোগবাঞ্ছাবশতঃ ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া সুখাশায় এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োন্মুখ না হইয়া পড়ে, ততদিন কোন ক্রমেই ভগবদুন্মুখতার উদয় হয় না। বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎকৃপা-ক্রমেই জীবের সংসার-বাসনা দুর্বলা হইয়া পড়ে; তখন স্বভাবতই সাধুসঙ্গের স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয়, এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধ চরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণাশ্রয় করতঃ ভজনশিক্ষা করিতে হয়। ভজনবলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়। নিতান্ত মায়ামুগ্ধ অবস্থা হইতে ভগবৎকৃপালাভের যোগ্য হইবার জন্য জীবের সাধন-কার্যটি অপরিহার্য-জ্ঞানে স্বীকার করিতে হয়। ‘‘সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়’’---ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-উক্তি। অল্প পরিমাণে শ্রদ্ধালাভ করিয়াও যাঁহারা সাধন-কার্যে অলসতা প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণকৃপা পাইবার আশায় বসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জন্মটি বৃথা অতিবাহিত হয়; কোন ফলই হয় না।

কৃষ্ণ---কৃপাময়। জীবের প্রতি অপার কৃপা বিস্তার করিয়া তিনি শাস্ত্রপ্রকাশ করিয়াছেন, আবার প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম প্রচারপূর্বক সকল জীবকে শাস্ত্রার্থ বুঝাইয়া ঈশ্বরোন্মুখ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষতঃ এই কলিযুগে তাঁহার কৃপার সীমা নাই। ইহাতেও যাঁহারা ঈশ্বরসাধনে উন্মুখ না হ’ন, তাঁহাদিগের মঙ্গল-লাভের আশা বৃথা। নিতান্ত স্বতন্ত্র কৃষ্ণচন্দ্র ইচ্ছা করিলেও জীবকে দর্শন দিতে পারেন, কিন্তু যাহার হৃদয়ে এরূপ আগ্রহ নাই যে, অল্প একটু সাধন করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করে, তাহার ঈশ্বর লাভের তৃষ্ণা---তৃষ্ণা নহে; তাহা তৃষ্ণাভাস মাত্র। তাহার ঈশ্বর-দর্শন ঘটিলেও সে তাঁহাকে লইয়া সুখী হইতে পারিবে না, অতি তুচ্ছ সংসার-সুখের আশায় বৈকুন্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিবে। সাধন-ব্যাপারটি আর কিছু নহে, কেবল ভগবদ্বিষয়ে তৃষ্ণাবৃদ্ধির কৌশল মাত্র। যত্ন ও আগ্রহের সহিত সাধন করিতে করিতে যাঁহার যতদূর তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয় তিনি সেইরূপ কৃষ্ণকৃপা লাভ করেন; তৃষ্ণা পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেই কৃষ্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়েন, কিছুতেই থাকিতে পারেন না। সাধন-কার্যটি বদ্ধ জীবের

অস্বীকার করিলে চলিবে না, যত্নসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদর পূর্বক যে পরিমাণে সাধন করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্তী হইবে।

সাধন কি? শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,---

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।।"

জীব স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস; ভগবৎপ্রেম জীবের নিত্যসিদ্ধ ধর্ম। জীবের বদ্ধাবস্থায় সেই নিত্যসিদ্ধভাব বিষয়-প্রেমাকারে লক্ষিত হয়। যে উপায়ে সেই প্রেম বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ে প্রকট করা যায়, তাহাই সাধন। নানারূপ সাধনাঙ্গ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে সমস্ত সাধনাঙ্গগুলি চতুঃষষ্ঠি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই আবার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ প্রভৃতি নবধা বিভক্ত হইয়াছে। সকল সাধনের সার হরিনাম; বিশেষতঃ কলিযুগে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম সাধনশ্রেষ্ঠ কি জানিতে চাহিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনাম-কীর্তনই শ্রেষ্ঠসাধন বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মঃ ৬।২৪১)----

"ভক্তিসাধনশ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নামসংকীর্তন।।"

শ্রীসনাতনের প্রতি (অন্ত্যলীলা-চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৭০-৭১ পয়ারে) শ্রীমহাপ্রভু-বাক্য---

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।।
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।"

এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গ গুলি হরিনামেরই সহায়স্বরূপে গৃহীত হয়। যদিও "এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ" প্রভৃতি বাক্য শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, হরিনাম ছাড়িয়া যে কোন অঙ্গ আশ্রয় করিলে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়। হরিনামকে সাধনশ্রেষ্ঠ জানিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করতঃ

নামের সাধকরূপে অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে, যেহেতু শাস্ত্রেও স্পষ্ট আজ্ঞা এই—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র, তাঁহারা অকপটে একান্তভাবে হরিনামশ্রয় করেন। হরিনাম সাধন করিতে করিতে সিদ্ধিকালে তাঁহারা নামকেই সাধ্যস্বরূপে প্রাপ্ত হ'ন, যেহেতু নামই সাধ্য, নামই সাধন; নাম ও নামী অভেদ। শ্রীনাম-সাধন-ব্যাপারটি একটু আলোচনা করা আবশ্যক। সাধন ইন্দ্রিয়দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং সাধকের ইন্দ্রিয়গুলি দৃঢ় ও কর্মপটু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যুক্ত-আহার, যুক্তবিহারদ্বারা দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ রাখিলে সাধন-কার্য সুন্দর-রূপে করা যায়। পক্ষান্তরে শুষ্ক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া দেহের প্রতি অত্যাচার করিলে সর্ব ইন্দ্রিয় অপটু হইয়া পড়ে এবং সাধনের পরিবর্তে অবশেষে সাধকের জীবনটি হারাইতে হয়। এ বিষয় ভগবান্ গীতায় (৬।১৬-১৭) বলিয়াছেন,—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
না চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।"

অর্থ এই যে, অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির দেহ ও ইন্দ্রিয় কোন ক্রমেই সাধন-কার্যে সক্ষম হয় না। দেহের অসুস্থতা এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা না জন্মে, এরূপভাবে যুক্ত আহার-বিহার, সর্বকর্মে যুক্তচেষ্টা এবং যুক্তনিদ্রা ও জাগরণ স্বীকার করিলে সাধন-কার্যটি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়া সর্বদুঃখ নাশ করে। তাৎপর্য এই যে, অন্তরেন্দ্রিয়-রূপ মনকে স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্বল্য ও অপরাধরূপ অনর্থচতুষ্টয় হইতে রক্ষা করতঃ শ্রীনামের স্মরণমননে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং বাহ্যেন্দ্রিয়-গুলিকে অতিভোজন, অতিনিদ্রা, বিষয়-প্রয়াস প্রভৃতি ভজনপ্রতিকূল অভ্যাস হইতে রক্ষা করিয়া নামকীর্তনরূপ সাধনে অবিরত রত করিতে হইবে। ইহাই সাধকের কৌশল। ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্নের আবশ্যক। সংসারী-জীবের অনেক সময়ে অনেক ভজন-

প্রতিকূল ব্যাপার ঘটে; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তাপূর্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্টলাভে বিলম্ব ঘটায়। 'আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব' এইরূপ হৃদয়দৌর্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টি ভজনবাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

সাধুসঙ্গ সাধনের সর্বপ্রধান সহায়। বদ্ধজীবের হৃদয়টি অনর্থের এত বশীভূত যে বহু চেষ্টা করিয়াও অনর্থ-বিড়ম্বনা ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু সাধুসঙ্গ থাকিলে অনর্থগুলি কোন বলই প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,---

"কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।"

সাধুসঙ্গ সাধনকার্যে নিতান্ত আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২শ পরিচ্ছেদ, ৮০ ও ৫১ পয়ার)---

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।।"
"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।।"

নামপরায়ণ-শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে নাম করিতে পারিলে সর্বাপরাধ দূরীভূত হইয়া অতি শীঘ্রই নামতত্ত্ব হৃদয়ে উদয় হ'ন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা এই, যেন আমরা শুদ্ধভক্তসঙ্গে নিরন্তর নাম করিতে করিতে অতি শীঘ্রই নামরস লাভ করিতে পারি। শ্রীনামের কৃপা ব্যতীত আমরা আর কিছু প্রার্থনা করি না।

মহাপ্রভুর নীচকুলোদ্ভবদ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের তাৎপর্য্য

সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ-শূদ্রদ্বারা * করেন ধর্ম্মের প্রকাশ।।
'ভক্তি' 'প্রেম' 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রদ্যুন্নমিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা'।।

---শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অ ৫।৮৪।৮৫

(মায়াবাদী) সন্ন্যাসীগণ মনে করেন যে, তাঁহারা সংসারে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বেদান্ত তত্ত্ব অনুশীলন করতঃ জগতের গুরু হইয়াছেন; (শৌক্র) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, (কর্ম্মকাণ্ডীয়) স্মৃতি-অনুসারে তাঁহাদের ন্যায় শৌক্র ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু; অতএব তাদৃশ শৌক্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যতীত পরমার্থ-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার আর কাহারও অধিকার নাই। এই দুই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ আপনা হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ উচ্চতম শূদ্রকুলোদ্ভব শুদ্ধভক্তের ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অনেক সময়ে অনুন্নত-মতি হইয়া পড়েন।

বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্ব-জীবের উপদেষ্টা,—অপেক্ষা নাই। জগত্তারণ মহাপ্রভু এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই স্বীয় পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতি-সন্তান প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে (শূদ্রকুলে আবির্ভূত গৃহস্থলীলা) শ্রীরামানন্দের নিকট তত্ত্ব-শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

---

* নীচ-শূদ্রদ্বারা---ইহা পাঠ করিয়া কেহ যেন মূঢ়তাবশতঃ মনে না করেন যে, বৈষ্ণবকে নীচ শূদ্র বুদ্ধি করা হইয়াছে। সেইরূপ দুষ্টবুদ্ধিজাত পণ্ডিতম্মন্যতায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর চরণে ভীষণ অপরাধ হইবে মাত্র। ইহার অর্থ---নীচ শূদ্রকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণব আচার্য্যদ্বারা।

আচার ও প্রচার

ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিয়া পণ্ডিতবর শ্রীসনাতন গোস্বামী এই প্রকার কহিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অ ৪।১০২-১০৩)---

"আপনি আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার।।
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য।।"

সাধু পাঠক, শ্রীসনাতন গোস্বামীর উক্তিটি ভাল করিয়া বিচার করুন। রুচি অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার অর্থাৎ আচার-প্রধান ভক্ত, প্রচার-প্রধান ভক্ত ও আচার প্রচার সম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার-সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল আচার প্রধান ভক্ত মধ্যম। কেবল-প্রচার-প্রধান ভক্ত কনিষ্ঠ। সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম আচার। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য জীবের নিকট প্রচার করার নাম প্রচার। আচার বা প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক। শিক্ষা করতঃ কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে---

"উপদেশং করোতোব ন পরীক্ষাং করোতি যঃ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ।।"

স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। ইতিহাসে এবং নরগণের দৈনন্দিন চরিত্রে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখা যাইতেছে। গৃহস্থ ভক্তগণ যেস্থলে আচার্য্য হইয়া সন্ন্যাসলিঙ্গ ও মন্ত্রাদি প্রদান করেন সে-স্থলে সন্ন্যাসগ্রহীতার বিশেষ অমঙ্গল হয়, তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। যাহারা ভিক্ষাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আচার শিক্ষা করিয়াছেন, তাহারাই ভিক্ষাশ্রমের প্রকৃত গুরু। গৃহস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা নববিধ ভক্তি আচরণে পটু, তাঁহারাই ভক্তিকাণ্ডের আচার্য্যতা গ্রহণ করিবার যোগ্য। কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধ ভক্তির আচরণ করেন না, বরং কর্ম্মকাণ্ডাদৃত স্মার্ত্তসম্মত আচার

করিয়াই থাকেন; তাঁহারা যে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেন তাহা সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক। রুচিক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ভজনাঙ্গে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীহরিদাস-বাক্য—

"জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি।।
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ।।
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন।।"

অতএব আচার-প্রচারসম্পন্ন বৈষ্ণবদিগের চরণে আমাদের কোটী কোটী দণ্ডবৎ।

শ্রীকলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব কলিপীড়িত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিযুগের ধর্ম্ম যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন তাহা সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-সহকারে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে তাঁহার অবতার এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশ নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবসকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটি বলিয়াছেন,—

"পৃথিবী পর্য্যন্ত, যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।।"

এই অবিতর্ক্য আজ্ঞা যে সত্বরেই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এই নামসঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম-চেষ্টা যেরূপ জগতে প্রবলরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সমস্ত ধর্ম্মের নির্য্যাসরূপ কোন অদ্বিতীয় ধর্ম্ম অতি শীঘ্র জগতে প্রচারিত হইবে। সে ধর্ম্ম কি? যে সকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে ও জম্বুখণ্ডে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

সে সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না তাহার আর কথা কি? সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলে কতকগুলি অযুক্ত বিশ্বাস বিশেষরূপে আদৃত হওয়ায় সেই সকল ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অযুক্ত বিশ্বাসসকল দূরীভূত হইলে সকল ধর্ম্মই একাকার হইবে। সেই একাকার অবস্থায় ধর্ম্মে কি কি বিষয় নিত্যরূপে থাকিবে তাহা বিবেচনা করা যাউক। পরমেশ্বর একবস্তু ও সর্ব্বদা চিন্ময়স্বরূপপ্রাপ্ত। তিনি সর্ব্বদোষহীন ও সর্ব্বগুণের আকর। জীবসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু। জড়জগতে জীবের ঈশানুশীলনই নিত্যধর্ম্ম। পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্ম-সকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকলবর্ণ, সকলজাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যাভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণ-রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।

এবম্ভূত অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন রূপ পরম ধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে প্রচারিত হইবে। তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খৃষ্টীয়ানগণ খোল-করতাল লইয়া নাম-রস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণব-কৃপায় সকল চিৎসম্বন্ধি হইয়া থাকে—এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যাদের দেখিলে নয়ন ঝুরে, তারা দুইভাই এসেছে" রে এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তি ফৌজীর খৃষ্টায়ানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। কেন না, কোন ঘটনাই একবারে বিশ্বস্ত হয় না। প্রথমে সমলরূপে

প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে। আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নামোল্লেখপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে? আহা যেদিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক্ হইতে "জয় শ্রীশচীনন্দনকী জয়" এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সেদিন কবে হইবে? যেদিন তাঁহারা বলিবেন—"হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্রে চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও", সেদিন ক'বে হইবে? যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে?

বৈষ্ণবসেবা

কুলীনগ্রামী ভক্তদিগের প্রশ্নে গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য বিচারে মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন—

প্রভু কহেন,--'কৃষ্ণ সেবা', 'বৈষ্ণবসেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন'।।

(চৈঃ চঃ ম ১৫।১০৪)

এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, বৈষ্ণবসেবা গৃহস্থের পক্ষে প্রধান ধর্ম্ম। অতএব বৈষ্ণব-সেবা কিরূপে হয়, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণব-সেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি কোন একটী প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়া দ্বারা অনেক অন্নব্যঞ্জন, পিঠাপানা প্রস্তুত করাইয়া বৈষ্ণব বলিয়া কতকগুলিকে আমন্ত্রণ করতঃ ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে আমরা বৈষ্ণবসেবা বলিতে পারি না। নিমন্ত্রণ করিয়া একদল বৈষ্ণব আনা কেবল আত্মমর্য্যাদা মাত্র। যে বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে, তিনি কি প্রকার বৈষ্ণব, তাহা কুলীনগ্রামী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন। যথা; —

প্রভু কহে,—যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য—শ্রেষ্ঠ সবাকার।।

(চৈঃ চঃ ম ১৬।৭২)

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।।
ক্রম করি' কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' আর 'বৈষ্ণবতম'।।

(ঐ ১৬।৭৪-৭৫)

একটি কৃষ্ণনাম লইলে বৈষ্ণব-পদবী প্রাপ্ত হয়। সেই নাম কিরূপ তাহাও চরিতামৃতে লিখিয়াছেন; —

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপদোষ যাবে।
আর 'নাম' হইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৯২)

এই স্থলে বুঝিতে হইবে, যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না। কেবল নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় হয়। পাপ ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ অবসর পায় না। নামাপরাধ অবসর না পাইলে নিরপরাধ নাম হয়। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলেও তিনি বৈষ্ণব। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে বৈষ্ণবতর হয়। আহ্লাদিনী-শক্তির উদয় হইলে বৈষ্ণবতম হয়।

এইরূপ বৈষ্ণব লইয়া গৃহস্থগণ বৈষ্ণবসেবা করিবেন। এরূপ বৈষ্ণব গৃহস্থ বা বৈরাগী হইতে পারেন। বৈষ্ণবসেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যে বৈষ্ণবের তারতম্য। বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলে ও নিমন্ত্রণ পাইলে বৈষ্ণবগুলি অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদিদ্বারা সজ্জীভূত হইলেন। 'অদ্য ভরপেট লুচি, মালপোয়া পাইব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু দক্ষিণা মিলিবে'— এই ধনাশায় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে 'ধনশিষ্যাদিভদ্বারৈর্যাভক্তিরুপপদ্যতে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারায় এই সকল কার্য্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। জীব মাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সেবা করিলে জীব সেবা হইতে পারে, তাহাকে মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট নামপরায়ণ বৈষ্ণব সেবা বলা যায় না।

আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণবনামধারী বৈষ্ণবদিগের আখড়া বলিয়া একটা ব্যাপার দেখা যায়। আখড়ায় একটী দেবসেবা থাকে। অভ্যাগত বৈষ্ণবদিগকে দেবতাপ্রসাদ দিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন, এ ব্যাপারটী মন্দ নহে; সে আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগকে গৃহস্থগণ নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন ও ভোজন-দক্ষিণা দেওয়ার যে প্রথা উঠিতেছে, তাহা অবৈষ্ণব ব্যবহার। বৈষ্ণব অতিশয় উপাদেয়। বৈষ্ণব জগতের বন্ধু। বৈষ্ণব গৃহে আসিলে তাঁহার সেবা করা গৃহস্থদিগের কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ভোজন, শয়ন ও গমনাগমনের উপকার করাই বৈষ্ণবের সেবা।

অভ্যাগত বৈষ্ণব আসিলে তাঁহার প্রতি যত্ন করা নিতান্ত উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণাপ্রথা ব্রাহ্মণভোজনের দক্ষিণা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। হে ভক্তবৃন্দ, শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকার তর্পণ করুন। কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণবসেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অধীন করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী বৈষ্ণবকে ভোজন করান প্রভুর মত নহে, যথা; —

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৯৭)

অনিমন্ত্রিত বৈরাগী বৈষ্ণবের নাম অভ্যাগত। ঘটনাক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব দুই একটী গৃহে আসিলে তাঁহাদের সেবা করা উচিত। ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণব-সেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে উপযুক্ত সম্মান হয় না। তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবামাত্রই অভ্যাগত-ধর্ম্ম থাকে না। তাহাতে সন্ন্যাসী-ভিক্ষা হয় বটে, বৈষ্ণবসেবা হয় না। যত্ন করিয়া কোন বৈষ্ণবকে গৃহে আনিয়া সেবা করিলে কোন অপরাধ হয় না। কিন্তু আড়ম্বরপূর্ব্বক অনেক বৈরাগী বৈষ্ণবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলে অপরাধের অবসর হয়। গৃহস্থবৈষ্ণবগণ এবিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া দেখিবেন। বৈষ্ণবসেবাকে নিত্যধর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করতঃ ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটা কলিকাল। যদি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হ'ন, কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই।

বৈষ্ণব-নিন্দা

চতুর্ব্বিধ জীব

বৈষ্ণবনিন্দা হইতে যখন এরূপ (বিশেষভাবে) সতর্ক করা হইতেছে, তখন প্রথমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা এবং যে যে কার্য্যের দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ হয়, তাহা স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজন। জীবসকলকে চারি প্রকারে বিভাগ করা প্রয়োজন—

১। জীব সাধারণ, ২। ধার্ম্মিক জীব, ৩। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীব এবং ৪। বৈষ্ণব জীব।

পাপ ও অপরাধ

এই প্রকারে জীবের চারিটী বিভাগ। জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান---এই বুদ্ধিতে সকল জীবকেই আদর করা উচিত। তন্মধ্যে ধার্ম্মিক জীবগণকে একটু বিশেষ আদর করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় জীবগণকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব জীবের চরণ ভজন করাই বিধেয়। (সাধারণ) জীবের আদর, ধার্ম্মিক জীবের বিশেষ আদর ও ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবপ্রায় জীবের সম্মান না করিলে পাপ হয়। 'বৈষ্ণব'-জীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় হয়; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ---স্থূল ও লিঙ্গ-শরীর-নিষ্ঠ; অপরাধ---জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা (থাকা আবশ্যক)।

ত্রিবিধ বৈষ্ণব

শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত তিনটী শ্লোকদ্বারা বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম এই বিভাগক্রমে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব, যথা; —

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।

(ভাগবত ১১।২।৪৭)

যিনি লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত-শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীমূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তের পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশমাত্র করিয়াছেন। পরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রভেদ এই যে---পরম্পরা--প্রাপ্ত কেবল লৌকিক শিক্ষা হইতে উদিত হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাতে শাস্ত্রবাক্যে গাঢ় বিশ্বাস ও তদ্বাক্য প্রমাণদ্বারা বৈষ্ণবজনপ্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়; শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হইলেই জীব মধ্যমাধিকারস্থ বৈষ্ণব হ'ন। যে পর্য্যন্ত তাহার উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধকের কর্ম্মাধিকার ক্ষয় হয় না। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলেন; —

"শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহে, কিন্তু বৈষ্ণবের প্রায়।"

প্রকৃত সাধুসঙ্গ হইলেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব প্রায় জীব শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে পারেন।

মধ্যম--বৈষ্ণব, যথা; —

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।

(ভাগবত ১১।২।৪৬)

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বানভিজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রায় জীবে কৃপা এবং ভগবদ্ বিদ্বেষী ও বৈষ্ণববিদ্বেষী জনের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ অবস্থানক্রমে ঔদাসীন্য, সহিষ্ণুতা বা পরিত্যাগ করেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। বিদ্বেষিগণও বালিশ এরূপ বুদ্ধিতে তাহাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার, যেহেতু কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরা তাহা করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবপ্রায় বলা যায়, বৈষ্ণব বলা যায় না।

উত্তম বৈষ্ণব, যথা----

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগতোত্তমঃ।।

(ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাভীষ্ট ভগবদাবির্ভাব দৃষ্টি করেন এবং সেই সমস্ত ভূতকে স্বীয় চিত্তে স্ফুর্ত্তি-প্রাপ্ত ভগবত্ত্বে অনুভব করেন অর্থাৎ তদাশ্রিত বোধে অর্থাৎ

পদাশ্রিত বোধে জগৎকে বৈষ্ণব বলিয়া দেখেন, তিনি উত্তম বৈষ্ণব। এরূপ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-রূপ ভেদ-দৃষ্টি নাই।

এতদ্দ্বারা ইহাই স্থির যে, কনিষ্ঠ শ্রেণীতে যাঁহারা শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা লাভ করতঃ বৈষ্ণবসেবা করিবার যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারাই মধ্যম বৈষ্ণবের অন্যান্য লক্ষণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈষ্ণব, মধ্যম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতর, উত্তম বৈষ্ণবই বৈষ্ণবতম। এই তিন প্রকার বৈষ্ণবকে মহাপ্রভু যেরূপে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা এস্থলে বিচার্য্য।

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব তাঁ'র করহ সম্মান।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৫।১১১)

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব, ভজ তাঁহার চরণে।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২)

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪)

ক্রম করি' কহে প্রভু বৈষ্ণবলক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে কৃষ্ণনামোচ্চারণমাত্রেই বৈষ্ণবত্ব। কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস বলিয়া দর্শিত হইয়াছেন, তাঁহারা নামাভাসমাত্র উচ্চারণ করেন, নাম উচ্চারণ করেন না। যিনি একবার শুদ্ধনাম উচ্চারণ করিতে পারেন,তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব। যিনি সেই শুদ্ধনাম নিরন্তর উচ্চারণ করেন তিনি বৈষ্ণবতর। যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তিনি বৈষ্ণবতম। এস্থলে আরও দ্রষ্টব্য এই যে,শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইবার জন্য দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই। বৈষ্ণবপ্রায় হইবার জন্য অর্চ্চাতে হরিপূজোযোগী মন্ত্র-গ্রহণকে দীক্ষা বলে। সে দীক্ষা নামতত্ত্বে অনাবশ্যক। যথা প্রভুবাক্য; —

প্রভু কহে,--''যাঁর মুখে শুনি' একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই, শ্রেষ্ঠ সবাকার।।
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব-পাপক্ষয়।
নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়।।
দীক্ষা-পূরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে।।
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া,করায় কৃষ্ণে-প্রেমোদয়।।
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেইত বৈষ্ণব, তাঁহার করিহ সম্মান।।''

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৬-১০৯, ১১১)

নামাভাস ও শুদ্ধনাম

নাম ও নামাভাসের পার্থক্য বিচার করিবার এখানে অবকাশ নাই। সময়ান্তরে বিশেষরূপে সে বিষয়ে বিচার করিব। এই পর্য্যন্ত এ স্থলে বলিতে পারি যে, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অর্থাৎ শুদ্ধ শরণাগতির সহিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইলে নাম হয়। অন্যাভিলাষিতাযুক্ত বা জ্ঞান কর্ম্মযোগ-বৈরাগ্যাদিদ্বারা আবৃত যে নাম, তাহা নামাভাস। নামাভাসে মুক্তি পর্য্যন্ত ফলোদয় হইলেও বৈষ্ণবের মুখে নামাভাস উচ্চারিত হয় না; শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয়। নামের স্বরূপজ্ঞান নাম-নামীর অভিন্নত্ব বুদ্ধি। জীবের শুদ্ধ চিদিন্দ্রিয়ে নামের উৎপত্তিস্থান অনুভবের দ্বারা যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাই নাম। তদ্রূপ এক নাম যাঁহার জিহ্বায় উদিত হয়, তিনি বৈষ্ণব। নাম উদয় হইতে সমস্ত প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। উদয় হইবামাত্র প্রেম উদিত হইয়া পড়ে।

বৈষ্ণব স্বভাবতঃ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত। চরিতামৃতে---

সর্ব্বমহা গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে।।

(মঃ ২২।৭২)

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন।।

(মঃ ২২।১৩৭)

অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত।

(মঃ ২২। ১৩৮)

অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ।

(মঃ ২২।১৪০)

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।

(মঃ ২২।৮৪)

বৈষ্ণবের দোষ-দর্শন ঘোর অপরাধ

যে দিন হইতে এক কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উদয় হয়, সেই দিন হইতে আর জীবের পাপে রুচি থাকে না। পাপে রুচি হওয়া দূরে থাকুক, পুণ্যতেও রুচি থাকে না। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম---সকলেই নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও নিষ্পাপ। যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধ- বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই, অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবেন। বৈষ্ণবের তিন প্রকার কথা লইয়া দুষ্টলোকে বিদ্বেষপূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে সকল দোষ ছিল, তাহা এক প্রকার দুষ্টলোকের আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষসমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে কিছুকাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্টলোকে আলোচনা করিয়া থাকে। দুষ্টলোকের তৃতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখন দৈবাৎ কোনও নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনও স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্টলোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়। অতএব নামতত্ত্বরত্নমালায় এরূপ কারিকা দৃষ্ট হয়; —

প্রাগ্‌ভক্তেরুদয়াদ্দোষঃ ক্ষয়াবশিষ্ট এব চ।
দৈবোৎপন্নশ্চ ভক্তানাং নৈবালোচ্যঃ কদাচন।।
সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু মৃষাপবাদমেব চ।
দোষানালোচয়ত্যেব স সাধুনিন্দাকোঽধমঃ।।

হে পাঠকবর্গ! বৈষ্ণবের ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্বদোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় (৯।৩০-৩১) কহিয়াছন; —

অপি চেৎ সুদূরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ।।
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।

নিসর্গপ্রায় যে সকল সুদূরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে তাহা দিন দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ আপতিত যে দোষ, তাহা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবে না। তৎসম্বন্ধে করভাজন বলিয়াছেন; —

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্‌ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।।

(ভাঃ ১১।৫।৪২)

দৈবোৎপন্ন দোষের সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূলকথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হইতে নাম স্ফূর্ত্তি হয় না। নামস্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

এস্থলে এরূপ বিতর্ক হইতে পারে, উক্ত চারি প্রকার দোষ ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্যান্য দোষের আলোচনা করা কর্ত্তব্য কি না। উত্তর এই যে, বৈষ্ণবের উক্ত চারি প্রকার দোষ ব্যতীত অন্য দোষ হইতে পারে না। যাঁহাদের উক্ত তিন প্রকার

দোষ ব্যতীত অন্য দোষ আছে, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হন নাই। এ স্থলে বিবেচ্য এই যে, জীবমাত্রের দোষসকল সদুদ্দেশ্য-ব্যতীত কাহারও আলোচনা করা উচিৎ নয়। বৈষ্ণব-নিন্দা অপরাধ। অন্য জীব-নিন্দা পাপ। যিনি বৈষ্ণব তাঁহার সেরূপ পাপেও রুচি হয় না। সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পর-দোষ আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য তিন প্রকার। যে ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে তাহার যদি কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ। জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভ কার্য্যের মধ্যে গণিত। নিজের মঙ্গল সাধনের জন্য যদি সেই আলোচনা হয়, তাহাতেও গুণ বই দোষ নাই। এই সকল সদুদ্দেশেই বাল্মীকির পূর্ব্ব চরিত্র, জগাই মাধাইএর পূর্ব্ব চরিত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সর্ব্বদা নিষ্পাপরূপে আলোচিত হইয়া থাকে। শিষ্য গুরুকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরু শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধু-বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু- বৈষ্ণব পদাশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্ম্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধু-নিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না। যদি সে বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা উত্থাপন হয়, তাহাও সদোষ হইতে পারে না। এই সকলই সদুদ্দেশ্যের উদাহরণ।

হে পাঠকবর্গ! আপনারা বিশেষ যত্নপর্ব্বক এই গম্ভীর বিষয়ে চিন্তা করিবেন। সিদ্ধান্ত করিয়া সাধুবৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গত্যাগ অবশ্য করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে নাম-তত্ত্বের উদয় হইবে না। অতএব ভাগবতে (১১।২৬।২৬) উপদিষ্ট হইতেছে,—

> ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।।
>
> সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।

এই সকল কারণে দুঃসঙ্গ পরি্যিতাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ লোক সাধুসঙ্গ করিয়া থাকেন। কেননা সাধু-উপদেশ দ্বারা সাধুগণ মনের ব্যাসঙ্গ অর্থাৎ অসাধু-বিষয়ে আসক্তি ও তজ্জনিত দুঃখ ছেদন করিয়া থাকেন। এমত মনে করিবেন না যে, আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধু-সেবা-ফল পাইব। পূর্ব্বোক্ত মধ্যমাধিকারীদিগেরই সাধু-সেবার প্রয়োজন, কেননা কনিষ্ঠ সাধু-সেবা করেন না ও উত্তমাধিকারীর সাধু অসাধুতে ভেদ বুদ্ধি নাই। আপনারা মধ্যমাধিকারী,

অতএব সাধু অন্বেষণ করিয়া তাহাতে মৈত্রী ও অসাধুকে কৃপা বা উপেক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। আপনারা স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করিলে দোষী হইবেন। দোষগুণ সম্বন্ধে ভাগবতের (১১।২১।২) আজ্ঞা এই,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ।।

আপনারা না জানিয়াও অসাধু সঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন, যথা ভাগবতে (৩।২৩।৫৫)—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।

অধিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিদোষে না জানিতে পারিয়াও যে অসৎসঙ্গ হয়, তাহা সংসৃতির অর্থাৎ পতনের হেতু হয়। সেইরূপ সাধুতে সঙ্গ হইলে নিঃসঙ্গত্ব সহজে হয়।

ভক্তমাল, প্রপন্নামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থে উত্তম ভক্তদিগের সর্ব্বত্র সাধু-দর্শনের যে মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মধ্যম বৈষ্ণবদিগের আচরণীয় নয়। তাহা আচরণ করিতে গেলে অনধিকারচর্চ্চাদোষে শীঘ্র পতন হইয়া পড়ে।

সাধুজনসঙ্গ

মানব-জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

এই সুবিস্তীর্ণ জগতীতলে আমরা অসংখ্য মানব-নিচয় দেখিতে পাই। স্থূলভাবে সে-সমস্ত মানব মণ্ডলীকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর মানবগণ ঈশ্বরবিমুখ। তাহারা মায়ামুগ্ধ হইয়া 'আমি'---'আমার' ইত্যাকার অভিমানের বশবর্তী হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বার্থপর হইয়া বিধি-বিহীন বা যথেচ্ছাচারী, কেহ নৈতিক, কেহ কর্মী, এবং কেহ বা জ্ঞানাভিমানী। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবগণ ঈশ্বর-উন্মুখ। তাঁহারা এই জগতে বর্তমান থাকিয়াও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বনহেতু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্মযোগী---নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম আচরণ করেন, কেহ জ্ঞানী---বৈরাগ্য সহকারে ঈশধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া করেন, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী---আসন-প্রাণায়াম সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগসাধন করেন, আর কেহ বা ভক্ত---সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানব মধ্যে ভক্তই শ্রেষ্ঠ

ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে কাঁহার যোগ্যতা অধিক তাহা বিচার করিতে হইলে সর্বোপনিষৎ-সার শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ আলোচনা করা একান্ত কর্তব্য। শাস্ত্রপর সরল-বিশ্বাসী সহজেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যে সন্দিগ্ধ তর্কপর-ব্যক্তিগণ বহুতর তর্কসৃষ্টি করিয়াও এই বিষয় মীমাংসা করিতে পারেন না। তর্ক-মন সব সময়েই তাহার হৃদয়-ক্ষেত্র দূষিত রাখে। কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির যোগ্যতা বিচারস্থলে ভগবান্ কহিয়াছেন, যথা গীতা ৬ষ্ঠ (৪৬-৪৭) অধ্যায়ে,---

> তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
> কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্-যোগী ভবার্জুন।।
> যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো যতঃ।।

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান-যোগাবলম্বী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। কর্মযোগী অপেক্ষাও যোগী অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ-পরায়ণ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। কিন্তু যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া আমরা ভজনা করেন, তাঁহারা সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রদ্ধাবান্ সাধকই ভক্তিযোগী এবং ''ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ,'' একমাত্র ভক্তিদ্বারা সাধক আমাকে জানিতে পারে।

প্রকৃত সাধুসঙ্গের অভাবে কর্মজ্ঞানাদির সৃষ্টি

এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া মানবগণ দেহভেদে সংস্কার শিক্ষা ও সঙ্গক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য কেহ বা কর্মপ্রিয়, কেহ জ্ঞানী, আর কেহ বা ভক্ত। ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি বস্তু; জীবের স্বরূপ কি, মায়ানির্মিত এই জগতই বা কি এবং ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি, জীবের উদ্দেশ্য কি এবং কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে---এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের বিশুদ্ধ বিচার এবং প্রকৃত সাধু-সঙ্গের অভাবও এই ভিন্ন ভাবের অন্য মুখ্যতম হেতু। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এক বস্তু এবং জীবও স্বরূপতঃ এক বস্তু, তবে যে মানববৃন্দের মধ্যে এইরূপ রুচি-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহা সংস্কার, শিক্ষা ও সঙ্গ-জনিত ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্বোপাধিমুক্ত, ভগবৎ-তত্ত্বাভিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ ও উপদেশক্রমেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং তদ্রূপ সাধুর কৃপাবলেই সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। সাধু-সঙ্গ ও সাধু-কৃপা ব্যতীত বিশুদ্ধতত্ত্ব জ্ঞান হইবার অন্য উপায় নাই।

সাধুসঙ্গই সংসারোত্তরণের একমাত্র উপায়

কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহ লাভে যত্নবান্ হইয়াও কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়াই হউক অথবা অন্যায় আত্ম-নির্ভরবশতঃই হউক, সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না এবং সাধু-সঙ্গ লাভ করিবার চেষ্টাও করেন না। ইহা তাঁহাদের মায়ামুগ্ধতার পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেননা সংসার-সাগরে ভাসমান মানবের পক্ষে সাধু-সঙ্গই একমাত্র উপায়; তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শ্রীশঙ্কারাচার্য কহিয়াছেন,---

''ক্ষণমপি সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।।'' (মোহমুদ্‌গর)

ভক্ত-সঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবম্ভূত সাধুসঙ্গে তাঁহাদের রতি জন্মে না। যদি বা কেহ সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা মুখে স্বীকার করেন, অন্তর তাহা চায় না। ইহা দুর্ভাগ্যের পরিচয়। শাস্ত্রে আছে—

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্বসঞ্চিতৈঃ।।"

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ভক্তসঙ্গক্রমেই ভক্তি লাভ হয়। পূর্ব-সঞ্চিত বহু সুকৃতির ফলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। যদিও সুকৃতির অভাববশতঃ কাহারও ভাগ্যে সাধুসঙ্গ সুলভ হয় না। এই জগতে স্থানে স্থানে সাধু বর্তমান আছেন, চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিলে কি হইবে?

সংসার-প্রবিষ্ট জীবের পক্ষে সাধুসঙ্গই সুখলাভের উপায়

মানবগণ এই মায়িক সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া পথহারা পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। কোন্ পথে গেলে সুখ হইবে, কি উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে--এবম্বিধ চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলেই সকল সন্দেহ দূরীভূত হইবে, গন্তব্য পথ সম্মুখে দেখা যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ।।

(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

(হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরম গতিস্বরূপ নিখিল কার্যকারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয়।)

মায়াভিনিবেশবশতঃ জীবের ভগবৈমুখ্য এত প্রবল হইয়াছে যে, বিষয়ী মানব এক মুর্হূতও বিষয়-চিন্তা, বিষয় সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। বিস্তর

চেষ্টা করিয়াও মায়ার নিকট পরাজিত হইতে হয়। কিন্তু সাধুগণ যে হরিকথা কীর্তন করেন, তাহা শ্রবণে অচিরেই মায়াবন্ধন খুলিয়া যায়। যথা ভাগবতে,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য-সংবিদো ভবন্তি হৃৎ-কর্ণ রসায়নাঃ কথা।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনিশ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

(সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশিত যে সকল শুদ্ধ হৃদয়-কর্ণের প্রীতি উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম ভক্তি উদিত হইবে।)

নির্জনবাসে কৃষ্ণভক্তি হয় না, উহা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন, সাধুসঙ্গের ফল হরিকথা শ্রবণ বা কীর্তন; তাহা গ্রন্থপাঠে বা নিজে নির্জনে বসিয়া করা যাইতে পারে, তবে সাধু-সঙ্গের প্রয়োজন কি? আর ভক্তি লাভই বা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ কেন? এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কহিয়াছেন---

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল, হয় 'সাধুসঙ্গ'।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মূখ্য অঙ্গ।।"

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়।।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ'--সর্বশাস্ত্রে কয়।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০, ৫১।৫৪)

মহৎ-কৃপা ব্যতীত কোনও কর্মের দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না

সাধুসঙ্গ এবং সাধুকৃপা ব্যতীত কোন কর্মেই ভক্তি লাভ হয় না। ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গেও মহৎ-কৃপা লাভ হইয়া সর্বসিদ্ধি-সার ভক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু মহৎ কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হইবে না। ভাগবতে (৫।১২।১২) উক্ত হইয়াছে,—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বাপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।।"

(হে রহূগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা দ্বারা ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় না।)

মহাজনের পদরজাভিষিক্ত হইলেই তাহা লাভ হয়।

শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ কহিয়াছেন (ভাগবতে ৭।৫।৩২),—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।"

(নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্তবিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে পর্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না, অর্থাৎ মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।)

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য-সূচক এবম্বিধ বাক্য সকল শাস্ত্র ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিতেছেন। সাধুসঙ্গের কেন যে এত মাহাত্ম্য, এত বল, এত ফল, তাহা বলা যায় না। তবে একমাত্র বলা যাইতে পারে, সাধুসঙ্গ অভাবে কেহ কেহ বহু জন্ম সাধন করিয়াও কৃষ্ণভক্তি পান নাই। তাঁহারাই আবার সাধুসঙ্গে অতি শীঘ্র ভক্তি লাভ করিয়াছেন। সাধুসঙ্গের যে কত মাধুরী আছে, সাধুসঙ্গে সাধু-মুখ-বিনিঃসৃত হরিকথায় যে কত আকর্ষণী শক্তি আছে, সাধু-চরিত্রের যে কত প্রবল বল আছে, তাহা যিনি সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই জানেন। সাধুসঙ্গ-বিহীন তার্কিকগণ তাহা কিরূপে বুঝিবে? সাধুসঙ্গের এত মহিমা বলিয়াই শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন,—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।"

(ভাঃ ১।১৮।১৩)

(ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষ-কালমাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনায় সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা কি বলিব?)

সাধুর অন্তর-লক্ষণ

ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার পূর্বে সাধু কে, তাহার বিচার আবশ্যক। নতুবা সাধু বলিয়া অসাধুসঙ্গ গ্রহণ করিলে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। শাস্ত্রে সাধুর লক্ষণ-সূচক একটি বাক্য আছে, যথা,----

নির্বৈবঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কার-বর্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে।।

পাঠক! সাধু ও বৈষ্ণব ভিন্ন মনে করিবেন না। বৈষ্ণবের লক্ষণ কি তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন---

'সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান।'

(চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১১)

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে।।
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২।৭৪)

কিন্তু এই সমস্ত লক্ষণগুলি অন্তরে থাকে, সুতরাং ইহা দ্বারা সহসা সাধুর পরিচয় জানা যায় না।

সাধুর বাহ্য-লক্ষণ

অন্তরের ক্রিয়া শুদ্ধ হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত সাধুর বাহ্য আচার কিরূপ তাহা মহাপ্রভু কহিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে---

অসৎসঙ্গ ত্যাগ,---এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী--এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

এবম্বিধ অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের বাহ্য আচার; তাহা যাঁহার হইয়াছে তিনি বৈষ্ণব। তাঁহার সঙ্গেই সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা অসৎসঙ্গ ত্যাগের প্রতি কোন যত্ন না করিয়া হরিনাম গ্রহণাদি ভক্তি-অঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বৈষ্ণবাভাস। তাঁহাদের সঙ্গে সাধুসঙ্গের ফল হওয়া অসম্ভব।

সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে

সাধুসঙ্গ কি? সাধুর সহিত কথা কহিলেই সঙ্গ হয় না, সঙ্গ শব্দের অর্থ প্রীতি বা আসক্তি। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী প্রীতির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,---

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম।।

(উপদেশামৃত—৪)

কৃষ্ণ সেবোপযোগী কোন দ্রব্য সাধুকে দেওয়া, সাধুর নিকট হইতে তদ্রূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা; কৃষ্ণ সম্বন্ধসূচক গুহ্য কথা সাধুকে বলা এবং জিজ্ঞাসা করা, হর্ষমনে সাধুর নিকট হইতে কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন করা এবং সাধুকে মহাপ্রসাদ ভোজন করানই সাধুসঙ্গ। মূল কথা, বিষয়ী বন্ধু বান্ধবের প্রতি অন্তরাসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধুকেই প্রাণের বন্ধু জানিয়া সাধুর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের আলাপব্যবাহার করিলেই সাধুসঙ্গ হয়।

সাধুর নিকট বিষয়-কথার আলোচনা—সাধুসঙ্গ নহে

সাধুর নিকট গিয়া, এদেশে বড় গরম, সে দেশে শরীর ভাল থাকে; এ বাবু বড় ভাল, চাউল, ধান্য কিরূপ হইবে' ইত্যাকার মায়া বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয়ত প্রশ্নকারীর কথার দু' একটী উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি -সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎ কথার আলোচনাই সাধু-সঙ্গ। তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়। শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ বিশেষ সতর্ক হইয়া কৃষ্ণকথা ও বিষয়-কথার পার্থক্য অবগত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনা করিবেন। মূল কথা এই---যে কথা কৃষ্ণ উন্মুখ করায়, তাহাই কৃষ্ণ--কথা। আর যে কথা কৃষ্ণ বিমুখ করাইয়া বিষয়-উন্মুখ করায়, তাহাই বিষয়-কথা।

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা

সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা জ্ঞাপনার্থ অধিক আর বলিবার কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রদ্ধাবান সাধকমাত্রই সাধুসঙ্গে যত্নপর হউন। শ্রদ্ধালু হইয়াও যাঁহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সাধুসঙ্গ করুন। সাধু সঙ্গাভাবই তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। গৌরচন্দ্রের এই বাক্য কয়টি সকলেই মনে রাখুন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৩।৯)

মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

'নিত্যবদ্ধ'--কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়।।
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২, ১৪-১৫)

কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতেছেন,—–

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি তবে তিহোঁ কৃষ্ণেরে ভজয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৩০৫)

হরিনাম-পরায়ণ সাধককে প্রভু কহিতেছেন—–

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়।।
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।।

(প্রেমবিবর্ত)

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারস্থিত মানবগণকে মহাপ্রভু একমাত্র সাধুসঙ্গ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিবেন সাধুসঙ্গের কত মহিমা। এই সংসারক্ষেত্রে সাধুসঙ্গ কল্পতরু সদৃশ!!

সাধুসঙ্গের প্রভাব

সাধুসঙ্গের অপার মহিমা কে অবিশ্বাস করিবে? কে না জানে, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গবলে পাপাচারী বারনারী কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার যোগ্যা হইয়াছিল? কে না শুনিয়াছেন, ভক্তবর নারদের সঙ্গ ও কৃপাবলে অতি নিষ্ঠুর হৃদয় ব্যাধও হরিভক্তি লাভ করিয়া ক্ষুদ্র পিপীলিকার প্রাণনাশ বিষয়ে কত সতর্ক হইয়াছিল? পাষণ্ড-প্রধান জগাই প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়াই ত' কোমল হৃদয়ের পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র হইয়াছিল। পতিতপাবন নিতাইচাঁদের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত কি রূপেই বা জগাই মাধাই উদ্ধার হইত? অতএব সকলেই সাধুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধালু হইয়া সাধুসঙ্গে মানবজীবন কৃতার্থ করুন।

নিরপেক্ষভাবে নিরপরাধে ভক্তিযাজন

আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করি। একাদশী তিথির পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমহাপ্রভু মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য দশম অধ্যায়ে)---

"ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে।।
প্রভু বলে,--ও বেটা যখন যেথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথায় মিশায়।।
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সংগে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে।।
অন্যসম্প্রদায়ে গিয়া যখন, সান্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায়।।
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে হইল উহার দরশন-বাধ।।"

শ্রীমুকুন্দ দত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎ সম্বন্ধে যে কথা তাহা রহস্যমাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন তাহাতে একটি উপদেশ আছে। উপদেশটি এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন তাহা নয়। অনন্যা ভক্তিতে যাহার অনন্যা শ্রদ্ধা তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনিই শুদ্ধভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা, দৃঢ়তা

ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেননা। শুদ্ধভক্তগণ সর্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই অশ্রু-পুলক হয়, কখন কখন কথা আলোচনায় দশাপ্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোক সকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই তাহারা ভক্তদের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোনস্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি যে কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্বনাশ সাধনও কারিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব; এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা না করিয়া আমরা ভক্তির প্রতিকূল কোন কথা কহিব না, বা কোন কার্য করিব না। সকল কার্যে সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য—এরূপ হইব না। ভক্তি প্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের যত্ন করিব না। শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।

গীতার তাৎপর্য্য

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

(গীতা ১৮।৬৬)

(এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,---) ব্রহ্ম জ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম, যতি-ধর্ম, বৈরাগ্য শমদমাদি-ধর্ম ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম বলিয়াছি, সে সমুদয় পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎস্বরূপ আমার একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার-দশায় সমস্ত পাপ, তথা পূর্বোক্ত-ধর্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদয় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণা ভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্যলাভ করে। ধর্মাচরণ কর্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস, ও ধ্যানাভ্যাস কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম করিবে, কিন্তু সে কর্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্বক ভগবৎ সৌন্দর্য-মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য এই যে, শরীরী জীব জীবন-নির্বাহের জন্য যত প্রকার কর্ম করে, সে সমুদায়ই উক্ত তিন প্রকার নিষ্ঠা হইতে অথবা ইন্দ্রিয়সুখনিষ্ঠারূপ অধম-নিষ্ঠা হইতে অনুষ্ঠান করে। অধম নিষ্ঠা হইতেই অকর্ম ও বিকর্ম তাহা—অনর্থজনক। তিন প্রকার উত্তম-নিষ্ঠার নাম ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্মই এক-এক প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্ম ও জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম ও ধ্যান যোগাদি-রূপ ভাবের উদয় হয়; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন শুদ্ধা বা কেবলা-ভক্তি-রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই গুহ্যতম তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন—ইহাই গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত---ইহাদিগের জীবন একই প্রকার হইলেও নিষ্ঠাভেদে ইহারা অত্যন্ত পৃথক।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মাবলোকন ফলজনক ধ্যানযোগশিরস্ক কর্মযোগ একটী পর্ব এবং হরিবিষয়ী শ্রদ্ধোদিত শুদ্ধভক্তিযোগ আর একটী পর্ব; ইহাই গীতাশাস্ত্রের সার-সংগ্রহ। তন্মধ্যে মানবদিগের স্বভাব সিদ্ধ-বর্ণক্রমে ধর্মজীবন অবলম্বনপূর্বক নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান-দ্বারা ক্রমশঃ যে জ্ঞান পথ লাভ হয়, তাহাই 'গুহ্য' উপদেশ; ঐ জীবের ধ্যানযোগকে সংযোগপূর্বক ক্রমশঃ আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই গুহ্যতর এবং শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তিদ্বারা ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানই সর্ব গুহ্যতম উপদেশ। ইহাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য। সমস্ত গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য এই যে অদ্বয়বস্তুই একমাত্র তত্ত্ব; ভগবত্ত্বই সেই তত্ত্বের সম্যক পরিচয়। অন্য সমস্ত তত্ত্বই সেই ভগবদ্বস্তুর শক্তি-নিঃসৃত চিচ্ছক্তিদ্বারা ভগবৎ স্বরূপ ও চিদ্‌বৈভব, জীবশক্তি দ্বারা মুক্ত ও বদ্ধভেদে দ্বিবিধ অনন্ত জীব, মায়াশক্তিদ্বারা প্রধান হইতে স্তম্ভপর্যন্ত চতুর্বিংশতি জড়তত্ত্ব; কালশক্তিরদ্বারা সৃষ্টি স্থিতিও সংহার ও সর্বাবস্থার কলন এবং ক্রিয়াশক্তিদ্বারা সর্ববিধ কর্মাবিষ্কার। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব,কাল ও কর্ম---এই পাঁচটী তত্ত্ব একমাত্র ভগবত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত। ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভাবসকল ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত। উক্ত পঞ্চবিধ তত্ত্ব---পৃথক হইয়াও যুগপৎ ভগবত্তত্ত্বের আয়ত্তাধীন একতত্ত্বমাত্র; এক তত্ত্ব হইয়াও বিশেষ ধর্ম-বশতঃ নিত্য পৃথক। এই গীতাশাস্ত্রোক্ত ভেদাভেদতত্ত্ব মানবযুক্তির অতীত। এতন্নিবন্ধন পূর্ব মহাজনগণ গীতাশাস্ত্রে (উপদিষ্ট) তত্ত্বের নাম 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং এতৎ সম্বন্ধি জ্ঞানের-নামই তত্ত্ব-জ্ঞান।

জীব---স্বরূপতঃ শুদ্ধচেতন, চিৎসূর্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণপরমাণু-গত তত্ত্ব বিশেষ; তিনি---স্বভাবতঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় জগতের যোগ্য। চিৎ ও অচিৎ জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার প্রথমাবস্থান। তিনি 'চেতন' বলিয়া স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র; চিজ্জগতে রত হইলে কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া চিদ্‌গতা হ্লাদিনী-শক্তির সাহায্যে শুদ্ধানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ, আর তদেকপার্শ্বস্থিত মায়িক জগতে রত হইলে মায়াশক্তির আকর্ষণে কৃষ্ণবহির্মুখ হইয়া জড়সুখদুঃখে নিপতিত হন। যাঁহারা চিদ্‌রতি বিশিষ্ট, তাঁহারা নিত্যমুক্ত এবং যাঁহারা জড়রতিবিশিষ্ট তাঁহার নিত্যবদ্ধ; উভয়বিধ জীবের সংখ্যাই অনন্ত।

বদ্ধজীব লুপ্তপ্রায়স্বভাব হইয়া জড়সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেখাইতে কোন সময়ে নির্বেদ লাভ করত তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে কর্মযোগদ্বারা ধ্যানপরিপাকে স্ব-

স্বভাবরূপ ভগবদ্‌রতি লাভ করেন। কখনও বা ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তদুপযুক্ত গুরুপদাশ্রয়ে সাধন, ভাব ও প্রেম পর্যন্ত লাভ করেন। উক্ত দ্বিবিধ উপায় ব্যতীত আত্মযাথাত্ম্য-লাভের অন্য উপায় নাই। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে ধ্যানশিরস্ক আত্মযাথাত্ম্যপ্রদ কর্মযোগই সাধারণের অবলম্বনীয়; যেহেতু তাহা---স্বচেষ্টাধীন। শ্রদ্ধোদিত ভক্তিযোগ কর্মযোগাপেক্ষা প্রশস্ততর ও সহজ হইলেও ভগবৎকৃপা বা সাধুকৃপারূপ ভাগ্যোদয় না হইলে তাহা ঘটে না। সুতরাং জগতের অধিকাংশ লোকই জ্ঞানগর্ভ কর্মযোগপ্রিয়। তন্মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্যোদয় হইয়া পড়ে, তাহাদের ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা হয় এবং গীতার চরম শ্লোকোক্ত প্রপত্তিরূপা শরণাপত্তি উদিত হয়; ইহাই সর্ববেদের অভিধেয়।

কাম্যকর্ম্মমার্গে যে চতুর্দশ লোকে জড়সুখ-ভোগ, বা ভুক্তি লাভ হয়, তাহা—চেতনস্বরূপ জীবের পক্ষে অত্যন্ত হেয়। গীতার প্রারম্ভেই সেই কাম্যকর্ম ও তদুত্থিত ভুক্তি নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইয়াছে জরামরণমোক্ষান্তর কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিরূপ সাযুজ্য-নির্বাণাদি চতুর্বিধ ঐশ্বরধামপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিস্থান ভেদ করত ভগবল্লীলারূপ আত্মচরমযাথাত্ম্যে প্রবেশপূর্বক ভাব অর্থাৎ নির্মল প্রেম লাভ করাই যে জীবের চরম প্রয়োজন, তাহাই অনেক স্থলে সিদ্ধান্ত সমাপ্তিকালে কথিত হইয়াছে।

অতএব গীতশাস্ত্রে সমস্ত বেদ ও বেদান্ত সংগ্রহপূর্বক জীবের চরমোপাস্যরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর ভগবান এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্বক ভক্তিযোগ, অনুষ্ঠান করতঃ পরম-প্রয়োজন-রূপ প্রেম লাভ কর; স্ব স্ব অধিকারানুসারে ধর্ম জীবনের সহিত সর্বদা শ্রবণাদি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর; ভক্তিযোগের অনুকূল আচরণ-রূপ স্বধর্ম অবলম্বনপূর্বক জীবন নির্বাহ কর এবং শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধা সহকারে ক্রমশঃ স্বনিষ্ঠাত্যাগপূর্বক শরণাগতিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে। তাহা হইলে স্বল্পকাল মধ্যেই আমি তোমাকে নিরপেক্ষ---জুষ্টবিশুদ্ধপ্রেম দান করিব। এইরূপ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যাপারে প্রবেশ করিবামাত্র অশোক, অভয় ও অমৃত স্বরূপ মৎপ্রসাদ লাভ করত আমার নিত্য-প্রেমে আবিষ্ট হইবে।

গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয়দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই তাঁহারাও স্বীয় স্বীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ন্যায্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মস্বভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী জীবন যাপনের বৃত্তি। রাজ্যপালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্য-বৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা---ইহাই শূদ্র-বৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করতঃ প্রাণ রক্ষা করার নাম ধর্ম্ম।

দুই প্রকার রাজকার্য্য

রাজকার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ ক্ষত্র-যোগ্য রাজকার্য্য, ও শূদ্র-যোগ্য রাজকার্য্য। কার্য্যালয়ে নিয়মিত সময়ে গমন পূর্ব্বক লেখাপড়া দ্বারা রাজ্য-শাসন-কার্য্যে যাঁহারা রাজসেবা করেন তাঁহাদের ক্ষাত্রবৃত্তি। এই সকল রাজসেবকদিগের পক্ষে রাজদত্ত বেতনদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা উচিত।

দুই প্রকার চৌর্য্যবৃত্তি

গোপনে অর্থ সংগ্রহ করাটা চৌর্যবৃত্তি। তাহা দুই প্রকার---রাজদত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া লওয়া এক প্রকার চৌর্য। নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যসূত্রে অপর লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন—

রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে।।

(চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য--৯।৯০)

যে সকল রাজকর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করেন তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড্য অতএব অবৈষ্ণব। এই পাপ ক্রিয়া তাঁহারা সত্বর পরিত্যাগ করিবেন। বেতনের দ্বারা যতদূর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিত।

সদ্বৃত্তি ও সদ্ব্যয়-অসদ্ব্যয়

যাঁহারা রাজার নিকট নিয়মিত অর্থ-দান চুক্তি করিয়া বিষয় ভোগ করেন তাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া যাহা পান তাহাই তাহাদের সদ্বৃত্তি-প্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা পালন।
'ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন।।
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ব্যয়।।
অসদ্ব্যয় না করিহ—যাতে দুই লোক যায়।'

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৪২-৪৪)

যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বৃত্ত ধন পান তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্য-মাংস ভোজন, অসৎ নাট্যাদি দর্শন, বৃথা মোকদ্দমা ইত্যাদিতে ব্যয়, অসৎপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন।

সদ্ব্যয় ও তাহার তারতম্য

অতিথি সেবা, দুঃখী ক্ষুধার্ত্ত লোককে অন্নদান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্যদান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্র লোককে কন্যাদি দায় হইতে মুক্তকরণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা আর একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয়—শ্রীভগবৎ-সেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে। এ বৎসর যে সব ধনী, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে অর্থ দান করিয়াছেন তাঁহাদের তুল্য সদ্বৈষ্ণব আর কে আছে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈনন্দিন সেবা সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। মহাত্মাগণ আনন্দের সহিত সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন ও হইবেন।

প্রতিষ্ঠাশা-পরিবর্জ্জন

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অন্তরালে প্রতিষ্ঠাশা

আমরা যতই আত্মোন্নতির চেষ্টা করি, যতই ধার্ম্মিক হইতে যত্ন করি, যতই বৈরাগ্য-ধর্ম্ম পালন করি, বা যতই জ্ঞান চর্চ্চা করি, ততই স্বীয় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের চিত্তকে মলিন করে এবং চরিত্রকে দূষিত করে। অনেক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদকে খর্ব্ব করি, কঠোর তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করি, তথাপি হৃদয়ে অতি গুপ্তরূপে প্রতিষ্ঠাশারূপ ব্যালশাবক সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করিয়া যোগিরূপে খ্যাত হইতে বাসনা করি। যদি কেহ বলে যে, আমার যোগশিক্ষা কেবল ধূর্ত্ততামাত্র, তখনই আমি ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হই। আমি অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে লীন করিবার চেষ্টা করি। যদি কেহ বলে ঐ প্রক্রিয়াটী নিষ্ফল, তখনই আমার মনে উদ্বেগ হয়। আমার নিন্দুককে নিন্দা করিতে থাকি। শম, দম, তপ, অস্তেয় প্রভৃতি দশবিধ ধর্ম্ম শিক্ষাকরি এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে করিতে সংসার নির্ব্বাহ করি। যদি কেহ বলে যে, কর্ম্মকাণ্ড কেবল নিরর্থক শ্রমমাত্র, তখনই আমার মনে দুঃখ হইয়া থাকে; কেননা আমার প্রতিষ্ঠার খর্ব্ব হইলে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

ভুক্তি ও মুক্তিকামী—অশান্ত ও প্রতিষ্ঠার দাস

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি যখন ভুক্তি ও মুক্তিফল আশায় ভ্রমণ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের শান্তি কোথায়? সুতরাং তাঁহারা প্রতিষ্ঠার আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসাশূন্য বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠার আশা নিতান্ত হেয়।

বর্ত্তমান বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ প্রতিষ্ঠাকামী ও অসহিষ্ণু

আজকাল যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্য, তাঁহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য্য বলিয়া অপরে সম্মান করে, তাহা অন্যায় নয়; কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাঁহার শ্রেয়ঃ কোথায়? আবার কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে নাই, তাহা দেখিয়া

তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আচার্য্যদিগকে সম্মান করিবার জন্য শিষ্টলোক তাঁহাদের জন্য পৃথক আসন দিয়া থাকেন। যাঁহারা আসন দেন, তাঁহারা যথাশাস্ত্র আচার্য্য-সম্মান করেন। কিন্তু ঐ আচার্য্যদিগের আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয়, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য্য কেবল প্রতিষ্ঠার আশা হইতে উদিত হয়।

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ সুদুষ্কর

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক গৃহত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে। কোন ভেকধারীকে যদি সম্মান না করা যায়, তাহা হইলে তিনি বিশেষ রাগান্বিত হন। গৃহস্থ বৈষ্ণবাচার্য্য এবং ভেকধারী বৈষ্ণবের মধ্যে যদি প্রতিষ্ঠা-আশা রহিল, তবে আর কাহার চিত্ত সেই আশাশূন্য হইতে পারিবে?

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ হয় না

আমরা অনেক সময় চিন্তা করিয়া এবং মহৎ লোকের উপদেশ সংগ্রহ করিয়া জানিয়াছি যে, যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পরি, ততদিন বৈষ্ণব হইয়াছি এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি, আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই, কিন্তু মনে মনে করি যে, শ্রোতাগণ এই কথা শুনিয়া আমাকে শুদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন! হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। অতএব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলিয়াছেন---

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু-দয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ।।

(মনঃশিক্ষা-৭)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যতদিন আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠাশারূপ নিলর্জ্জ-চণ্ডালিনী নৃত্য করিতেছে, ততদিন নির্ম্মল-সাধু-প্রেম এই মনকে কিরূপে স্পর্শ

করিবে? অতএব, হে মন! তুমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অতুল সামন্তরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা কর। তাহা হইলে তিনি সেই চণ্ডালিনীকে তোমার হৃদয়-মন্দির হইতে শীঘ্র দূর করিয়া প্রেমবস্তুকে প্রবেশ করাইবেন।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গে প্রতিষ্ঠাশার বিলোপ

এই মহাজন-বাক্য হইতে আমরা কি সংগ্রহ করি? আমরা জানিতে পারিতেছি যে কেবল গ্রন্থচর্চ্চা, অপ্রাপ্তপ্রেম-ব্যক্তির উপদেশ এবং শারীর-যোগাদিদ্বারা প্রতিষ্ঠাশা কখনই দূর হইতে পারে না। কেবল বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার দ্বারাই তাহা নিশ্চিতরূপে দূর হয়। আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিব—ইহাই আমাদের চরম কর্ত্তব্য।

সৎসঙ্গ-গ্রহণ ও অসৎসঙ্গ-ত্যাগ একই কথা

বৈষ্ণবসঙ্গে আমাদের হৃদয়ে সাধুতার উদয় হইবে এবং অসাধুতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। হৃদয় পরিষ্কৃত হইলে সেই সাধু-বৈষ্ণবের হৃদয়স্থ প্রেম-সূর্য্যের কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ প্রেমরূপে সমৃদ্ধ হইবে। এই উপায় ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ইহাই সাধু হইবার স্বাভাবিক উপায়। অন্য প্রকার সকল-যত্নই বিফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে, সৎস্বভাব গ্রহণ ও অসৎস্বভাব দূরীকরণ একই কথা।

সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রতিষ্ঠাশা দূরীভূত ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ

প্রেম যে ধর্ম্ম তাহা কেবল বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-পরায়ণ আত্মায় নিহিত থাকে। প্রেমের অন্য আবাস নাই। এক আত্মা হইতে প্রেম অন্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়। এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যেরূপ বিদ্যুদ্ধর্ম্ম সঞ্চারিত হয়, তদ্বৎ। সঙ্গক্রমে যখন প্রেম-ফলক বৈষ্ণব-আত্মা হইতে অন্য জীবের আত্মায় স্বভাবক্রমে চালিত হয়,তখনই অন্য জীবের হৃদয়ে মন্দ স্বভাব দূরীভূত হইয়া সাধু স্বভাব অগ্রে সঞ্চারিত হয়। সকল মহদ্‌গুণই প্রেমের সঙ্গী। সুতরাং প্রেমের প্রবেশকালে মহদ্‌গুণগুলি অগ্রসর হইয়া হৃদয় শোধন করে। অতএব সাধুসঙ্গ দ্বারা প্রতিষ্ঠাশা দূর করা কর্ত্তব্য।

বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া চাই

বৈরাগী প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবগণ আপন আপন চরিত্র পবিত্র করিবেন। বিশেষতঃ বৈরাগী বৈষ্ণবগণ এ-বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। চৈতন্যচরিতামৃতে—

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্ব লোকে গায়।। (মঃ ১২।৫১)
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু—পাতে কেহ না করে পরশ।। (মঃ ১২।৫৩)

গৃহস্থ, সন্ন্যাসী দুই প্রকার বৈষ্ণবই জগদ্‌গুরু

বৈষ্ণব দুই প্রকার, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামিগণ এবং ভগবন্মন্ত্রপ্রাপ্ত গৃহস্থ সকলেই বৈষ্ণব, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব। যাঁহারা ভেক গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হন, তাঁহারা সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, অন্য সকলের পূজনীয়। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা চণ্ডাল হউন, সকলেরই আদরণীয়। এই জন্যই বৈষ্ণবগণকে জগদ্‌গুরু বলা যায়।

মন্ত্রাচার্য্য গৃহস্থ-গোস্বামী-গুরুর প্রতি উপদেশ

বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চ-পদস্থ জীব, তাঁহাদের চরিত্র তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? এ-সকল বিবেচনা করিয়া আদৌ মন্ত্রাচার্য্য গোস্বামী মহোদয়গণ নিজ নিজ চরিত্র নির্দ্দোষ করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন। পরস্ত্রী, পরের ধন, পরের সম্পত্তি—এই সমস্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লোভ করিবেন না। যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ সকল কার্য্যে কখনই রত হন না। ভণ্ড তপস্বী ও বৈড়াল ব্রতীগণেরাই মন্ত্রাচার্য্য-পদের ছলে নানাবিধ পাপকার্য্য করেন। গুরুদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা শিষ্যগণকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবেন। অর্থ-লালসায় পাকে-চক্রে তাহাদিগ্‌কে বিব্রত করিয়া না ফেলেন। শিষ্যগণের পরিবারদিগকে নিজ কন্যার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিবেন। সাধারণ

গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায়দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।

ভেকধারী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য

ভেকধারী বৈষ্ণব পবিত্র থাকিলে তাঁহাকে যথোচিত বৈষ্ণব-সৎকার করিবেন। অবকাশ পাইলে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী-বৃত্তি দ্বারা মাগিয়া-যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কাল-সর্পকে সমান দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন। যদিও সকলপ্রকার বৈষ্ণবকে সচ্চরিত্র থাকিতে অবশ্যই হইবে, তথাপি ভেকধারী বৈষ্ণব বিশেষ-ভাবে সচ্চরিত্রতা অবলম্বন করিবেন, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। ভেকধারী বৈষ্ণব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার চরিত্রে যদি কোন-প্রকার দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়।

ভেকধারীদের পাতিত্য-দোষে বৈষ্ণবদের নিন্দা

কতকগুলি ভেকধারীদের দোষে আজকাল ভেকধারী বৈষ্ণব-মাত্রেরই নিন্দা হইয়া উঠিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করি যে, বিশুদ্ধ ভেকধারী বৈষ্ণবগণ পতিত ভেকধারীদিগের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে সৎশিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। পতিত ভেকধারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

অধিকাংশ ভেকধারীই কলি-দোষ-দুষ্ট

ভেকধারী বৈষ্ণব স্বভাবতঃ বিরল। কেননা সমস্ত সংসার-সুখ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্রের সহিত অহরহঃ হরিনাম না করিতে পারিলে ভেকধারীর পদ পবিত্র রাখা যায় না। অতএব ভেকধারী বৈষ্ণব-সংখ্যা বাড়িলে অবশ্যই আশঙ্কা করিতে হইবে যে, কলির কোনপ্রকার দুষ্টকার্য্য ইহাতে আছে। আজকাল ভেকধারীর সংখ্যা বাড়িবার কারণ এই যে, ভেক গ্রহণকালে অধিকার বিচার করা যায় না। অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিলে শেষে উৎপাত বই আর কি হইতে পারে? এ-বিষয়ে একটু সাধারণের মনোযোগ না হইলে আর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম রক্ষা হয় না।

—

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম

ভারতবর্ষীয় চাতুবর্ণস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রম-বিভাগ বর্ণ-বিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই চারি আশ্রমের যে-কোন একটীর অন্তর্ভূক্ত হইলে বর্ণ-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় আছে, তাঁহাদের আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত; যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন নিবদ্ধ বিধি-নিষেধ, পালন-বর্জ্জন দ্বারা সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত কর্ম্মী ও জ্ঞানী সমাজে শ্রেষ্ঠ

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি, উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোন-প্রকার অপ্রীতি উদয় না হয়—এরূপ উদ্দেশ্যে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে-সকল স্বর্গাদি লাভ ও পুণ্য সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও বাবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিক বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি তর্পণ সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থে-বাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞান প্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্তি-অভাবসকলের প্রাপ্তি লোভে ক্রিয়া করেন, তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

বর্ণাশ্রমী যোগীর সমাজ-কল্যাণ

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্ক জ্ঞানী-সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করতঃ সমাজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী-সম্প্রদায় 'স্ব স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখ লাভ সম্ভবপর'—জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগ-জনিত সুখ-ভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়া জনিত সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

শ্রীবৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস

বর্ণ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা 'সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা'—উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়াদ্বারা 'সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক'—এ-চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণ-চতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়ের নিকট নিজ-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাঁহার ক্রিয়া 'বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না'—এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব 'ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন'—একই কথা; 'গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন'—তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবৎ ভক্তির জন্য 'শ্রীবৈষ্ণব নরক-লাভ করুন বা স্বর্গ লাভ করুন'—একই কথা। ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম, ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না; তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মকামীর অভাববশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্ম-কামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্য-চ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই মায়িক কাম-ফলপ্রসূ ক্রিয়া-কারীগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

পরমহংস বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম-বিচার নিষিদ্ধ

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টাবিশেষ।

ভগবদ্দর্শনে সর্ব্ব সংশয় ও কর্ম্মক্ষয়

জগতের একমাত্র পরমগুরু পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়। পরাবিদ্যা-শাস্ত্র বেদে লিখিত আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।

ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্ব সংশয়ের ছেদন হয়, কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া সত্য উপলব্ধি হয়। সদাচার-পরায়ণ দশ-সংস্কার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিন্ময়-চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র দর্শনে বৈষ্ণবের শুদ্ধ পরিচয়

শ্রীচৈতন্য-চরিত্র পরারর, যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে—শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন; ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন; তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্, গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। 'আমি ব্রহ্ম বা অণু' ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জু-সর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ-প্রাপ্তির পর কোন প্রয়োজন থাকে না।

বৈষ্ণব জাতি বা সমাজের অন্তর্গত নহে

আজকাল কতকগুলি 'শ্রীবৈষ্ণব' শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ সংযোগদ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণব-বপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র।

(ত্রয়োদশ) অপসম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণবের কলঙ্ককারী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরে স্মার্ত্ত কর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন, বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় 'সহায়তা করিবার ছলে' তদপেক্ষা অধিক কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্রীহরিদাস ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের বর্ণবিচার আদরণীয় নহে

শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিমানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণব শিক্ষা

প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য-বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা করে নাই, অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ-সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে।

শ্রীবৈষ্ণব কৃষ্ণ-পরতন্ত্র-স্বাধীন নহেন

শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীজনবল্লভ-দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায়, তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম কপটতাবশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে; বস্তুতঃ তদীয়ত্ব-ধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিকগণ বিধি-নিষেধসকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রতিবন্ধক

জীব মাত্রেরই প্রাপ্য বস্তু প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ অখণ্ড প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির অনুসন্ধান-চেষ্টা সকল সময়ে সকল জীবেই লক্ষিত হয়। পুত্রশোক-কাতরা মাতা প্রীতিলাভের আশায় শোক করিয়া থাকেন, প্রীতিলাভের আশায় বিলাসপর জীবগণ নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির চেষ্টা করেন। ইন্দ্রিয়তর্পণমানসে প্রীতির উদ্দেশ্যে কত অঘটনীয় শুভাশুভ কর্মের প্রবৃত্তি হয়।

আজও মানবজ্ঞানে প্রীতিলাভ—উদ্দেশ্য ব্যতীত চেতনের অন্য ধর্ম লক্ষিত হয় না। চেতনের চেষ্টা মাত্রই প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া বাধিত হইয়াছে। এমন একটি বস্তু কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধানে সমগ্র চেতন জগৎ সর্বদাই ব্যস্ত।

জীব সর্বদা প্রীতির অনুসন্ধান করেন সুতরাং নিত্য প্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়। যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের অস্তিত্বকে অনিত্য অভিমান করে সেখানে তাহার লভ্যবস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্য প্রীতির অভাবে নিত্য-প্রীতি লাভ চেষ্টা জীবে দেখা যায়। কিন্তু সেই প্রীতি কাল-দ্বারা এবং সীমা দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় নিত্যত্বের ও স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি যে কাল-পর্যন্ত কাল ও সীমার অধীন থাকে, তৎকালাবধি নিত্য প্রীতি-চেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন। কেবলমাত্র ভগবত্তা কাল ও সীমার অধীন নহে; কারণ কাল ও সীমা ভগবান হইতে জন্মলাভ করিয়া অপ্রাকৃত জগতে ভগবদ্‌বিমুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পড়িলেও হরিবিমুখ জনগণ ভগবানকে দেশ কালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন। জীবের হরিবিমুখতা বিগত হইলে তিনিও মায়িক নিজ-ভোগ্য দেশ-কালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। হরিবিমুখ জীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল ও সীমার মায়াতীত জনক ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন। নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান জীব মাত্রেরই বৃত্তি, তাহা তিনি সকল সময় লক্ষ্য করিতে পারেন আর নাই পারেন। তাহার ঐ ধর্ম কোন সময় তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না।

যাহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ব্যক্তি অনিত্য প্রীতির অনুসন্ধানকারী, অপর জন নিত্য প্রীতির অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক প্রাকৃত ও অপর শ্রেণীর লোক অপ্রাকৃত। অনিত্যতা ও সীমাবিশেষ-ধর্ম-প্রাকৃত; নিত্যতা ও বৈকুণ্ঠ-ধর্ম-অপ্রাকৃত।

প্রাকৃত হরিবিমুখ জন অনিত্য সুখ-লালসায় প্রমত্ত; আর অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ লালসায় তাৎপর্য্যবান্। হরিবিমুখতাক্রমে তাহারা অনিত্যের ও মায়িক বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন; এমন কি অপ্রাকৃত জনগণের সেব্য কৃষ্ণচন্দ্রকে, কৃষ্ণভক্তিকে তাহারা নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করেন; মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্য প্রীতির বিপণি প্রসারণ করেন। ইহার ফলে তাঁহাদের নিত্য-প্রীতিময়বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না; তাহারা অনিত্য প্রাকৃত পিণ্ডবিশেষ জ্ঞানে কৃষ্ণকে—কৃষ্ণভক্তিকে বা কৃষ্ণভক্তকে নিজ ভোগ্যবস্তু বলিয়া ধারণা করেন। অপ্রাকৃত ভক্তের তাদৃশ প্রাকৃত ধারণা নাই। যে কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ধারণাকে কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে অনিত্য প্রীতির আবাহন করেন; তৎকালে ভক্ত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন।

প্রাকৃত হরিবিমুখ জনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন আর অভক্ত দুঃসঙ্গকে প্রীতির আশায় ছাড়িতে চান না। মাদক দ্রব্য- সেবী কোনক্রমে তাহার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না, স্ত্রৈণ কখনও তাহার সেব্য যোষিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না,প্রাকৃত জ্ঞানাচ্ছন্ন পশু তাহার বৎস পরিত্যাগ করিতে পারে না। দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের এইরূপ অনিত্য অভিনিবেশ প্রাকৃত বন্ধু সঙ্গে রঙ্গ থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না। প্রমত্তের মাদকদ্রব্যের হস্ত হইতে, স্ত্রৈণের স্ত্রীহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ। কিন্তু দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনই কোন মঙ্গল হয় না।

প্রাকৃত ভক্তগণ অনেক সময়ে স্ব-স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে থাক, আত্ম প্রতারণার উদ্দেশ্যে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্বক অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন। প্রাকৃত অভক্ত ভক্তের সমাজে নিরীহ লোকদিগকে গঞ্জিকাদি মাদক-দ্রব্য খাইতে শিক্ষা দেন; বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি

দুর্বৃত্তাচরণ অপ্রাকৃত ভজনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন। অপ্রাকৃত সমাজ এই শ্রেণীর মিছা ভক্তগণকে কপট অভিনয়কারী জানিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত হইবার যে সকল উপায় অপ্রাকৃত শাস্ত্র ও অপ্রাকৃত ভক্তের মুখে পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহাও প্রাকৃত পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত দুঃসঙ্গময়-বুদ্ধিক্রমে বিপর্য্যস্ত করেন। প্রাকৃত অভক্তগণ নিজ নিজ দল স্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদনপূর্বক হরিবিমুখতা সংগ্রহ করেন।

ভক্তিমার্গের সাধকের লক্ষিতব্য

আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশঅঙ্গে তিলক ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করি। একাদশী তিথির পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি, শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমহাপ্রভু মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড় জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে।।"

"প্রভু বলে—ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথা মিশায়।।
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তি করি' নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে।।
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্তায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়।।
ভক্তি স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে হইল উহার দরশন--বাধ।।"

শ্রীমুকুন্দ দত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা, তাহা রহস্য মাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে-কথা যখন বলিয়াছেন, তাহাতে একটী উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্যা ভক্তিতে যাহার অনন্যা শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে-প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি শুদ্ধ ভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধ ভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। সরলতা

দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। তিনি লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই অশ্রু পূলক হয়, কখন কখন কথা-আলোচনায় দশাপ্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সহায়তা করেন। বিষয়াবিষ্ট হইয়া আবার বিষয় চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠক বর্গ! এই প্রকার লোকসকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠালাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিবপ্রাপ্তিলোভে ওই প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকপর্ব! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহাই করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব---এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তির প্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্যে সরল থাকিব। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য—এরূপ হইব না। ভক্তিপ্রতিকূল পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভের যত্ন করিব না। শুদ্ধা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।

ভগবদনুশীলন

রাগামার্গসাধকদিগের সমস্ত জীবনই ভবদনুশীলন। ঐ অনুশীলন সপ্তপ্রকার, যথাঃ— প্রকার বিবরণ

১। চিদগত অনুশীলন-- ১। প্রীতি, ২। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতি।

২। মনোগত অনুশীলন-- ১। স্মরণ, ২। ধারণা ৩। ধ্যান, ৪। ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন, ৫। সমাধি, ৬। সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচার, ৭। অনুতাপ, ৮। যম, ৯। চিত্তশুদ্ধি।

৩। দেহগত অনুশীলন-- ১। নিয়ম, ২। পরিচর্যা, ৩। ভগবদ্ভাগবত দর্শন-স্পর্শন, ৪। বন্দন, ৫। শ্রবণ, ৬। হৃষীক অর্পণ, ৭। সাত্ত্বিক বিকার, ৮। ভগবদ্দাস্যভাব।

৪। বাগ্‌গত অনুশীলন-- ১। স্তুতি, ২। পাঠ, ৩। কীর্তন, ৪। অধ্যাপন, ৫। প্রার্থনা, ৬। প্রচার।

৫। সম্বন্ধগত অনুশীলন-- ১। শান্ত, ২। দাস্য, ৩। সখ্য, ৪। বাৎসল্য, ৫। কান্ত। সম্বন্ধগত প্রবৃত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ ভগবদগত প্রবৃত্তি এবং ভগবজ্জনগত প্রবৃত্তি।

৬। সমাজগত অনুশীলন-- ১। বর্ণ--মানবগণের স্বভাব-অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম, পদ ও বার্তা-বিভাগ। ২। আশ্রম--মানবগণের অবস্থান-অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগ--গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। ৩। সভা ৪। অনেক সাধারণ উৎসবসমূহ। ৫। যজ্ঞাদি কর্ম।

৭। বিষয়গত অনুশীলন--চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াবিষয়ীভূত ভগবদ্ভাব বিস্তারক নিদর্শন (অদৃশ্য-কাল-বিজ্ঞাপক ঘটিকাযন্ত্রবৎ) যথা—

ক। চক্ষুর বিষয়--শ্রীমূর্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা, মহোৎসব ইত্যাদি।

খ। কর্ণের বিষয়--গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা, কথা ইত্যাদি।

গ। নাসিকার বিষয়--ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সৌগন্ধ-দ্রব্য।

ঘ। রসনার বিষয়--ভগবন্নিবেদিত সুখাদ্য, সুপেয় গ্রহণ-সংকল্প। কীর্তন।

ঙ) স্পর্শের বিষয়--তীর্থ-বায়ু, পবিত্র জল, বৈষ্ণব-শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শয্যা, ভগবৎসম্বন্ধি-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতী সঙ্গিনী-সঙ্গাদি।

চ। কাল--হরিবাসর,পর্বদিন ইত্যাদি।

ছ। দেশ--বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি।

শুদ্ধ জীবাত্মার ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ-সকল

শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বাদশটী লক্ষণ, ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে (৭।৭।১৯-২০) প্রহ্লাদ-উক্তিতে কথিত হইয়াছে,—

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ।।
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ।।

আত্মা নিত্য অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীরের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। অব্যয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গশরীর নাশ হইলে তাহার নাশ নাই । শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃতভাবরহিত। এক অর্থাৎ গুণগুণী, ধর্মাধর্মী, অঙ্গাঙ্গী প্রভৃতি দ্বৈতভাব রহিত। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দ্রষ্টা। আশ্রয় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের আশ্রিত নয়, কিন্তু উহারা আত্মার আশ্রিত হইয়া সত্তা বিস্তার করে। অবিক্রিয়, অর্থাৎ দেহগত ভৌতিক বিকাররহিত। বিকার ছয় প্রকার---জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। স্বদৃক্ অর্থাৎ আপনাকে আপনি দেখে, প্রাকৃত দৃষ্টিশক্তির বিষয় নয়। হেতু অর্থাৎ শরীরের ভৌতিক সত্ত্বা, ভাব ও কার্যের মূল স্বয়ং প্রকৃতি মূলক নয়। ব্যাপক, অর্থাৎ নির্দিষ্টস্থানব্যাপী নয়। তাহার প্রাকৃত স্থানীয় সত্তা নাই। অসঙ্গী অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়। অনাবৃত অর্থাৎ ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হয় না। এই দ্বাদশটী অপ্রাকৃত লক্ষণদ্বারা আত্মাকে ভিন্ন করিয়া বিদ্বান লোক দেহাদিতে মোহজনিত 'অহং' 'মম' ইত্যাদি অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।

শুদ্ধজীবের স্থানীয় ও কালিক সত্ত্বা আছে কি না, এ বিষয়ে অনেক তর্ক ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পরমার্থ বিচারে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, বরং বিশেষ নিন্দা আছে। তর্ক সর্বদাই চিদাভাসনিষ্ঠ---চিন্নিষ্ঠ হইতে পারে না। আত্মা অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির সমস্ত তত্ত্বের অতীত। এস্থলে প্রকৃতি-শব্দে কেবল ভূতসকলকে বুঝায়, এমত নহে; কিন্তু ভূত, তন্মাত্র ও চিদাভাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, মনোবৃত্তি ও অহঙ্কার সকলই বুঝায়। চিদাভাস প্রকৃতির অন্তর্গত হওয়ায় প্রকৃতিস্থ অবস্থাকে চিৎকার্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। দেশ ও কাল প্রকৃতির মধ্যে লক্ষিত হইলেও উহারা শুদ্ধসত্তাক্রমে চিত্তত্ত্বে আছে। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তমরূপে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, চিত্তত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব পরস্পর বর্তমান অবস্থায় বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পর বিপরীত তত্ত্ব নহে। চিত্তত্ত্বে যে সকল সত্তা আছে, তাহা শুদ্ধ ও দোষবর্জিত। ঐ সমস্ত সত্তাই জড়তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মায়িক জগতে ঐ সকল সত্তা দোষপূর্ণ অতএব শুদ্ধ দেশকাল, শুদ্ধ আত্মায় লক্ষিত হইবে এবং কুণ্ঠিত দেশকাল, মায়াকুণ্ঠিত জগতে পরিজ্ঞাত হইবে, ইহাই দেশ-কাল-তত্ত্বের একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিচার। শুদ্ধাবস্থায় জীবের কেবল শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় নরসত্তার ত্রিবিধ অস্তিত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, চিদাভাসিক অস্তিত্ব অর্থাৎ লৈঙ্গিক অস্তিত্ব এবং ভৌতিক অর্থাৎ স্থূল অস্তিত্ব। স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম বস্তুকে আবরণ করে; ইহা নৈসর্গিক বিধি। অতএব লৈঙ্গিক অস্তিত্ব কিছু বেশী স্থূল হওয়ায়, শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বকে আচ্ছাদন করিয়াছে। পুনশ্চঃ ভৌতিক অস্তিত্ব সর্বাপেক্ষা স্থূল হওয়ায় শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব ও লৈঙ্গিক অস্তিত্ব---উভয়কেই আচ্ছাদন করিতেছে। তথাপি ত্রিবিধ অস্তিত্বেরই প্রকাশ অছে, কেননা আচ্ছাদিত হইলেও বস্তু লোপ হয় না। শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্বটি শুদ্ধ-দেশকালনিষ্ঠ। অতএব আত্মার স্থানীয় অস্তিত্ব ও কালিক সত্তা আছে, এরূপ বুঝিতে হইবে। স্থানীয় অস্তিত্ব-সত্ত্বে, আত্মার কোন নিশ্চিত অবস্থান স্বীকার করা যায়। নিশ্চিত-অবস্থান-সত্ত্বে, কোন শুদ্ধাত্মক কলেবর ও স্বরূপ স্বীকার করা যায়। সেই স্বরূপের সৌন্দর্য, ইচ্ছা-শক্তি, বোধ-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি ইত্যাদি, শুদ্ধাত্মিক গুণগণও স্বীকার্য হইয়াছে। ঐ স্বরূপটী চিদাভাস কর্তৃক লক্ষিত হইতে পারে না, কেননা উহা প্রকৃতির অতিরিক্ত তত্ত্ব। যেমন স্থূলদেহে করণ সমস্ত নিজ নিজ স্থানে ন্যস্ত থাকিয়া কার্য সম্পন্ন করিতেছে ও স্বরূপের সৌন্দর্য বিস্তার করিতেছে, তদ্রূপ এই স্থূলদেহের চমৎকার আদর্শ-স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহটীতে প্রয়োজনীয় করণ-সমস্ত ন্যস্ত আছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের প্রভেদ এই যে, স্থূল দেহের দেহী শুদ্ধজীব এবং দেহটী স্থূলদেহ, অতএব দেহ দেহী ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, কিন্তু সূক্ষ্মদেহে যিনি দেহী তিনিই দেহ, তন্মধ্যে পৃথকতা নাই। বস্তুমাত্রেরই দুইটি পরিচয় আছে, অর্থাৎ স্বরূপ-পরিচয় ও ক্রিয়া-পরিচয়। মুক্ত জীবের স্বরূপ পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ দ্বারা তাহার কলেবর গঠিত হইয়াছে। আনন্দই তাহার ক্রিয়া-পরিচয়। অতএব মুক্ত জীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। শুদ্ধাহংকার, শুদ্ধ চিত্ত, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয় সকল সেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধ-সত্তায় অবস্থান

করে। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায় এবং মায়িক সুখ-দুঃখ-রূপ আনন্দ বিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হইয়াছে।

পরমাত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন। সর্বশক্তিমান্ পরমাত্মার নাম ভগবান্। মায়াপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি তাঁহার পরাশক্তিভাববিশেষ। যেমন জীব-সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র চিৎস্বরূপ লক্ষিত হয়, ভগবৎসম্বন্ধেও তদ্রূপ এক অসামান্য চিৎস্বরূপ অনুভূত হয়। ঐ স্বরূপটীর শুদ্ধাত্মার পরিদৃশ্য, সর্বগুণসম্পন্ন, অত্যন্ত সুন্দর ও সর্বচিত্তাকর্ষক। সেই সুন্দর স্বরূপের কোন অনির্বচনীয় মাধুর্য ব্যাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যানন্দপ্রকাশ, বৈকুণ্ঠের পরম শোভা নিত্যকাল বিস্তার করিতেছে। শুদ্ধ চিদ্গণ ঐ শোভায় নিত্য মুগ্ধ আছেন এবং বদ্ধ জীবগণ ব্রজবিলাস-ব্যাপারে তাহাই অন্বেষণ করিয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে যে, পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দু-রূপে জীবস্বরূপে লক্ষিত হয়। পরব্রহ্ম-স্বরূপ নারায়ণে ঐ পঞ্চাশটি গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত এবং তদ্ব্যতীত আরও দশটি গুণ তাহাতে উপলব্ধ হয়। তাঁহার পরানন্দপ্রকাশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে চতুঃষষ্ঠি গুণ বিচারিত হইয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, ভগবচ্ছক্তিপ্রকাশের পরাকাষ্ঠা বলিয়া ভক্তগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া সাধনভক্তি

মঙ্গলাচরণ

চৈতন্যকৃপয়া যেন ভক্তিনামাশ্রিতোদিতা।
নমামি হরিদাসং তং ভক্তানাং সুখদং-গুরুম্।।

(শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় যৎকর্তৃক নামাশ্রিতা ভক্তি উদিত হন, আমি সেই ভক্তগণের সুখদায়ক গুরু ঠাকুর হরিদাসকে নমস্কার করি।

শুকদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ।।

(ভাঃ ২।৪।১৫)

যাঁহার নামাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ, যাঁহার রূপদর্শন, চরণবন্দন ও পূজা লোকের সমস্ত কল্মষ সদ্য বিনাশ করে, সেই সুভদ্রশ্রবা শ্রীকৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি।

স্বীয় দূতগণের প্রতি যমের উক্তি---

এতাবানেব লোকঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।। (ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণাদির দ্বারা যে ভক্তিযোগ, (ইহ জগতে) তাহাই জীবের পরম ধর্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।

মাতা দেবহূতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবকে বলিয়াছেন,---

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বনাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।।

(ভাঃ ৩।৩৩।৬)

তোমার নাম-শ্রবণ-কীর্তন, তোমাকে নমস্কার ও স্মরণাদির দ্বারা চণ্ডালও সদ্য অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া যজ্ঞ করিবার যোগ্য হয়। হে ভগবন্, তোমার দর্শনে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।
(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

(হে ভগবন!) জন্মতঃ শ্বপচ হইলেও তিনি শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম নৃত্য করিতে থাকে। যিনি তোমার নাম গ্রহণ করেন তিনি অনেক তপস্যা করিয়াছেন, অনেক হোম করিয়াছেন, অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং অনেক বেদ পাঠ করিয়াছেন। এবম্ভূত ব্যক্তির যে শ্বপচ-গৃহে জন্ম, সে কেবল ভক্তি-পোষক দৈন্যসিদ্ধির জন্য জানিতে হইবে।

শ্রীসূত গোস্বামী শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন---

আপন্ন সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।। (ভাঃ ১।১।১৪)

যাঁহাকে ভয় স্বয়ং ভয় করে, তাঁহার নাম ঘোর সংসৃতিতে (সংসারে) বিপন্ন হইয়া বিবশতার সহিত যিনি উচ্চারণ করেন, তিনি সদ্য বিমুক্ত হন।

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন, (১২।৩।৪৪-৪৬)---

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।

আহা! যাঁহার প্রিয়নাম ম্রিয়মাণ আতুর হইয়া পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে বিবশ হইয়া যিনি গ্রহণ করেন, তিনি কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন। কলিকালে তাঁহার যজন করিতে দুর্বুদ্ধি লোক অনিচ্ছুক হয়; ইহাই দুঃখের বিষয়।

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।
সর্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।।

ভগবান্ পুরুষোত্তম চিত্তস্থ হইলে কলিকৃত দ্রব্য, দেশ ও আত্মসম্বন্ধীয় দোষ-সমূহ হরণ করেন।

শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্।।

ভগবান্ শ্রুত, সংকীর্তিত, ধ্যাত, পূজিত বা আদৃত হইলে অযুত জন্মের অশুভসমূহ হৃদিস্থ হইয়া ক্ষয় করেন।

শ্রীকরভাজন মুনি মহারাজ নিমিকে উপদেশ করিতেছেন (ভাঃ ১১।৫।৩২, ৩৬)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

সুবিদ্ধমান্ ব্যক্তিগণ, যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ নৃত্য করিতেছে এবং যাঁহার বর্ণ (অকৃষ্ণ অর্থাৎ) উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় পীত, (নীলমণি যেমন উজ্জ্বল, মহাপ্রভুর পীতবর্ণ সেই প্রকার উজ্জ্বল) সেই সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-যুক্ত পুরুষটীকে (অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে) সঙ্কীর্তন-প্রায় (সঙ্কীর্তন-প্রধান) যজ্ঞ-দ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে।।

সারগ্রাহী গুণজ্ঞ পুরুষগণ কলিকে এই বলিয়া সম্মান করেন যে, এই কলি-কালে সঙ্কীর্তনের দ্বারা সর্বস্বার্থ লাভ হয়।

নাম-সঙ্কীর্তন সম্বন্ধে শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিবর্গকে বলিতেছেন (ভাগবত ১২।১১।২৫),—

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্।।

নামসংঙ্কীর্তন এইরূপ---হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জুনসখ! হে বৃষ্ণি-ঋষভ! হে পৃথিবীদ্রোহি-দুষ্ট-রাজন্যবংশদগ্ধকারিন্, হে অনপবর্গবীর্য---অক্ষীণবীর্য! হে গোবিন্দ! হে গোপীগণপতি! হে ভৃত্যগীত! হে তীর্থশ্রবা! হে শ্রবণমঙ্গল! ভৃত্যগণকে পালন কর।

নামসঙ্কীর্তনের প্রকার বলিতে যাইয়া দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিতেছেন (ভাঃ ১।৬।২৭)----

নামান্যন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরণ।।

গাং পর্যটংস্তুমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ।।

নির্লজ্জভাবে অনন্তের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণের গূঢ় ভদ্র চরিত্রসকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া অমদ ও অমৎসরতার সহিত পৃথিবী-পর্যটনে কালকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলিতেছেন (ভাঃ ২।১।১১)---

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।

অতএব সর্বশাস্ত্র ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, নির্বিন্ন ও অকুতোভয়লাভেচ্ছু যোগীদিগের পক্ষে কৃষ্ণনামকীর্তনই একমাত্র কর্তব্য।

নিষ্কপটভাবে ভগবন্নামগ্রহণ করাই একমাত্র কর্তব্য (ভাঃ ২।৩।২৪)---

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।

কৃষ্ণনাম নিরপরাধে করা কর্তব্য। সর্বাদৌ নিষ্কপটতার কথা বলিতেছেন। হরিনাম-গ্রহণে নেত্রে জল ও গাত্ররুহে হর্ষপ্রকাশ হইবার সময় যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ সরলতার সহিত দ্রব না হয়, তবে সেই হৃদয় কাপট্য-অপরাধে কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়াছে, মনে করিতে হইবে।

নিরন্তর নামগ্রহণ-পদ্ধতি। বৃত্র আবেগভরে শ্রীগোবিন্দের চরণান্তিকে প্রার্থনা করিতেছেন (ভাঃ ৬।১১।২৪)---

অহং হরে তব পাদৈকমূলদাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।

মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ।।

নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক। নামগ্রহণ-সময়ে অন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে।

বৃত্র কহিলেন---হে কৃষ্ণ! আমি তোমার পাদমূলে নিরন্তর দাসানুদাস হইয়া থাকি, এই প্রার্থনা। যে সময়ে আমার জিহ্বা প্রাণপতিস্বরূপ তোমার গুণসকল গান করিবে, সে সময়ে আমার মন তোমার লীলা স্মরণ করুক। এই সমস্ত শরীর তোমার সেবারূপ কর্ম করিতে থাকুক।

তদ্বিষয়ে আশাসম্বন্ধে বলিতেছেন (ভাঃ ৬।১১।২৬) —

অজাতপক্ষ ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্।।

নাম করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষ শাবকসকল যেমত জননীকে দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়ব্যক্তির ধ্যানে যেরূপ প্রিয়া বিষণ্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার মন তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক।

নামপরণাং প্রায়শ্চিত্তান্তরং নাস্তি। বিষ্ণুদূতাঃ যমদূতান্---

অহং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ।। (ভাঃ ৬।২।৭)
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে।। (ভাঃ ৬।২।৯)
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ।। (ভাঃ ৬।২।১০)

যাঁহারা নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মজ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। এই অজামিল বিবশ হইয়া শ্রীহরির স্বস্ত্যয়ন-নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন কোটীজন্মের পাপ ইহার ধ্বংস হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, পাপ তিন প্রকার---অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক অর্থাৎ এই জন্মকৃত। কর্মপ্রায়শ্চিত্তে বিশেষ বিশেষ পাপ মাত্র ক্ষয় হয়। প্রারব্ধ পাপসমুদায় ক্ষয় হয় না, অপ্রারব্ধের ত' কথাই নাই। অনুতাপাদি জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে অপ্রারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। আকস্মিক পাপ হইতে জ্ঞানী লোক সাবধান হ'ন। নতুবা প্রারব্ধ পাপের সহিত তাহা ভোগ করিতে হইবে। নাম-গ্রহণে অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক সকল পাপই বিনষ্ট হয়। কেবল কৃষ্ণেচ্ছায় জীবন থাকে। চৌর্য, মদ্যপান, মিত্রদ্রোহ, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্পগমন ও স্ত্রী, রাজা, পিতা, গো—এই সকলকে হনন করা এবং অন্য যত প্রকার পাপ হইতে পারে, সেই সমস্ত পাপকারী ব্যক্তি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। কেবল পাপ নষ্ট হয়, এরূপ নয়, আবার কৃষ্ণ-বিষয়ে মতি দৃঢ় হয়।

দূরে আস্তাং শুদ্ধনামগ্রহণম্ নামাভাসেঽপি সর্বপাপনাশঃ।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।। (ভাঃ ৬।২।১৪)

নিষ্কপটে, নিরপরাধে এবং সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত যে কৃষ্ণনাম করা যায়, তাহাই শুদ্ধ নাম। তাহাতে যে কি ফল হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কেন না সেইরূপ নামে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয়। কৃষ্ণ সপার্ষদে ভক্তের নিকট আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেরূপ নামের কথা থাকুক; সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় নাই অথচ নিষ্কপটে ও নিরপরাধে যে নামোচ্চারণ হয়, তাহাই ছায়া নামাভাস। সেই ছায়া নামাভাসের যে অসীম শুভফল, তাহা বলিতেছেন। সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা—এই চারিপ্রকারে ছায়া নামাভাস হয়। সেরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ ক্ষয় হয়।

পতিতং স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।

হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ।। (ভাঃ ৬।২।১৫)

পতিত, স্খলিত, ভগ্ন, সর্পাদির দ্বারা সংদষ্ট, অগ্নির দ্বারা তপ্ত ও অস্ত্র-বজ্রাদির দ্বারা আহত হইয়া যিনি 'হরি'—এই নামটী অবশ অবস্থায়ও বলেন, তিনি যাতনা পাইবার যোগ্য হ'ন না।

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।

নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া।। (ভাঃ ৬।২।১৭)

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।

সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ।। (ভাঃ ৬।২।১৮)

বহুতর ব্যক্তি তপ, দান ও ব্রতাদিদ্বারা সেই সেই পাপ ধ্বংস করেন বটে, কিন্তু অধর্মজ হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণচরণসেবা দ্বারাই সাধিত হয়। এ স্থলে কর্ম্মমার্গীয় কৃচ্ছ্র-প্রায়োপবেশনাদিরূপ ব্রতকে বুঝিতে হইবে। জয়ন্তী, হরিবাসরাদিব্রত কৃষ্ণচরণসেবার অঙ্গ।

অজ্ঞানেই হোক বা জ্ঞানেই হোক, কৃষ্ণনাম নিষ্কপটে সংকীর্তিত হইলে, অনল যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ জীবের পাপসকল দগ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে নামের ফলজ্ঞানকে জ্ঞান বলি এবং ফলের অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলি।

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।

অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ।।

(ভাঃ ৬।২।১৯)

ঔষধ ও মন্ত্রে যে সকল স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে, সেইরূপ কৃষ্ণের নামে সমস্ত অচিন্ত্যশক্তি কৃষ্ণ অর্পণ করিয়াছেন। সেই শক্তি নামের স্বাভাবিকী শক্তি। পাপমাত্র নাশ করা এবং অনন্ত মঙ্গল উদয় করা নামের স্বাভাবিকী শক্তি। ঔষধ ও মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে তাহাদের নিজের স্বভাবগত বীর্যের দ্বারা রোগাদি নাশ করে। রোগী ঐ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য অবগত না হইয়াও ফলপ্রাপ্ত হয়। সেইরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নামফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিগকে কপটতানুরূপ ফল দিবার যে শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন; আর প্রেমাদি উচ্চফল দেন না।

শুকঃ পরীক্ষিতম্---

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।

অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্।। (ভাঃ ৬।২।৪৯)

অতএব অজামিল ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে যে 'নারায়ণ'-শব্দরূপ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নামের ফলেই তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রদ্ধাপূর্বক কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যে ফল, তাহার আর কথা কি বলিব? সর্বেশ্বর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম এক বস্তু, তাহাতে কৃষ্ণের সর্বশক্তি আছে, এরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

কপটতাশূন্যং শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিতং যদ্ভগবন্নামোচ্চারণং তদেব নামাভাসঃ। কাপট্যেন যন্নামগ্রহণং তন্নামাপরাধঃ, তেনৈব হৃদয়ং প্রস্তরবৎ ভবতি। তদগতনামাপরাধঃ দুশ্চিকিৎসঃ। অপরাধা দশবিধাঃ। তত্রাদৌ সাধুনিন্দাপরাধঃ।

প্রথমো নামাপরাধঃ। সাধুনিন্দা দেবী দক্ষম্---

নাশ্চর্য্যমেতদ্ যদসৎসু সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।

সের্ষ্যং মহাপুরুষপাদপাংশুভিনিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্।।

(ভাঃ ৪।৪।১৩)

নামের প্রতি যে দশটী অপরাধ আছে, তন্মধ্যে সাধু নিন্দাই প্রধান অপরাধ। তাহা বলিতেছেন। কুণপে জড়শরীরে যাহাদের আত্মবুদ্ধি, তাহারা মহৎ সাধুদিগকে নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? বৈষ্ণবগণ প্রতিহিংসা করেন না; কিন্তু তাঁহাদের পদরেণু ঈর্ষাপূর্বক সেই সকল বৈষ্ণবনিন্দককে নিরস্ততেজ করিয়া ফেলেন, ইহাই শোভাপায়।

চমসঃ নিমিম্—

কর্ম্মণ্যকোবিদা স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ।। (ভাঃ ১১।৫।৬)
রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্।। (ভাঃ ১১।৫।৭)

যে সকল লোক কর্মকুশল নয় অর্থাৎ কর্মজড়, মূর্খ, আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা কর্মপক্ষীয় চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া থাকে। সেই সকল মিষ্টবাক্যের উৎসবে তাহারা রজোগুণে ঘোরসঙ্কল্প, কামুক ও সর্পবৎ ক্রোধী, দাম্ভিক, অভিমানী ও পাপাচারী হইয়া কৃষ্ণভক্তদিগকে পরিহাস করে।

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ।।
(ভাঃ ১১।৫।৯)

জড়ীয় শ্রী, বিভূতি, উত্তমকুলে জন্ম, সাধারণ বিদ্যা, সন্ন্যাসাদিরূপ ত্যাগ, রূপ, বল ও কর্মদ্বারা অহংকারী ও অন্ধবুদ্ধি খল হইয়া ঈশ্বর ও হরিপ্রিয়দিগকে অপমান করে।

তদপরাধে সতি তৎক্ষমাপণপদ্ধতিঃ। ভগবান্ দুর্বাসসম্।

ব্রহ্মংস্তদগচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি।। (ভাঃ ৯।৪।৭১)

এইরূপ মহদবহেলন নামাপরাধ উপস্থিত হইলে যাঁহার প্রতি অপরাধ হয়, সেই সাধু ক্ষমা করিলে মঙ্গল হয়। ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! তুমি নাভাগ-নন্দনের নিকট অপরাধী হইয়া কষ্ট পাইতেছে। তাঁহার ক্ষমা লাভ করিলে তোমার শান্তি হইবে।

দ্বিতীয়ো নামাপরাধঃ। পৃথগীশবুদ্ধিঃ শিবাদৌ ন কর্তব্যা।

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।।

শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনুগৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না। শিব মায়াশক্তিযুক্ত ত্রিলিঙ্গ গুণ-সংবৃত। হরি—নির্গুণ, প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর।

তৃতীয়ো নামাপরাধঃ। গুরোরবজ্ঞা। নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্।

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।

এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ।। (ভাঃ ৭।১৫।২৫)

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।

মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।। (ভাঃ ৭।১৫।২৬)

গুরুর অবজ্ঞা একটী নামাপরাধ। সত্ত্বের দ্বারা রজস্তমঃকে এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বকে জয় করার বিধি। গুরু ভক্তির দ্বারা অনায়াসে সে সকল সিদ্ধ হয়। জ্ঞানদাতা গুরুতে যাঁহার মর্ত্য সাধারণ বুদ্ধি, তাঁহার পক্ষে কুঞ্জরস্নানের ন্যায় সকলই বৃথা।

চতুর্থাপরাধঃ। শাস্ত্রান্তর-নিন্দা। কৃষ্ণ উদ্ধবম্—

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রোঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি। (ভাঃ ১১।৩।২৬)

নমঃ প্রামাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।

প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ।। (ভাঃ ১০।১৬।৪৪)

বৈদিক কোন শাস্ত্র নিন্দা করিবে না। ভাগবত-শাস্ত্রের বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্তদধিকারীর উপকারী জানিয়া নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রমাণ করি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বোধক নিগমশাস্ত্রকে প্রণাম করি।

পঞ্চম-নামাপরাধঃ—নাম্নি অর্থবাদো। যমঃ দূতান্—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।

ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

ভগবান্ উদ্ধবম্---

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।

মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে।। (ভাঃ ১১।২১।৩৪)

যাঁহারা মহাজন নন, তাঁহারা দৈবী মায়াদ্বারা বিমোহিত; (তজ্জন্য তাঁহারা) ভগবন্নামমাহাত্ম্য জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ করিয়া জড়বুদ্ধিবশতঃ মধুপুষ্পিত কর্মফলপ্রদর্শক বাক্যসকলে অধিক বিশ্বাস করিয়া বৈতানিক কর্মে নিযুক্ত হন এবং নাম-অপরাধে অমঙ্গল লাভ করেন। ভগবান্ কহিলেন্---তাৎপর্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, অভিমানী ও লুব্ধ ব্যক্তিদিগের আমার বার্তায় রুচি হয় না।

শুকঃ পরীক্ষিতম্---

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।

ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ।। (ভাঃ ৬।১।১৮)

(কোন ব্যক্তি) নারায়ণ-পরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হয় না; মদ্য-কুম্ভ জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ।

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম্ম-

ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।

প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং

বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্।। (ভাঃ ৭।৯।৪৬)

'নামে অর্থবাদ' অপরাধ-ক্রমে মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপ, অধ্যয়ন, স্বকর্ম, ব্যাখ্যা, বিবিক্তবাস, জপ ও সমাধি প্রভৃতি আপবর্গ্য-পন্থা---হে ভগবান্! দাম্ভিক অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের প্রায়ই জীবন-বার্তা হয়, পারমার্থিক হয় না।

ষষ্ঠাপরাধঃ--অন্যশুভকর্মণা সহ নাম্নঃ সাম্যবুদ্ধিঃ।

নারদঃ--

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।

নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ।।

(ভাঃ ৪।৩১।৯)

অন্য শুভকর্মের সহিত নামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয়। সেই জন্মই জন্ম, সেই সকল কর্মই কর্ম, তাহাই আয়ু, তাহাই মন এবং তাহাই বাক্য, যদ্দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি পরিসেবিত হন। ভক্তির নিকট ঐ সকল শুভকর্মের তুচ্ছতা দেখুন।

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা।।

(ভাঃ ৪।৩১।১০)

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রি-রাধসা।।

(ভাঃ ৪।৩১।১১)

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ।।

(ভাঃ ৪।৩১।১২)

শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক---এই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা কি লাভ? বেদত্রয়ে যে সকল কর্ম ব্যবস্থাপিত আছে, তাহাতেই বা কি (ফল)? দেবতাগণের আয়ু লাভ করিয়া বা কি হয়? বেদাধ্যয়নেই বা কি লাভ? বাগ্মিতা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারাই বা কি হয়? বুদ্ধি বা নৈপুণ্যদ্বারাই বা কি লাভ? ইন্দ্রিয়চেষ্টা ও বলের দ্বারাই বা কি হয়? যোগের দ্বারাই বা কি হয়? সাংখ্যজ্ঞানেই বা কি হয়? সন্ন্যাস, বেদপাঠ বা অন্যান্য শ্রেয়ঃদ্বারাই বা কি হয়, যদি আত্মপ্রদ হরিকে না পাওয়া যায়। এই সকল শুভকর্ম জড়ময়। হরিনাম চিন্ময়। তাঁহার সহিত জড় শুভকর্মের তুলনা করিলে অপরাধ হয়। অন্যদেবোপাসনাদিশুভকর্মণাং নাম্না সহ ন সাম্যম্—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হনমচ্যুতেজ্যা।।

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

অন্য দেবোপাসনাকেও হরিনামের তুল্য মনে করিলে ষষ্ঠাপরাধ হয়। তরুমূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখাসকল তৃপ্ত হয়। প্রাণ সন্তুষ্ট

হইলে সকল ইন্দ্রিয় প্রসন্ন থাকে। তদ্রূপ কৃষ্ণোপাসনাদ্বারাও সকল দেবতার অর্চন হয়। পৃথক্ পূজা নিষ্ফল।

অন্যশুভকর্মণাং ফল্গুত্বম্। দেবাঃ---

অবিস্মিতং পরিপূর্ণকামং স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।

বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্।।

(ভাঃ ৬।৯।২১)

কৃষ্ণ পরিপূর্ণকাম, স্বীয়লাভে পরিপূর্ণ, সম ও প্রশান্ত। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ছাড়িয়া শুভকর্মাদি ও তত্তদুদ্দিষ্ট কোন দেবতাকে আশ্রয় করে, সে মূঢ়। সমুদ্র পার হইবার জন্য যে ব্যক্তি কুকুরের লেজ ধরে, সেও তদ্রূপ।

সপ্তমাপরাধঃ--অশ্রদ্দধানেষু নামোপদেশঃ।

প্রহ্লাদঃ---

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-

স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।

নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো

ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযুথপায়।। (ভাঃ ৭।৯।৯)

অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। ধন, অভিজন, রূপ, তপ, শ্রুত, ওজ, তেজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ ও বুদ্ধিযোগ---এই সকল পরম পুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না। দীন ব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য। গজ-যুথপতির শ্রদ্ধাজাত ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-

পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।।

(ভাঃ ৭।৯।১০)

দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎপদারবিন্দবিমুখ হন অর্থাৎ কৃষ্ণে শ্রদ্ধাহীন হন, (তাহা হইলে) তাহা অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া

আমি জানি; কেন না (ভক্ত) তাঁহার মন, বচন, অর্থ ও প্রাণ কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি আপন কুল-সহিত জগৎ পবিত্র করিতে পারেন। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণটী কৃষ্ণভক্তির অভাবে স্বীয় কুল ও জগৎ পবিত্র করা দূরে থাকুক, আপনাকেও পবিত্র করিতে পারেন না।

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলোভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ।। (ভাঃ ৭।৯।১১)

কৃষ্ণ নিজলাভপূর্ণ। কৃষ্ণনামে অশ্রদ্দধান মায়াবাদী অপণ্ডিত লোকের উপাসনা তিনি গ্রহণ করেন না, যেহেতু তিনি (ভগবান্) কেবল শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের প্রতি করুণ। অতএব ভক্ত নিজ প্রভু ভগবানের যে পূজা করেন তাহা পরম প্রিয় বলিয়া কৃষ্ণকে দেন। তদনুসারে নিজের মুখে প্রতিমুখশ্রীরূপ উদয় হয়।

নাম্নো বলাৎ পাপাচারবুদ্ধিরেব অষ্টমাপরাধঃ।

পরীক্ষিৎ শুকম্—

ক্বচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎ পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ।।

(ভাঃ ৬।১।১০)

নারদঃ—

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ।।

(ভাঃ ৭।১৫।৩৬)

(মানব) নাম-গ্রহণাদি পরম প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। আবার প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই পাপ আচরণ করে, তাহার পক্ষে আর কি প্রায়শ্চিত্ত? তাহার কুঞ্জর-স্নানের ন্যায় সকলই বৃথা। নারদ বলেন, যিনি ত্রিবর্গ-সমাপ্তি করিয়া মোক্ষপথে হরিনাম লইলেন, তিনি ত্যাগী হইয়া (যদি) আবার স্ত্রীসঙ্গ গ্রহণ করেন, (তাহা হইলে) তিনি নির্লজ্জ বান্তাশী।

আলস্যবিক্ষেপাত্মকপ্রমাদঃ নবমাপরাধঃ।

পরীক্ষিতম্---

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্।। (ভাঃ ২।২।৩৬)

হে পরীক্ষিৎ! প্রমাদ অনবধানে আলস্য--বিক্ষেপাদি ঘটিলে নামে জ্ঞানপূর্বক হেলা হয়, অতএব সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া সর্বত্র সর্বসময়ে ভগবান্ হরির নামাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ কর। তাহা হইলে নিরপরাধে নাম করিতে পারিবে।

পরীক্ষিৎ শুকম্---

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।

করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্।। (ভাঃ ৬।১।৯)

দৃষ্ট (বিশ্বে) শ্রুত (অন্যত্র) যে সকল পাপ হয়, সে সমস্ত পাপের নিষ্কৃতি হরিনামে হইয়া থাকে, এই মহিমা জানিয়াও যিনি 'অহং মম' অভিমানে তাহাতে প্রীতি করেন না, তিনি নামাপরাধী; তাঁহার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি?

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি।

এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে।। (ভাঃ ৬।১।১২)

নিয়ম করিয়া অন্নাদি পথ্য গ্রহণ না করিলে ব্যাধি ক্রমশঃ বলবান্ হয়। সেইরূপে সংখ্যাদি নিয়ম করিয়া হরিনাম স্মরণ, কীর্তন না করিলে কিরূপে ক্ষেম হইবে? হরিনাম-গ্রহণে নিয়ম এই যে, নিষ্কপটে নিরপরাধে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিরন্তর নাম করিবে। নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্মরণাদির ক্রম-নিয়মই ক্ষেমজনক।

যমঃ দূতান্ নামগ্রহণস্য নিত্যতা---

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং

চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।

কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি

তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্।। (ভাঃ ৬।৩।২৯)

অতএব যমদূতদিগকে যম এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—হে দূতগণ! যাহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম-গুণ কীর্তন না করে, যাহার চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ না করে, যাহার মস্তক একবারও কৃষ্ণকে নমস্কার না করে, সেইরূপ অসৎ লোককে--- কিছুমাত্র ভক্তিকার্য করে নাই জানিয়া আমার নিকট আন।

চিত্রকেতুঃ ভগবন্তম্---

> ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
> যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।।

(ভাঃ ৬।১৬।৪৪)

আপনার দর্শনে জীবের অখিল পাপ ক্ষয় হয়, ইহা অবশ্যই ঘটিবে। আপনার নাম একবার স্মরণ করিলে পুক্কশও সংসার হইতে মুক্ত হয়।

ভক্তানাং প্রার্থনা। পৃথুর্ভগবন্তম্---

> ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
> মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ।।

(ভাঃ ৪।২০।২৪)

ভক্ত মাত্রেরই কৃষ্ণনাম শ্রবণে রুচি হয়। হে নাথ! যাহাতে তোমার চরণাম্বুজাসব নাই, আমি তাহা কখনই কামনা করি না। তোমার মহদ্ভক্তগণের হৃদয় হইতে মুখচ্যুত যে হরিনাম, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ দেও, এই একটি আমি প্রার্থনা করি।

নবধা ভক্তি

শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে।।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা বৈধী ভক্তি যিনি শ্রদ্ধা সহকারে অনুদিন অনুশীলন করেন, তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত বর্ণনাদির শ্রোত্রস্পর্শের নাম 'শ্রবণ'। শ্রবণের দুই অবস্থা---শ্রদ্ধার উদয়ের পূর্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণানুবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা এক প্রকার শ্রবণ; সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়; শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তদনন্তর গুরুবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত যে কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ। শ্রবণ শুদ্ধভক্তিরই একটী অঙ্গ। সাধনকালে গুরুবৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধিকালের শ্রবণ উদিত হয়; শ্রবণই ভক্তির প্রথমাঙ্গ।

ভগবন্নাম, রূপ, গুণ ও লীলাময় শব্দসকলের জিহ্বাস্পর্শের নাম কীর্তন; কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম সামান্যতঃ বর্ণন, শাস্ত্রপাঠদ্বারা অপরকে শুনান ও গীতদ্বারা সকলকে আকর্ষণ, তথা দৈন্যোক্তি-বিজ্ঞপ্তি স্তবপাঠ-প্রার্থনাদি--এই সকল কীর্তনের প্রকার। অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্তনই শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ কলিযুগে কীর্তনই সকল জীবের মঙ্গল-সম্পাদনে সমর্থ--ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে---

(যথা বিষ্ণুপুরাণ)---

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্।।

কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চনদ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিতে একমাত্র কৃষ্ণের সম্যক্ অর্থাৎ অপরাধশূন্য কীর্তনদ্বারা সেই

প্রয়োজন লাভ করা যায়। হরিকীর্তনে যেরূপ চিত্তের নৈর্মল্য সাধিত হয়, এরূপ আর কোন উপায়েই হয় না। অনেক ভক্ত একত্রিত হইয়া যখন কীর্তন করেন, তখন 'সংকীর্তন' হয়।

কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ লীলা-স্মরণের নাম 'স্মরণ'। স্মরণ পঞ্চবিধ যৎকিঞ্চিৎ 'অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'; পূর্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করতঃ সামান্যাকারে মনোধারণের নাম 'ধারণা'; বিশেষরূপ রূপাদিচিন্তনের নাম 'ধ্যান'; অমৃতধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয়মাত্র স্ফূর্তির নাম 'সমাধি'। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-এই তিনটি ভক্তির প্রধান অঙ্গ; অন্য সকল অঙ্গ ইহার অন্তর্ভূত। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ---এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্তন সর্বপ্রধান; যেহেতু, শ্রবণ ও স্মরণ কীর্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।" এই বচনানুসারে 'পাদসেবা' বা 'পরিচর্যা' ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণসহকারে পাদসেবা কর্তব্য। পাদসেবা-কার্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব ও সেবায় অযোগ্যত্ব বুদ্ধি এবং সেব্য-বস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজন। পাদসেবা-কার্যে শ্রীমুখদর্শন,স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা মথুরা নবদ্বীপাদি তীর্থস্থান-দর্শনাদি অন্তভাব্য। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তির ৬৪-অঙ্গ বর্ণন-প্রসঙ্গে এই সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীতুলসীসেবা ও সাধুসেবা---এই অঙ্গের অন্তর্ভূত।

পঞ্চম অঙ্গ 'অর্চন'। অর্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া বিচার অনেক। শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়পূর্বক মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অর্চন প্রক্রিয়া করিবে।

শ্রীভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন। নামে 'নমঃ' শব্দাদি সংযোগ করতঃ ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনপূর্বক ঋষিগণ কোন শক্তিবিশেষ নাম হইতে উদঘাটন করিয়াছেন। নামই নিরপেক্ষ তত্ত্ব, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদর্য-বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত-সঙ্কোচ করণাভিপ্রায়ে মর্যাদামার্গে স-মন্ত্রার্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ীলোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে "সিদ্ধ সাধ্য-সুসিদ্ধাদি" বিচারের প্রয়োজন নাই। (শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের প্রথম বিলাসে সিদ্ধ সাধ্যাদি শোধন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।) কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাই

জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর; জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্রাপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল। সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র লাভ করিবামাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চনাঙ্গসকল বলিয়া থাকেন; সে সমস্ত এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণজন্ম, কার্তিক ব্রত, একাদশী ব্রত, মাঘস্নানাদি অর্চনমার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চন-বিষয়ে একটি বিশেষ, কথা আছে কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চন নিতান্ত প্রয়োজন।

'বন্দন'ই বৈধ-ভক্তির ষষ্ঠ অঙ্গ; পাদসেবা ও কীর্তনাদির মধ্যে 'বন্দন' অন্তর্ভূত থাকিলেও তাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন; সেই নমস্কার দ্বিবিধ---পঞ্চাঙ্গ নমস্কার ও অষ্টাঙ্গ নমস্কার। নমস্কারে একহস্ত কৃত নমস্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে পৃষ্ঠে ও বামভাগে এবং মন্দিরের অত্যন্ত নিকটগর্ভে নমস্কার অপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে।

'দাস্য'ই সপ্তম অঙ্গ। 'আমি কৃষ্ণদাস'---এইরূপ অভিমানই দাস্য। দাস্য-সম্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই শ্রেষ্ঠ। নমঃ, স্তুতি, সর্বকর্মার্পণ, পরিচর্যা, আচরণ, স্মৃতি, কথা শ্রবণ ইত্যাদি দাস্যের অন্তর্ভাব্য।

'সখ্য'ই অষ্টম অঙ্গ। কৃষ্ণের হিত-চেষ্টাময় বন্ধুভাবলক্ষণই সখ্য। সখ্য দুই প্রকার---বৈধাঙ্গ সখ্য ও রাগাঙ্গ সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সখ্য গ্রহণ করিতে হইবে। অর্চামূর্তি-সেবায় যে সখ্য সম্ভব হয়, তাহাই বৈধ সখ্য।

'আত্মনিবেদন'কে নবম অঙ্গ বলা যায়। দেহাদি শুদ্ধাত্মা-পর্যন্ত কৃষ্ণে অর্পণ করার নামই আত্মনিবেদন। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ, বিক্রীত গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ; বৈধ আত্মনিবেদনের উদাহরণ, যথা (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে।।
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।

ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে।।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ।।

মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানু-বর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জনাদিতে, কর্ণদ্বয় কৃষ্ণকথা শ্রবণে, চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্তিদর্শনে, অঙ্গ কৃষ্ণকৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে, পদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে, মস্তক হৃষীকেশের চরণে প্রণতি-কার্যে,কাম কামনারহিত বিষ্ণুদাস্যে এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বল-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি, পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দনিচন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩২)

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, যাঁহার বিগ্রহ---আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত-ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন (গ্রহণ বা ধারণ) করেন।

চিদাস্বাদ-অভাবে জড়জ্ঞানে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের একটি বিষম সংশয় উদিত হয়। কৃষ্ণলীলা বর্ণন শুনিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, জড়গত ভাব হইতে কল্পনা-শক্তি-দ্বারা পণ্ডিত-লোকেরা কৃষ্ণতত্ত্বের কল্পনা করিয়াছেন। এই অনর্থজনক সংশয় ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে, ব্রহ্মা এই শ্লোক ও ইহার পরবর্তী আরও তিনটি শ্লোকে চিদচিৎ পদার্থদ্বয়কে তাত্ত্বিকরূপে পৃথক করিয়া শুদ্ধ-সমাধিপ্রাপ্ত কৃষ্ণলীলা বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিতেছেন। ব্রহ্মার আশয় এই যে, কৃষ্ণবিগ্রহ--সচ্চিদানন্দময়, আর মায়িক সমস্ত প্রতীতিই জড়-তমোময়ী। তদুভয়ের বিশেষগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও, মূলতত্ত্ব এই যে, চিদ্ব্যাপারই মূল-পদার্থ; বিশেষ ও বিচিত্রতা—তাঁহাতে নিত্য বর্তমান। তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চিন্ময়-ধাম, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম, গুণ ও লীলা প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ চিদ্‌বুদ্ধিবিশিষ্ট ও মায়া-সম্বন্ধ-রহিত জনের পক্ষেই সেই লীলা আস্বাদনীয়া। চিদ্ধাম, চিচ্ছক্তিপ্রকাশিত-চিন্তামণি-গঠিত লীলাপীঠ এবং কৃষ্ণ বিগ্রহ সমস্তই চিন্ময়। চিচ্ছক্তির ছায়া যেরূপ মায়াশক্তি, মায়া-গঠিত বিচিত্রতাও তদ্রূপ চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন বা ছায়া সুতরাং চিৎ-তত্ত্বের বিচিত্রতার সাদৃশ্যই মায়িক জগতে লক্ষিত হয়। উভয় বিচিত্রতার সাদৃশ্য থাকিলেও উহারা---পরস্পর বিলক্ষণ। জড়ের হেয়ত্বই জড়ের দোষ, কিন্তু চিৎ-তত্ত্বে সেই দোষশূন্যা বিচিত্রতা আছে। কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ পরস্পর পৃথক্ নয়। জড়বদ্ধ জীবের দেহ ও আত্মা--পৃথক্ পৃথক্। চিৎস্বরূপে দেহ-দেহী, অঙ্গ-অঙ্গী, ধর্ম-ধর্মীর ভেদ নাই, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবে তাহা আছে। কৃষ্ণ 'অঙ্গী' হইলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ-কৃষ্ণ; সমস্ত চিদ্‌বৃত্তি তাঁহার সমস্ত অঙ্গে

আছে। সুতরাং তিনি--অখণ্ড পূর্ণ চিৎতত্ত্ব। জীবাত্মা ও কৃষ্ণ--উভয়েই চিৎস্বরূপ, সুতরাং একপ্রকার; কিন্তু উভয়ে ভেদ এই যে, ঐ-সমস্ত চিদ্গুণসমূহ---জীবাত্মা-স্বরূপে অণুরূপে এবং কৃষ্ণে বিভুরূপে বর্তমান। জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে ঐ প্রকার গুণগণ তাহাতে অণুরূপে প্রকাশ পাইবে। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে চিদাহ্লাদিনীর বল আবির্ভূত হইলে জীবেরও আনন্ত্য-সাম্য-সিদ্ধি হয়, তথাপি কোন কোন বিশেষগুণবশতঃ কৃষ্ণই সর্বোপাস্য হন। সেই বিশেষ গুণ চতুষ্টয় পরব্যোমাধিপতি বা পুরুষাবতারে প্রকটিত হয় নাই; গিরীশাদি দেবতাতে ত' নাই,---জীবের কথা দূরে থাকুক।

বেদেরও অগম্য শুদ্ধভক্তিলভ্য শ্রীগোবিন্দ

"অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপমাদ্যং
পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা)

বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। তিনি---অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হইয়াও সর্বদা নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ।

'অদ্বৈত' অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান অখণ্ড-তত্ত্ব; অনন্ত-ব্রহ্ম প্রভারূপে বহির্গত হইলেও এবং অংশরূপে পরমাত্মরূপ ঈশ্বর বাহির হইলেও তিনি---'অখণ্ড'; অচ্যুত' অর্থাৎ স্বাংশরূপে কোটি-কোটি অবতার বাহির হইলেও এবং বিভিন্নাংশরূপে অনন্ত-কোটি জীব নিঃসৃত হইলেও তিনি---'পরমপূর্ণ' জন্মাদিলীলা প্রকট করিয়াও তিনি---'অনাদি'; প্রকট লীলা অপ্রকট করিয়াও তিনি---'অনন্ত'; অনাদি হইয়াও তিনি---প্রকট লীলায় ('আদ্য') (জন্ম) আদি বিশিষ্ট; এবং বস্তুতঃ 'সনাতন' পুরুষ হইয়াও তিনি---নিত্য-নবযৌবনাঢ্য। মূল তাৎপর্য এই যে, তিনি বহুবিধ বিরুদ্ধ-গুণযুক্ত হইলেও সেই গুণচয় সর্বত্র অচিন্ত্য শক্তি-দ্বারা সমঞ্জস; —ইহাই চিদ্ধর্ম অর্থাৎ জড়-বিলক্ষণ ধর্মবিশেষ। তাঁহার সুন্দর মুরলীধর শ্যাম ত্রিভঙ্গ মূর্তি--সর্বদাই নবযৌবনসম্পন্ন এবং মায়াতে যে কাল ও দেশ ব্যবধান আছে, তাহাদের হেয়ত্বের অতীত। ভূত ও ভবিষ্যৎ-শূন্য শুদ্ধ বর্তমান কালই চিদ্ধামে বিরাজমান। ধর্ম ধর্মী-ভেদে যে জড়দেশের পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদ,তাহা চিদ্ব্যাপারে নাই। সুতরাং যে সকল ধর্ম জড়জগতে মায়িকদেশ কালাবচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা অবিরুদ্ধভাবে চিজ্জগতে উপাদেয়রূপে বর্তমান। এই প্রকার অভূতপূর্ব সত্তা জীব কিরূপে অনুভব করে? জীবের মায়িক জ্ঞান-বৃত্তি সর্বদাই দেশকালাদি-দোষে দূষিত হইয়া মায়িকভাব-পরিত্যাগে অসমর্থ। জ্ঞানবৃত্তি যদি 'চিৎ' উপলব্ধি না করে, তবে কোন বৃত্তি সেই শুদ্ধ চিদ্বিশেষের অনুভব করে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, চিদ্ব্যাপার বেদের অগম্য।

বেদ শব্দমূলক এবং শব্দ প্রকৃতিমূলক; সুতরাং বেদ সাক্ষাদ্‌রূপে অপ্রাকৃত-গোলোক দেখাইতে পারেন না বেদ যখন চিচ্ছক্তিভাবিত হন, তখনই (তদ্বিষয়ে) কিয়ৎ পরিমাণে বলেন। কিন্তু জীবমাত্রই সেই চিচ্ছক্তির হলাদিনী-সার-সমবেত সম্বিচ্ছক্তির প্রভাবের (যাহা জীবে ভক্তিবৃত্তিরূপে উদিত হয় তাহার) দ্বারা গোলোকের স্ফূর্তি পাইতে পারেন। ভক্তির হ্লাদিনী বৃত্তি-অসীম; তাহা---শুদ্ধ চিদ্‌জ্ঞানময়ী সেই জ্ঞান, ভক্তির সহিত একাত্মভাবে অর্থাৎ পৃথক্ জ্ঞানত্বের পরিচয় না দিয়া, কেবল ভক্তির পরিচয়ে, গোলোক-তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন।

অবিচিন্ত্যতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম যোগী ও জ্ঞানিগণের দুর্লভ

"পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপাস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৪)

---সেই প্রাকৃত-চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়মন-পথ অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চারূপ পন্থা শত-কোটি বৎসর চলিয়াও যাঁহার (যে অবিচন্ত্যতত্ত্বের) চরণারবিন্দে অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শুদ্ধভক্তির আস্বাদনই---গোবিন্দের চরণারবিন্দ লাভ। অষ্টাঙ্গ-যোগিগণ শত-কোটি বৎসর যাবৎ সমাধিক্রমে যে 'কৈবল্য' লাভ করেন এবং অদ্বৈতবাদি-মুনিশ্রেষ্ঠগণও তৎসংখ্যক-কাল চিদচিদ বিচার করিতে বসিয়া 'ইহা নয়, ইহা নয়' এইরূপে মায়িক-বস্তু একটি একটি করিয়া পরিত্যাগ করতঃ অবশেষে যে নির্বিশেষ-চিন্তারূপ মায়াতীত নির্ভেদ-ব্রহ্মে লয় লাভ করেন, তাহা---কৃষ্ণের চরণকমলের অগ্রভাগের বহিঃস্থিত প্রদেশমাত্র, চরণকমল নয়। মূল কথা এই যে, 'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়'---মায়িক জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্যসীমা; কেননা, ঐ দুই অবস্থা অতিক্রম না করিলে চিদ্বিশেষের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। সে সকল অবস্থা--কেবল মায়িকসম্বন্ধ-জনিত দুঃখের অভাব-মাত্র, সুখ নয়। যদি সেই কষ্টভাবকে কিয়ৎপরিমাণ 'সুখ' বলা যায়,তাহা হইলেও উহা---অত্যল্প ও তুচ্ছ। প্রাকৃত-অবস্থা নাশ করিলেই যে যথেষ্ট হয়,তাহা নয়; কিন্তু জীবের অপ্রাকৃত অবস্থায় স্থিতি লাভই লাভ। তাহা কেবল চিৎস্বরূপা ভক্তির কৃপাতেই পাওয়া যায়, নীরস চিন্তামার্গে পাওয়া যায় না।

পুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

'স্মার্ত'-'পরমার্থ'-ভেদে বৈদিক আর্য-শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত-বিভাগে অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ 'পরমার্থ'-শাস্ত্রে রুচিপ্রাপ্ত ন'ন। নিজ নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার, সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্তগণ নিজ নিজ রুচি-সম্মত শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক-শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ আস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্তা-বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সে উদ্দেশ্য এই—স্বীয় স্বীয় অধিকারে, স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্মানুসারে কর্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকারবশে দ্বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে-পর্যন্ত মানবের কর্মাধিকার থাকে, সে পর্যন্ত তাঁহার স্মার্ত-পথই শ্রেয়ঃ। কর্মাধিকার অতিক্রম করতঃ যখন তিনি ভক্তি-অধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত-পরমার্থ-ভেদে বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্বদা কর্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমত কি, সেই সকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেক স্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুই প্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবগণের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র, স্মার্ত-পরমার্থ-ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

বৎসরকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিয়া, দ্বাদশ মাসে স্মার্ত-শাস্ত্রে সর্ব-সৎকর্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্মই যখন দ্বাদশমাসে বিভক্ত হইল, তখন অধিমাস কর্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সৎকর্ম নাই। চান্দ্রমাস ও সৌর মাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। * সেই মাসটীর নাম অধিবাস। স্মার্তগণ অধিমাসকে মলমাস বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। মলিম্লুচ (চোর), মলিন মাস ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ কার্যে সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন অনিত্য। জীবনের কোন অংশইত বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্বদা সর্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক--ইহাই পরমার্থ-শাস্ত্রের নিগূঢ়-চেষ্টা। আবার যখন কর্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সৎকর্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্বজীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন যে, হে জীব! কেন অধিমাসে হরিভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্‌গোলোক-নাথ কর্তৃক সর্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমত কি, কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি-মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণার্চন কর, সমস্ত লাভ হইবে।

নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। দ্বাদশ মাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বহুকষ্টে বৈকুণ্ঠে গমন করতঃ নিজ দুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্তি শ্রবণ করতঃ দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

"অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্বে যে যে গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ।।
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্বে মাসাঃ সকামাশ্চ নিষ্কামোঽয়ং ময়া কৃতঃ।।
অকামঃ সর্বকামো বা যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যতাসংশয়ম্।।
কদাচিন্ময়ম ভক্তানামপরাধেতি গণ্যতে।
পুরুষোত্তম-ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন।।

য এতস্মিন্মহামূঢ়া জগদানাদিবর্জিতাঃ।

সৎকর্ম-স্নানরহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ।।

জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পর-ভাগ্যোপজীবিনঃ।

ন কদাচিৎ সুখং তেষাং স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ।।

যেনাহমর্চিতো ভক্ত্যা মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তম।

ধন পুত্র-সুখং ভুংক্ত্বা পশ্চাদ্ গোলোকবাসভাক্।।"

ইহার অর্থ এই যে,---হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও লোকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল। এই মাস জগৎপূজা ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। এই মাসটী নিষ্কাম। যিনি অকাম হইয়া বা সর্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হ'ন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, এই পুরুষোত্তম মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে-সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপদানাদি-বর্জিত, সৎকর্ম স্নানাদিরহিত এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই সকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তম-মাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক অর্চনা করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি সুখ ভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হ'ন।

পুরুষোত্তম-মাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। দ্রৌপদী পূর্বজন্মে 'মেধা'-ঋষির কন্যা ছিলেন। দুর্বাসা-প্রোক্ত 'পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য' শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে সে জন্মে কষ্ট ও দ্রৌপদী জন্মে পঞ্চপতির অধীন হ'ন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত 'পুরুষোত্তম-মাস'ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস-দুঃখের পার প্রাপ্ত হ'ন।

যথা---

"এবং সর্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।

পুরুষোত্তম-মাসাদ্য -ব্রতং চেরুবিধানতঃ।।

তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গত কন্টকম্।

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপয়া মুনে।।"

দৃঢ়ধন্বা রাজার জন্ম-বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাস মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। বাল্মীকি মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রশ্নমতে যে ব্রত-প্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা নারদ শ্রীনারায়ণ-ঋষির নিকট বদরিকাশ্রমে শ্রবণ করেন। ধর্ম-শাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিক-বিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্তব্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন—

"সমুদ্রগা-নদী স্নানমূত্তমং পরিকীর্তিতম্।

বাপী-কূপ-তড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ।

গৃহে স্নানং তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্তিতম্।।"

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রতী স্নান করিয়া--

"সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্যাদাচমন-ক্রিয়াম্।

আচম্য তিলকং কুর্যাদ গোপী-চন্দন-মৃৎস্নয়া।।

উর্ধ্বপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।

শঙ্খ-চক্রাদিকং ধার্য গোপীচন্দন-মৃৎস্নয়া।।"

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাই পুরুষোত্তম-মাসে কর্তব্য, যথা—

"পুরুষোত্তম-মাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।

তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্।।"

বাল্মীকি কহিলেন,—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তম মাসের অধিদেবতা। অতএব সেই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শ-উপচারে পূজা করিবে। যথা—

'ষোড়শোপচারৈশ্চ পুজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।'

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্তব্য,যথা—

"আগচ্ছ দেব দেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।

রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ-পূজনং মম।।"

এই শাস্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-সম্বন্ধে পূর্বে যে সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্ত সর্ব-বর্ণধর্মপরায়ণ ধার্মিক লোকের পালনীয়। গ্রন্থ-শেষে নৈমিষ-ক্ষেত্রে, শ্রীসূতগোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন---

"ভারতে জনুরাসাদ্য পরুষোত্তমমূত্তমম্।
ন সেবন্তে ন শৃণ্বন্তি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ।।
গতাগতং ভজন্তেঽত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্র-মিত্র-কলত্রাপ্ত-বিয়োগাদ্দুঃখভাগিনঃ।।
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রানুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎপর-শয্যায়াং নালপেৎ বিতথং ক্বচিৎ।।
পরাপবাদান্ন কথঞ্চিৎ কদাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্বীত পরক্রিয়াম্।।"

ভারতে জন্মলাভ করতঃ গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত-কথা-শ্রবণ এবং ঐ ব্রত পালন করে না। দুর্ভাগাগণ জন্মজন্ম মরণ-ভোগ করে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্র ও নিজজনের বিয়োগ-জনিত দুঃখভোগী হয়। এই পুরুষোত্তম মাসে, হে দ্বিজবরগণ! বৃথা কাব্যালঙ্কারাদি অসৎ-শাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পর-শয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্যালাপ করিবে না। পরান্ন ভোজন ও পরকার্য করিবে না।

"বিত্তশাঠ্যমকুর্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিদ্যমানে ধনে শাঠ্যং কুর্বাণো রৌরবং ব্রজেৎ।।
দিনে দিনে দ্বিজেন্দ্রায় দত্ত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ।।
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্।।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সংসেব্য পুরুষোত্তমঃ।
সর্বসাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বার্থফলদায়কঃ।।
গোবর্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।

গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং গোপিকাপ্রিয়ম্।।

কৌণ্ডিন্যেন পুরা প্রোক্তমিমং মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।

জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ।।

ধ্যায়েন্নবঘনশ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।

লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরষোত্তমম্।।

ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমম্।

এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্বমাপ্নুয়াৎ।।"

বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিলে শাঠ্য করা রৌরব গমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও ভগীরথ পুরুষোত্তম-আরাধনা করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তম-সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তম সেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বার্থফলদায়িকা। 'গোবর্ধনধরং' প্রভৃতি মন্ত্রটী পূর্বে কৌণ্ডিন্য মুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র ভক্তিপূর্বক শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে জপ করিয়া পুরুষোত্তম প্রাপ্ত হইবে। নব-ঘন দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিয়ত ধ্যান করিতে করিতে পুরুষোত্তম-মাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তি পূর্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

পরমার্থী তিনপ্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য-সকল স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষে বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য-নির্দিষ্ট 'কার্ত্তিক-মাস-ব্রত-পালন'-নিয়মানুসারে 'পুরুষোত্তম-ব্রত' পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তি দ্বারা 'শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সেবন' নিয়মের সহিত অহরহ সাধ্যানুসারে 'শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্তন'-দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাসগুলি যাপন করিয়া থাকেন। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চরমোপদেশের বিষ্ণু-রহস্য বাক্য—

ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বসক্তানাং সদৈব বিমলা মতিঃ।

পরিতোষয়তো বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ।।

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা, সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা, সর্ব-সময়েই স্বাভাবিকী ভক্তি-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন। উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্ত-শুদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ-সমাপ্ত করিয়াছেন,---

"এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।।
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠশ্রীমূর্তিরঙ্ঘ্রিসেবনে।
স্যাদিচ্ছেষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ।।
বিহিতিষ্বে নিতোষু প্রবর্তন্তে স্বয়ং হি তে।
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং লিখিতং হি তৎ।।"

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই অত্যন্ত প্রিয়। প্রায় তাঁহারা এই দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হ'ন না। পরম -প্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালনকরণে এতদূর আগ্রহ যে, অন্য কৃত্যসকল তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্ঘ্রিসেবা কোন বিশেষভাবের সহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়; সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রতার সহিত এবং স্বীয় রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ যে-সকল বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তী ভক্তদিগের বিধিবাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তি-ভাবই স্বভাবতঃ বর্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

ভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠিত ও একান্ত-ভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তম-মাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং অধিমাস ভক্তমাত্রেরই প্রিয়মাস, যেহেতু ঘটনাক্রমে ঐ মাসে কোন কর্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

শ্রীকৃষ্ণনাম

কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া জগতে কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কলিকালে হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন। তিনি সকলকেই কৃষ্ণনাম করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। "নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্তন" ইহাই তাঁহার শ্রীমুখ-আজ্ঞা। নদীয়াবিহারকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে নামপ্রচারকার্যে নিযুক্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ আজ্ঞা করিলেন,---

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।।
ইহা বহি আর না বলাবে না বলিবা।
দিন অবসানে আসি "আমারে কহিবা।।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে দুই জনে জীবের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে লাগিলেন; যথা, শ্রীচৈতন্যভাগবতে,----

"'আজ্ঞা পাই' দুইজনে বুলে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।।
কৃষ্ণ--প্রাণ, কৃষ্ণ--ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই হ'য়ে একমন।।"

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পূর্বদিন সকল ভক্তকেই শ্রীচরণে আকর্ষণ করিলেন। ভক্তগণ দণ্ডবৎ প্রণত হইলে এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।

"আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে।।
আর কৃষ্ণনাম লইতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।" ইত্যাদি।

শ্রীতপনমিশ্রকে প্রভু বলিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ)---

"কলিযুগধর্ম হয় নামসংকীর্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম জীবের কারণ।।

সাধ্যসাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।

হরিনামসংকীর্তনে মিলিবে সকল।।"

শ্রীবৃন্দাবনযাত্রাকালে মহাপ্রভু পশুপক্ষী স্থাবরজঙ্গমকেও কৃষ্ণনামে পাগল করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে),----

"প্রভু কহে---কৃষ্ণ কহ, ব্যাঘ্র উঠিলা।

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিলা।।

ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।

সঙ্গে চলে', কৃষ্ণ বলে, নাচে মত্ত হঞা।।

হরিবোল বলি' প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি।

বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি'।।

ঝারিখণ্ডে স্থাবরজঙ্গম, আছে যত।

কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।।"

কৃষ্ণনাম কি বস্তু, তাহা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিলেই জানা যায়। "নিরন্তর নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নহে পারে দিতে।।"—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই বাক্য সর্বক্ষণ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। অতিশয় মূর্খ আমরা, তাই মহাপ্রভু কৃপা করিয়া আমাদিগকে কষ্ণনাম দিয়াছেন। এখন প্রভুর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতে পারিলেই আমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুকে বেদান্ত শ্রবণ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে),---

"শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।

গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন।।

মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।

কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার।।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসারমোচন।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম।।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।।
এই তার বাক্য আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন করি।।
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।"

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কতদিনে আমরা নিরন্তর নাম করিতে সক্ষম হইব এবং নামের ফল প্রেমধন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিব? অপার কৃপাময় মহাপ্রভু আমাদিগকে স্বীয় সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত-কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়াছেন; আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ এমন নামে আমাদের রুচি হয় না। জীবোদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইয়া মহাপ্রভু নিজে নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিয়া আমাদিকে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার আচরণই আমাদিগের পালনীয়।

"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে।।"
"নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই নেত্রে অশ্রু বহে' গঙ্গাধারাপ্রায়।।
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় হরিদাস ঠাকুর নামতত্ত্বের আচার্য হইয়া অবতীর্ণ হন। আজীবন অপতিত ভাবে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিয়া তিনি জগতে নামমাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামরসার্ণবে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া হরিদাস ঠাকুর পাগলের ন্যায় কখনও হাস্য কখনও ক্রন্দন করিতে করিতে জগজ্জীবকে হরিনাম ধন বিতরণ করিয়াছেন।

"বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য।।

ক্ষণেকে গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা স্ফূর্ত্তি।।”

ভাবিয়া দেখিলে কৃষ্ণনাম অপেক্ষা সহজ সাধ্য বস্তু আর কিছুই নাই। যোগাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর, বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য প্রভৃতি কোন গোলই নাই, কেবল সরলভাবে সযতনে কৃষ্ণনাম করা; ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? তবে মুখে নামমাহাত্ম্যে গাঢ় বিশ্বাসের ভাব, জনসমাজে নামপ্রচার, কিন্তু অন্তরে অরুচি বা অন্য প্রক্রিয়ার প্রতি ঝোঁক থাকিলে কিরূপে সুফল উদয় হইবে? নিরপরাধে নাম করিলেই নামের ফল প্রেমধন লাভ হয়, কিন্তু তাহা না করিলে কিরূপে সে ফল লাভ হইবে? কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে না শাস্ত্রপাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্যে পর্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা নাম-মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নাম করেন না, তাঁহারা নিরপরাধী নহেন। অসৎসঙ্গ-জনিত হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাঁহাদের নামে রুচি হয় না; সে কারণ নামের নিকট তাঁহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামাশ্রয় করাই শুভ লক্ষণ। অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্নসহকারে নাম করিলে স্বল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নাম আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই সর্ব্ব শুভ উদয় হইতে আরম্ভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণনামব্যতীত আমাদের আর কোন ধনই নাই। কলিজীব অতিশয় দরিদ্র জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামরত্ন আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা যেন নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিতে পারি, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

“জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম।”

জীবে দয়া

জীবে দয়া বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান অংগ। জীবের প্রতি দয়া করা বৈষ্ণবের একটি স্বভাব। যাঁহাতে এই স্বভাব লক্ষিত না হয় তিনি সহস্র সহস্র বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন' ইহাই মাত্র বৈষ্ণবের কর্তব্য কর্ম বলিয়া শ্রীশচীনন্দন সর্বত্র শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। জীবের প্রতি বৈষ্ণবের দয়া বৈষ্ণবের অন্তঃকরণেই থাকে, তাহার বাহ্য পরিচয় কি ইহা জানিতে পারিলে উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাহার বাহ্য পরিচয় অনুশীলন করিতেছি। 'জীবে দয়া' এই কথাটি কেবল বদ্ধজীব সম্বন্ধে ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতি দয়া করিতে হয়। জীবের ক্লেশ দেখিয়া যে প্রবৃত্তি চিত্তে উদিত হইয়া জীবের আনুকূল্যে আর্দ্রতা উৎপন্ন করে তাহার নাম দয়া। ক্লেশ তিন প্রকার অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ, লিঙ্গদেহনিষ্ঠ ও স্থূলদেহনিষ্ঠ। অবিদ্যা-বন্ধন-জনিত স্বরূপভ্রমই আত্মনিষ্ঠ ক্লেশ। তাহাতেই জীবের স্বরপ যে কৃষ্ণদাস্য, তাহার বিস্মৃতি। ইহাই জীবের মূল ক্লেশ। মায়াবদ্ধ হইয়া মায়িক অহংকার, বুদ্ধি, চিত্ত ও মনকে জীব স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই তাঁহার লিঙ্গশরীর। জড়ীয় সত্তাতে আমি ও আমার বুদ্ধিকে মায়িক অহঙ্কার বলি। জড়ীয় বস্তুতে জ্ঞানাদি চর্চাই মায়িক বুদ্ধি। জড়ীয় জ্ঞানকে সংগ্রহ করিয়া ধারণ করার নাম মায়িক চিত্ত। জড়ীয় ধর্মের চিন্তা-বিচারের নাম মায়িক মন। এই অবস্থাটীই জীবের একটি ক্লেশ। এই স্থলে জড়ীয় পাপ-পুণ্যের উদয় ও বিচার। এই কার্য যত হয়, জীব ততই স্ব-স্বরূপ আত্মা হইতে সুদূরবর্তী হইয়া ক্লেশময় মায়িক জগতে অভিনিবিষ্ট হন। তাহার উপর মাতৃগর্ভ হইতে প্রাপ্ত জীবের স্থূল শরীর। স্থূল শরীরের অভাব, পীড়া, দণ্ড ও বাধ্যবাধকতা ঐ সমুদায়ই জীবের স্থূল-দেহ-নিষ্ঠ ক্লেশ। পাপাচরণ ত'ক্লেশই বটে। পুণ্যাচরণও আত্মার স্ব-স্বরূপ হইতে দূরবর্তী ক্রিয়া বলিয়া আপাততঃ শুভমধ্যে পরিগণিত হইলেও, ক্লেশ বটে। যিনি কৃষ্ণোন্মুখ জীব, তিনি এই সমস্ত ক্লেশ হইতে ক্রমশঃ শিথিলবন্ধন হইয়া কৃষ্ণানুশীলন সুখ ভোগ করিতে থাকেন। নিজের যত সুবিধা হইতে থাকে তিনি অন্যান্য ক্লিষ্ট জীবের দুঃখে ততই আর্দ্র হইতে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করেন, আর কেন অন্য জীব সকল ক্লেশবন্ধনে মুগ্ধপ্রায় হইয়া আছেন, আমি তাঁহাদেব

ত্রিবিধ ক্লেশের অপনোদন করিতে যত্ন করিব। তখন তিনি নিজ কার্য্য না থাকিলেও সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া কৃষ্ণনামে রুচি উৎপাদনের যত্ন করিয়া থাকেন। এইটি বৈষ্ণব মাত্রেরই স্বভাব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর।।"

তিনি তখন দ্বারে দ্বারে গিয়ে এইরূপ বলিতে থাকেন,—

শ্রদ্ধাবান্ জন হে!
নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।।
প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা।।
অপরাধ শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণপিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্বধর্মসার।।

দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটি জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ কার্যে বিশেষ সুখলাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তি উদয় হয় না। তৎকার্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত 'জীবে দয়া'র একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য। যে স্থলে স্থূল শরীরের রোগনিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই। যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিছু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সব কার্য দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে সেখানে তত্তৎকার্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়। মধ্যম অধিকারী বা উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব হইলে, এই 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হয়। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের এ প্রবৃত্তি প্রথমে থাকে না। বৈষ্ণবকৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি বৈষ্ণবপদবাচ্য হন এবং 'জীবে দয়া' তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। সর্বোচ্চ বৈষ্ণবদিগের 'জীবে দয়া' অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন,—

'জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ। সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।'

মাৎসর্য্য

মাৎসর্য্য—শব্দটী অনেক স্থানে অনেক অর্থে সংযুক্ত হয়। পরশুভদ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা, অসূয়া ও ঈর্ষা ইত্যাদি নানা অর্থ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে যে স্থলে মাৎসর্য্য-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তদ্দ্বারা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবকে বুঝিতে হয়। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" এই ভাগবত-বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পরম ধর্ম্মের অধিকারী নিরূপিত হইয়াছে। প্রেমরসই ঐ শাস্ত্রের নিদিষ্ট পরম ধর্ম্ম। যিনি নির্ম্ম'ৎসর, তিনি ঐ ধর্ম্মের অধিকারী। মাৎসর্য্যশূন্যতার নাম নির্ম্মৎসরতা। যদিও টীকাকার মহোদয় পরের সুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়াকে মৎসরতা বলিয়া অর্থ করিয়াছেন তথাপি উক্ত শব্দের বিস্তীর্ণরূপ অর্থ প্রকাশ না করিলে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অবিদ্যাবদ্ধ জীব ষড়্‌বর্গ-রূপ রজ্জুদ্বারা জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টীকে ষড়্‌বর্গ বলে। ইহারা অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষরূপ পঞ্চ ক্লেশের অবস্থান্তর। জড়বস্তুতে অভিনিবেশ হইতে কামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (২।৬২-৬৩) কথিত হইয়াছে,—

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।

বিষয়াভিনিবেশরূপ সঙ্গ হইতে কাম উৎপত্তি হয় কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ অন্যায়রূপে বিষয়লোভ, বিষয়লোভ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ মোহ , মোহ হইতে বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মদ, মদ হইতে বিনাশ অর্থাৎ জীবের বিকৃতিরূপ মাৎসর্য্য হয়। (উপদেশস্থলে কথিত হইয়াছে, (গীতা ৩/৪৩)—

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।

বুদ্ধির অতীত যে চিদঘন জীব, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা সিদ্ধান্তদ্বারা মনকে বশীভূত করত দুর্দ্ধর্ষ কামরূপ শত্রুকে জয় কর।

এই সমস্ত উপদেশদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, স্ব-স্বরূপভ্রম হইতে কামরূপ অঙ্কুর ক্রমশঃ মাৎসর্য্য রূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া জৈবধর্ম্ম যে প্রেম, তাহাকে সুদূরবর্ত্তি করিয়াছে। ক্রোধে কাম আছে। লোভে ক্রোধ ও কাম আছে। মোহতে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মাৎসর্য্যে মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মদ-শব্দে ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ প্রভৃতি ছয় প্রকার মদই বুঝিতে হইবে।

জীবের সমস্ত ক্লেশই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। অবিদ্যা, পাপবাসনা ও পাপ, তথা অবিদ্যা, পুণ্যবাসনা ও পুণ্য এ সমস্তই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবারূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিকে এবং মাৎসর্য্য একদিকে অবস্থিতি করে। যিনি পর সুখে দুঃখী তিনি কখনই জীবে দয়া করেন না। ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরস ভাব উদয় হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গজনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে। যিনি মাৎসর্য্যশূন্য, তিনিই তৃণাদপি শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু (শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোকে) বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তির ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ ও জড়ীয়বলমদ থাকে না; অতএব তিনি আপনাকে তৃণ অপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন। মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তির ক্রোধতীব্রতা ও পরহিংসা থাকে না, অতএব তিনি বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু অর্থাৎ পরম দয়ালু। জাতি-বিদ্যা-মদাদি-রহিত নির্ম্মৎসর পুরুষ সমস্তগুণসম্পন্ন হইয়াও প্রতিষ্ঠাশাশূন্য; অতএব তিনি অমানী। নির্ম্মৎসর পুরুষ পরসুখে সুখী ও পরদুঃখে দুঃখী; অতএব সর্ব্বজীবে তিনি যথাযোগ্য মান বিধান করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ দয়ার দ্বারা সর্ব্বজীবে সম্মান, সম্মানের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায় ভদ্র জীবে তর্পণ ও চরণপূজাদ্বারা বৈষ্ণবসেবা বিধান করেন।

নির্ম্মৎসর পুরুষ স্বভাবতঃ---

১। সাধুনিন্দা করেন না।

২। কৃষ্ণৈকান্তিক-বুদ্ধি-সহকারে অন্যদেবে পৃথগ্ঈশ্বর-জ্ঞানশূন্য হইয়াও তত্তদ্দেবের প্রতি অবজ্ঞা করেন না।

৩। গুরুজনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা করেন।

৪। শ্রুত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রের সম্মান করেন।

৫। বৃথা তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম ও নামীর একত্ব বিশ্বাসে নামকে পরমার্থ বলিয়া স্থির করেন।

৬। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি করেন না।

৭। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ প্রভৃতি অন্য শুভকর্ম্মকে নামের সমান মনে করেন না।

৮। শ্রদ্ধাশূন্য ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার যত্ন করেন কিন্তু যতদিন শ্রদ্ধা হয় নাই, ততদিন তাহাকে নামোপদেশ করেন না।

৯। নামমাহাত্ম্য যাহা কিছু শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

১০। জড়সম্বন্ধে অহংতা-মমতা-শূন্য থাকেন।

হে পাঠকবর্গ! নির্ম্মৎসরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্য্যই জীবের বন্ধন।" অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (ম ৯/৩৬১) উক্ত হইয়াছে—

চৈতন্যচরিত্র শুন' শ্রদ্ধা ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি'।।

শ্রীকৃষ্ণানুশীলন

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যণ্ণাং 'ভগ' ইতীঙ্গনা।।"

সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য, জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব—এই ছয়টির নাম ভগ। যাঁহাতে ইহারা পুর্ণরূপে লক্ষিত হয়, তিনিই ভগবান। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবল গুণ সমষ্টি নন, কিন্তু কোন স্বরূপবিশেষ যাহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিকভাবে ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য ও শ্রী, ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটি গুণ, গুণরূপে দেদীপ্যমান আছে। ঐশ্বর্যাত্মক স্বরূপে, আস্বাদের পরিমাণ ক্ষুদ্র থাকায়, উহা অপেক্ষা সৌন্দর্যাত্মক স্বরূপটী অধিকতর আস্বাদকপ্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্যের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্যাদি আর পাঁচটি গুণ ঐ স্বরূপের গুণ-পরিচয়রূপে ন্যস্ত আছে। মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্যের মধ্যে স্বভাবতঃ একটী বিপর্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। যেখানে মাধুর্যের সমৃদ্ধি, সেখানে ঐশ্বর্যের খর্বতা। যেখানে ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধি, সেখানে মাধুর্যের খর্বতা। যে পরিমাণে একটি বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটী খর্ব হয়। মাধুর্যস্বরূপ-সম্বন্ধে চমৎকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বাদক-আস্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমানতা উভয় পক্ষের স্বীকৃত হয়। এবম্ভুত অবস্থায় আস্বাদ্য বস্তুর ঈশ্বরতা, ব্রহ্মতা ও পরমাত্মতার কিছুমাত্র খর্বতা হয় না। যেহেতু পরমতত্ত্ব স্বতঃ অবস্থাশূন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হন। মাধুর্যরসকদম্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়।

ঐশ্বর্যোদ্দেশব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান্ হইতে পারে কি না, এইরূপ পুর্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা-বর্ণনসময়ে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যথা—

কৃষ্ণ বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্।।

(ভাঃ ১০।২৯।১২)

উত্তমাধিকারপ্রাপ্তা রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণরাসপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ রাগানুগাগণ নির্গুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যানাদি গুণবিকারময়। মায়িক গুণ উপরতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন; কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, কেবল সর্বাকর্ষক কান্ত বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা কিরূপে তাঁহাদের গুণপ্রবাহের উপরম হইয়াছিল?

তদুত্তরে শ্রীশুকদেব (ভাঃ ১০।২৯।১৩-১৪) কহিলেন; —

উক্তং পুরস্তাদেতং তে চৈদ্যং সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষিকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ।।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।।

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন অধোক্ষজের প্রতি যাঁহারা প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধিপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে সংশয় কি? যদি বল, ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা, এইরূপ ঐশ্বর্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে কিরূপে নিত্যমঙ্গল সম্ভব হইবে, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভগবৎসত্তার মাধুর্যময় স্বরূপ-অভিব্যক্তিই সর্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়োজনক। ঐশ্বর্যাদি ষড়্‌গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎ-সৌন্দর্যই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব কর্তৃক সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব তদবলম্বী উত্তমাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ উভয়েরই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। কোমল-শ্রদ্ধেয়রা সাধনবলে পাপ-পুণ্যাত্মক কর্মজ গুণময়সত্তা পরিত্যাগপূর্বক উত্তম অধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত হন। কিন্তু উত্তমাধিকারিগণ উদ্দীপন উপলব্ধি মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণরাসমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

এতন্নিবন্ধন শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্দু গ্রন্থে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ—-অনুশীলন। কাহার অনুশীলন? ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা নারায়ণের? না ব্রহ্মের নয়, যেহেতু ব্রহ্ম নির্বিশেষ চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাহাতে

আশ্রয় পায় না। পরমাত্মারও নয়, যেহেতু ঐ তত্ত্ব যোগমার্গানুসন্ধেয়, ভক্তিমার্গের বিষয় নয়। নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু ভক্তির সকল প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে ভগবজ্ জ্ঞানের উদয়কালে, 'শান্ত'-নামক একটি রসের আবির্ভাব হয়। ঐ রস নারায়ণপর। কিন্তু ঐ রসটী উদাসীন ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভু-দাস-সম্বন্ধ-বোধ হইতে একটী 'দাস্য'-নামক রসের কার্য হইতে থাকে। নারায়ণ-তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেন না, নারায়ণস্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রসের আস্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এমত সাহস হইবে যে, নারায়ণের গলদেশ ধারণপূর্বক কহিবে যে "সখে! আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি গ্রহণ কর।" কোন্ জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রস্নেহসূত্রে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইবে? কেই বা কহিতে পারিবে, "হে প্রিয়বর! তুমি আমার প্রাণনাথ, আমি তোমার পত্নী।" মহারাজ--রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্যপতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর এবং ক্ষুদ্র, দীন, হীন জীব কতদূর অক্ষম! তাহার পক্ষে নারায়ণের প্রতি ভয়, সম্ভ্রম ও উপাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু উপাস্য পদার্থ পরমদয়ালু ও বিলাসপরায়ণ। তিনি যখন জীবের উচ্চগতি দৃষ্টি করেন ও সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন পরমানুগ্রহপূর্বক ঐ সকল উচ্চ রসের বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত লীলায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তিপ্রবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির পুর্ণলক্ষণ। সেই কৃষ্ণানুশীলনে স্বধর্মোন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ থাকিবে না। মুক্তি বা ভুক্তি-বাঞ্ছার অনুশীলন হইলে কোন ক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন, স্বভাবতঃ কর্ম বা জ্ঞানরূপী হইবে। কিন্তু কর্মচর্চা ও জ্ঞানচর্চা ঐ চমৎকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকে আবৃত না করে। জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্ম-পরায়ণ করিয়া তাহার স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে। কর্ম তাহাকে আবৃত করিলে জীবচিত্ত সামান্য স্মার্তগণের ন্যায় কর্মজড় হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ড-কর্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রোধাদি চেষ্টাও অনুশীলন, তত্তচ্চেষ্টাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য ভোগ করিতে হয়, অতএব ঐ অনুশীলন প্রাতিকূল্যরূপে না হয়।

এস্থলে কেহ বিতর্ক করিতে পারেন যে, যদি ভক্তি কর্ম ও জ্ঞানরূপা হয়েন, তবে কর্ম ও জ্ঞান নামই যথেষ্ট, ভক্তি বলিয়া একটি নিরর্থক আখ্যা দিবার

তাৎপর্য কি? এতদ্বিতর্কের মীমাংসা এই যে, কর্ম ও জ্ঞান-নামে ভক্তি-তত্ত্বের তাৎপর্য ঘটে না। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মে একটী একটী পৃথক্ ফল আছে। জীবের স্বধর্ম প্রাপ্তিই যে সমস্ত কর্মের মুখ্য প্রয়োজন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সকল কর্মেরই একটী একটী নিকটস্থ অবান্তর ফল দেখা যায়। শারীরিক কার্যসকলের শরীরপুষ্টি ও ইন্দ্রিয়সুখপ্রাপ্তিরূপ অবান্তর ফল কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। মানসিক কার্যসকলের চিত্তসুখ ও বুদ্ধিপ্রাখর্যরূপ নিকটস্থ ফল লক্ষিত হয়। এই সমস্ত নিকটস্থ অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যিনি মুখ্য ফল পর্যন্ত অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহার প্রবৃত্তিটী ভক্তির স্বরূপ পাইতে পারে। এতন্নিবন্ধন অবান্তর ফলযুক্ত কর্মকে কর্মকাণ্ড বলিয়া, মুখ্যফলানুসন্ধায়ী কর্মকে ভক্তিযোগের অন্তর্গত সুন্দররূপে করিবার জন্য ভক্তি ও কর্মের বৈজ্ঞানিক বিভাগ করা হইয়াছে। তদ্রূপ, যে জ্ঞান মুক্তিকে একমাত্র ফল বলিয়া কার্য করে, তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া জ্ঞানের মুখ্য-প্রয়োজন -সাধক প্রবৃত্তিকে ভক্তিযোগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ভক্তি ও জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিভাগ স্বীকার না করিলে সম্যক্ তত্ত্ববিচার হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে আর একটু কথা আছে। সমস্ত কর্ম ও জ্ঞান মুখ্য-ফলসাধক হইলে ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয় বটে, কিন্তু কর্মমধ্যে কতকগুলি কর্ম আছে, যাহাকে কেবলমাত্র মুখ্য-ফলসাধক বলা যায়। ঐ সকল কর্ম মুখ্যভক্তিনামে পরিচিত আছে। পূজা, জপ, ভগবদ্ ব্রত, তীর্থগমন, ভক্তিশাস্ত্রানুশীলন, সাধুসেবা প্রভৃতি কার্য সকল ইহার উদাহরণ। অন্য সকল কর্ম এবং তাহাদের অবান্তর ফল, মুখ্যফলসাধক হইলে গৌণরূপে ভক্তিনাম পাইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ, ভগবজ্ জ্ঞান ও ভাবসকল অন্যান্য জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য বোধ অপেক্ষা ভক্তির অধিক অনুগত, ইহা বলিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং তাহাদের অবান্তর ফল, মায়া হইতে মুক্তি, যদি ভগবদ্রতি সাধক হয়, তবে তাহারাও ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয়।

নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়

শ্রীকলিপাবনাবাতার শ্রীচৈতন্যদেব কলিপীড়িত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম্ম যে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন তাহা সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদ-সহকারে তিনি জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে তাঁহার অবতার, এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবসকলকে উদ্ধার করাই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটী বলিয়াছেন; —

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবেক মোর নাম।।

এই অবিতর্ক আজ্ঞা যে সত্বরেই কার্য্যে পরিণত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে সে সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নামসঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মচেষ্টা যেরূপ জগতে প্রবলরূপে লক্ষিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে সমস্ত ধর্ম্মের নির্য্যাসরূপ কোন অদ্বিতীয় ধর্ম্ম অতি শীঘ্রই জগতে প্রচারিত হইবে। সে ধর্ম্ম কি ? যেসকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে, ও জম্বুখণ্ডে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না তাহার আর কথা কি? সংস্থাপিত ধর্ম্ম সকলে কতকগুলি অযুক্ত বিশ্বাস বিশেষরূপে আদৃত হওয়ায় সেই সকল ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অযুক্ত বিশ্বাস সকল দূরীভূত হইলে সকল ধর্ম্মই একাকার হইবে। সেই একাকার অবস্থায় ধর্ম্মে কি কি বিষয় নিত্যরূপে থাকিবে তাহা বিবেচনা করা যাউক্। পরমেশ্বর এক বস্তু ও সর্ব্বদা চিন্ময় স্বরূপ-প্রাপ্ত। তিনি সর্ব্বদোষহীন সর্ব্বগুণের আকর। জীবসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু। জড়জগতে জীবের ঈশানুশীলনই নিত্যধর্ম্ম। পরমেশ্বরের বিশুদ্ধগুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকলবর্ণ সকলজাতি সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-সঙ্কীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের

জাত্যাভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য।' 'হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।

এবম্ভূত অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে প্রচারিত হইবে। তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ খোলকরতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব, নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণব-কৃপায় সকল চিৎসমৃদ্ধি হইয়া থাকে এরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যাহাদের দেখিলে নয়ন ঝুরে, তা'রা দুই ভাই এসেছে" এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তিফৌজীয় খ্রীষ্টিয়ানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর, সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না। কেন না, কোন ঘটনাই একবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমলরূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে। আহা! যে দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান-ডঙ্কা-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামোল্লোখপূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে দিন কবে হইবে! আহা যে দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক্ হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যে দিন তাঁহারা বলিবেন---হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্রে চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও' সে দিন কবে হইবে। যে দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্তবৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে দিন কবে হইবে! —সজ্জনতোষণী, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

(শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সর্ব্বত্র প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের উক্ত শুভাভিলাষের ফলপ্রসূত্ব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রচারে পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকা ও ইউরোপের কতিপয় মনীষী তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় শিষ্যকে পাশ্চাত্ত্যে প্রেরণ করিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম ও তদীয় প্রেমধর্ম্ম প্রচার করাইয়াছেন। দুইজন জার্ম্মাণ মনীষী ভারতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন এখনও ভারতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। —গৌঃ গঃ)

অপরাধ-ভঞ্জনের পাট কুলিয়া

বঙ্গদেশের অনেক স্থানে 'কুলিয়া' নামে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্ত্তমান আছে। কিন্তু শ্রীধাম কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী অতুল্য স্থানবিশেষ। কেন না, ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই কুলিয়ার নাম 'শ্রীপাট কুলিয়া'। সেইখানে কলিপাবনাবতারী শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ প্রভু সাতদিবস অবস্থিতি করিয়া চাপালগোপাল-নামক মহাপরাধ-দণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসীকে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সেইখানে মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গাল-নিবাসী দেবানন্দ-নামক একটী ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইখানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্থ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এবম্ভূত তীর্থাবতংস কুলিয়া-নগর কোথায়, ইহা স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচনা ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে?

কুমারহট্ট হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে কয়েক বৎসর হইল, 'কুলিয়াপাটের মেলা' বলিয়া একটী মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষমাসে সেই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে 'কুলিয়া' বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ 'অপরাধভঞ্জনের পাট' বা 'দেবানন্দের পাট' বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য এবং প্রেমদাস বাবাজী-কৃত চন্দ্রোদয়-ভাষানুপাদে উল্লিখিত আছে, সে কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ যোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ঃ কুলিয়া নগর আইলেন ন্যাসিমণি। সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি। সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়। শুনি' মাত্রে সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়।

ঐ গ্রন্থে অন্যস্থলে নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,----খানছাড়া, বড়গাছি, আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার প্রভু যায়েন কুলিয়া।।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর কুলিয়া-আগমন অনুক্রমে বিস্তার করেন নাই। এইজন্য তাঁহার বর্ণনায় কুলিয়া গ্রাম কোন্ স্থানে, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না করিলে বুঝা যায় না। তিনি মধ্য খণ্ড, ১৬ শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ঘর হইয়া, কুমারহট্টে শ্রীবাসকে দর্শনপূর্ব্বক কাঞ্চনপল্লীতে শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের গৃহে পদার্পণ করিয়া বাচস্পতি-গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বাচস্পতির গৃহ যে বিদ্যানগরে, তাহা আমরা পরে দেখাইব। বাচস্পতি-গৃহ হইতে লোকভিড়ের কষ্ট নিবারণ-জন্য কুলিয়া গ্রামে মাধবদাসের গৃহে আসিয়া সাত দিবস রহিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শান্তিপুর ও তথা হইতে রামকেলি গমনের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্থান-সকলের ক্রমপর্য্যায় নাই। যেহেতু তিনি নিজেই কহিতেছেন,---শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশদিন বাস। বিস্তারি' কহিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস। অতএব ইহাঁ তাঁর না কৈলুঁ বিস্তার। পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার।

স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কবিরাজ গোস্বামী সকল কথা পর্য্যায়ক্রমে বর্ণন করিলেন না। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলেন। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন,---গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া।। পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। নবদ্বীপ আইলা প্রভু, এই তাঁর মর্ম্ম।। মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ।

এই বর্ণনে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, কুলিয়াগ্রাম নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল এক গঙ্গা পার এবং তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘর ও বারকোণাঘাটের নিকট।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিত আছে,—"ততঃ কুমার হট্ট শ্রীবাসপণ্ডিত-বাট্যামভ্যাযযৌ। ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিত স্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্।"

এই কথাগুলি-পাঠে বোধ হয় যে, নবদ্বীপ দুই পারে হইলেও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে---'নবদ্বীপ' নামক বিপুল গ্রাম বর্ত্তমান ছিল এবং কুলিয়াগ্রাম তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিমপারে ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্যে বিংশতিসর্গে লিখিত আছে যে, শ্রীরামের বাটী হইতে রাত্রিযোগে কাঞ্চনপল্লীগ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্তঠাকুর ও শ্রীশিবানন্দসেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন, যথা,---

"অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে।"

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়ানগর গঙ্গার পশ্চিমপারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ-নগর হইতে কুলিয়ানগর এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝায় যে, কাঁচড়াপাড়ার তিন মাইল পূর্ব্বে যে কুলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা কোনক্রমেই দেবানন্দাদির "অপরাধ-ভঞ্জনের পাট" হইতে পারে না। সে কুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবাহিনী গঙ্গার পশ্চিমকূলে একক্রোশ-মধ্যে অবস্থিত ছিল। আবার 'সাতকুলিয়া' বলিয়া যে গ্রামটী আছে, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বপারেই আছে। সে গ্রামও 'অপরাধভঞ্জনের' পাঠ হইতে পারে না। কেন না, সেস্থানে কখন কোন নগর ছিল এবং প্রধান প্রধান লোকের ঘর ছিল---এরূপ কোন জনশ্রুতিমাত্রও পাওয়া যায় না। এস্থলে আমাদের গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামকে 'কুলিয়া' বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য গঙ্গার প্রবাহ পরিবর্ত্তনে সেই কুলিয়া নগরের অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিতে পারে। তথাপি কোন অংশ এবং জনশ্রুতি তাহার পরিচয় দিবে, সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতেছি যে, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়াগ্রাম অধিক দূর নহে; কেননা, মহাপ্রভু কুলিয়াগ্রামে গিয়াছেন, শুনিবামাত্র বাচস্পতি ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে গঙ্গা পার হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর একপারে এবং দুই এক মাইলের মধ্যে স্থিত; এখন দেখুন, বিদ্যাবাচস্পতির বাটী কোথায়?

"সার্ব্বভৌমপিতা বিশারদ মহেশ্বর। তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।। পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ।।"

—এই বর্ণনে আমরা জানিতেছি যে, মহশ্বের বিশারদ—সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতির পিতা ছিলেন। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল, সেই স্থানেই দেবানন্দপণ্ডিতের গৃহে ভাগবতের টোল ছিল। সেকালে গঙ্গাদেবী মহৎপুর বা মাতাপুরের নিকট হইয়া, মামগাছি, জান্নগর ইত্যাদি গ্রাম স্পর্শ করিয়া, তথা হইতে বিশারদের জাঙ্গালকে পশ্চিম-পারে ফেলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর চলিয়া গঙ্গানগর হইয়া, শ্রীমায়াপুরের নিকট হইতে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখিনী হইয়া, কুলিয়া তীরে কুলিয়াগঞ্জ দিয়া দক্ষিণে প্রবাহমানা ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিপূর্ব্বে কোন সময়ে গঙ্গার ধারা কুলিয়া গ্রামের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহমানা ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের সময় ঐ ধারাটী শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক হইলে ঐ ভূমিটা আজ পর্য্যন্ত জোল, খাল, বিল, কুশ, কাঁটা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। বর্ষাকালে তথায় গৃহ করিয়া থাকিবার যোগ্য ছিল না বলিয়া তাৎকালিক নবদ্বীপের 'দেওয়ানবাজারে'র অপর পার হইতে একটী জাঙ্গাল বাঁধিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'বিদ্যানগর' নামে একটী ছোট গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা-তীরে-তীরে গঙ্গানগর ছাড়িয়া বেছপ্পর মধ্য দিয়া দেওয়ানের বাজারের ঘাট পার হইয়া বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইত। বিদ্যাবাচস্পতির বাটী যে বিদ্যানগরে ইহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। এই জন্যই নবদ্বীপ হইতে লোকসকল বিশারদের জাঙ্গাল যাইতে বন, জল, কন্টক, অরণ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কুলিয়া যাইতে সেরূপ হয় নাই; প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে কুলিয়া নগরে যাইতে কেবল এক গঙ্গা পার মাত্র হইতে হইয়া ছিল। বিদ্যানগর গ্রাম যদিও পূর্ব্বে বিশারদের জাঙ্গাল বলিয়া পরিচিত ছিল, তথাপি বিদ্যাবাস্পতির মাহাত্ম্য-বলে ঐ গ্রাম পরে 'বিদ্যানগর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। এখনও গঙ্গার পশ্চিম পারকে 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলে। গ্রামের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ-পরিবর্ত্তনে প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমাংশটা কুলিয়ার সহিত এক হইয়া যাওয়ায় কুলিয়ার অনেক অংশ নবদ্বীপের সহিত মিলিত হইয়া নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহা পরে বলিব। 'কুলিয়া' ও 'পাহাড়পুর' বলিয়া দুইটী গ্রাম লাগালাগি ছিল। সেই কুলিয়া গ্রাম এখনকার 'নবদ্বীপ' এবং এই নবদ্বীপকে 'কুলিয়ার পাট', 'দেবানন্দের পাট'ও 'অপরাধ-

ভঞ্জনের পাট' বলিতে কোন আশঙ্কা নাই। প্রধান নাম নবদ্বীপ কুলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত নামগুলিদ্বারা ঐ স্থানকে পরিচয় দিবার প্রয়োজনীয়তা হয় না।

পূর্ব্বে বিচারিত হইয়াছে যে, তাৎকালিক গঙ্গাপ্রবাহের পূর্ব্বতীরে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পশ্চিমতীরে শ্রীপাট কুলিয়া সেই কুলিয়ার কতকাংশ গঙ্গাদেবী ভাঙ্গিয়া লইয়াছেন, কতকাংশ 'নবদ্বীপ' নামে প্রচারিত হইয়াছে এবং কিছু অংশ অদ্যাপি 'কুলিয়ার গঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়ার অনেক অংশই চরভূমি। কেন না, তৎপশ্চিমে বহুকাল পূর্ব্বে যে গঙ্গা প্রবাহমানা ছিলেন, সেই ধারা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গাদিগাছা ও মাজিদার নিকটবর্ত্তী হইলেন, সেই সময় কুলিয়ার চরটীর পত্তন হয়। তন্মধ্যে যে যে স্থল মহাপ্রভুর কিছু পূর্ব্বে দৃঢ় ও উচ্চ হইয়াছিল, তাহাতেই অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও অপর জাতি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তেঘরি, বৈঁচী-আড়া, বেদড়াপাড়া, চিনেডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান জনগণের বাসভূমি হইয়াছিল। বৈঁচী আড়ার কিয়দংশে প্রসিদ্ধ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের সন্তানগণ বিল্বগ্রাম ও পাটুলি হইতে আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তিন পুত্র—ছকড়ি, তিনকড়ি ও দোকড়ি; তাঁহাদিকের প্রকৃত নাম শ্রীমাধবদাস চট্ট, শ্রীহরিদাস চট্ট এবং শ্রীকৃষ্ণসম্পত্তি চট্ট; ইঁহারা প্রাচীন শ্রীবংশীলীলামৃত সংস্কৃত-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-মধ্যে পরিগণিত। সেই মাধবদাস চট্টের বাটীতে সন্ন্যাসিশিরোমণি গৌরচন্দ্র আসিয়া সাত দিবস বাস করিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল চাপাল ও কৃষ্ণানন্দের অপরাধ ভঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কুলিয়ার নাম 'অপরাধভঞ্জনের পাট' হইয়াছিল। 'শ্রীবংশী-শিক্ষা' নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে----

নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
'কুলিয়া-পাহাড়' নামে স্থান।
তথায় আনন্দ-ধাম শ্রীছকড়িচট্ট -নাম
মহাতেজা কুলীন-সন্তান।।

এই গ্রন্থে 'নদীয়ার মাঝখানে' বলিয়া কুলিয়াগ্রামের উল্লেখ হইয়াছে। এই উক্তি দ্বারা সাতকুলিয়া বা কাঞ্চন পল্লীর নিকটস্থ কুলিয়া অবশ্যই নিরস্ত হইতেছে।

প্রাচীন তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে পক্ষপাতশূন্য হইতে হয়। বহুমানিত শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে বিচার করিয়া দেখুন।

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনাক্রমে দেখা যায়, নিজ নবদ্বীপ বলিয়া একটী ভূখণ্ড তখন শ্রীগঙ্গাদেবীদ্বারা বেষ্টিত ছিল। তৎচতুষ্পার্শে অন্যান্য বহু গ্রাম নবদ্বীপের ষোল ক্রোশ পরিধি মধ্যে স্থাপিত ছিল। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থকার আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের যে সংস্থান চক্ষে দর্শন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক লোকের অনুমান অপেক্ষা অধিকগুণে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। আমাদের কোন মনোগত বিষয় সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া তাঁহার বর্ণনকে অবহেলা করা কেবল দুর্ভাগ্যের কার্য্য। তাঁহার গ্রন্থে ' কোলদ্বীপ' বলিয়া যে স্থানকে উক্তি করিয়াছেন, তাহা গঙ্গাদেবীর পশ্চিম তটে আর চারিটী দ্বীপের সহিত সংস্থাপিত।

শ্রীনরহরিদাস শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর ধামপরিক্রমাবর্ণনে এইরূপ লিখিয়াছেন —"কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এ প্রচার।।"

কোন্ স্থান হইতে আচার্য্য প্রভু কুলিয়া নগরে গেলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখুন। পরিক্রমা-পদ্ধতিতে লিখিত আছে—"বামুনপুকুরে পুণ্যগ্রাম। 'ব্রাহ্মণপুষ্কর' এ বিদিত পূর্ব্বনাম।। ব্রাহ্মণের জানি মনঃকথা। আইলেন আনন্দে পুষ্করতীর্থ তথা। এ প্রসঙ্গ অতি সুমধুর। পুষ্করের দ্বারে কৃপা হইল প্রভুর। কুলিয়াপাহাড়পুরগ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্যানন্দধাম।। প্রভু প্রিয়ভক্তে কোলদ্বীপে। পর্ব্বতের প্রায় দেখা দিলা কোলরূপে।।"

বামনপুকুর নামক গ্রাম যে ব্রাহ্মণপুষ্কর,তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না তথায় অদ্যাপি পুষ্কর-তীর্থের চিহ্ন আছে এবং পরিক্রমা -সময়ে বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শন ও স্পর্শন করেন। ব্রাহ্মণপুষ্কর--গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এবং কুলিয়াপাহাড়পুর---গঙ্গার পশ্চিম তীরে। পরিক্রমাপদ্ধতিতে,

যথা---"জাহ্নবীর পশ্চিম কুলেতে। কোলদ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে।।"

পরিক্রমা-পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণপুরা হইতে কুলিয়া পাহাড় পুর যাইতে গঙ্গা পার হওয়ার কথা লেখা নাই; তথাপি ব্রাহ্মণপুরা হইতে পণশিলার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু কোলদ্বীপ গিয়াছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি সেই ঘাটে পার হইলে কুলিয়াগঞ্জে উঠা যায়। আচার্য্যপ্রভু কুলিয়া দর্শন করিয়া সমুদ্রগড় গেলেন। তাহাতেও গঙ্গাপারের উল্লেখ নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে গঙ্গা তখন কুলিয়া ও সমুদ্রগড়ের মধ্যে ছিলেন না। কেবল বর্ষাকালে নিম্নভূমিটা জলময় হইয়া যাইত এবং এখনও যায়। কোন ব্যক্তি 'পরিক্রমা পদ্ধতি' পড়িয়া পর পর গ্রাম অবলম্বন পূর্ব্বক মায়াপুর হইতে কোলদ্বীপে যদি যান, তবে তাঁহার সমস্ত ধাঁধাঁ মিলিয়া যায়। 'বৈষ্ণবাচারদর্পণ' গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণন আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিছুদিন পরে কবিকঙ্কণ নিজকৃত চণ্ডীগ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"ত্বরা করি' সদাগর রাত্রি দিন যায়। পূর্ব্বস্থলী সদাগর বহিয়া এড়ায়।। কোথাও রন্ধন, কোথা দধিখণ্ডকলা।" নবদ্বীপ উত্তরিল বেনিয়ার বালা।। চৈতন্যচণ সাধু করিল বন্দন। সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন।। পাড়পুর সমুদ্রগড়ি বাহিল মেলান। মীরজাপুরে করিল ডিঙ্গির চাপান।।"

প্রথমে নদীয়ার ঘাটে ধনপতি সদাগর অন্ন পাক করিয়া আহার করিল, সেই স্থানটীকে তখন ' দেওয়ানগঞ্জ' বলিত। দেওয়ানগঞ্জের অপর পারে বিশারদের জাঙ্গাল ও শ্রীমায়াপুর। তাহা ছাড়িয়া দক্ষিণে পাহাড়পুর পাইলেন। এই কুলিয়া পাহাড়পুরকে কবিকঙ্কণ 'পাড়পুর' বলিয়া লিখিয়াছেন। পাড়পুর ছাড়াইয়া সমদ্রগড়ে পৌঁছিলেন। এখনও সেই পথ লক্ষিত হইবে।

কাশিমবাজার পেনিনসুলা ম্যাপ দেখিলে এ সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। কুলিয়া-গ্রাম যে বর্ত্তমান নবদ্বীপ--ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সেই সময়ে দেওয়ানগঞ্জ হইয়া গঙ্গা কুলিয়াকে দক্ষিণে রাখিয়া উত্তরাভিমুখে গঙ্গ ানগরের দিকে চলিয়াছিলেন। সে সময় বর্ত্তমান নবদ্বীপের নহলাপাড়ায় অনেকাংশ গঙ্গার গর্ভে ছিল। জল শুষ্ক হইলে দেওয়ানগঞ্জপারের ভগ্ননিবাস বহু প্রজাবর্গ সংলগ্ন ও কুলিয়ার চরে আসিয়া বাস করেন। গঙ্গা দেওয়ানগঞ্জপারের যত জমি ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন, ততই শ্রীনবদ্বীপের স্বস্থলপয়বস্থিতে বাব্‌লাড়ি প্রভৃতি পুরাতনগঞ্জের অনেক স্থান বসিয়াছিল। সে সময়ে পুরাতনগঞ্জে একটী স্থানে শ্রীবাসঅঙ্গন কল্পিত হয়। তাহাই আবার এখন কুলিয়ার চরে আসিয়াছে। দেওয়ানগঞ্জের দিকের প্রজাসকল---নিজ নদীয়ানগরের প্রজা। তাহারাই সংলগ্ন চরে যত উঠিয়া গেল, ততই নবদ্বীপ নামকে প্রশস্ত করিল

যেখানে বড় নাম উপস্থিত হয়, সেখানে ছোট নাম কাযেকাযেই লুপ্ত হয়। কুলিয়ার কয়েকটি পল্লীতে পূর্ব্ব প্রসিদ্ধ 'কুলিয়া'-নাম লুপ্ত হইয়া 'নবদ্বীপ'-নাম ব্যাপ্ত হইল।

বর্ত্তমান নবদ্বীপকে পূর্ব্বোক্ত কারণে শ্রীকুলিয়াপাট বলিয়া সংস্থাপন না করিলে সমস্ত নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বিফল হয়। কুলিয়াগ্রামে ছকড়ি মাধব চট্ট মহাশয় ও তদীয় পুত্র প্রভু বংশীবদনানন্দ বাস করিতেন এবং বংশীবদনানন্দের বংশধরগণ কুলিয়াগ্রামে শ্রীমায়াপুর হইতে আনীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর দারুমূর্ত্তি রাখিয়া শ্রীপাট বাঘনাপাড়া চলিয়া যান তাহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে যে গঙ্গাধারা ছিলেন তৎপশ্চিমেও কোন স্থান অনুসন্ধান করিয়া কুলিয়া নগর পাওয়া যায় না। যদি সেখানে কোন 'কুলিয়া' থাকিত, সেরূপ প্রধান নগর লুপ্ত হইলে তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইত। আমরা কোন সময়ে সমুদ্রগড়নিবাসী কোন অতি বৃদ্ধ অধ্যাপকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনি শিশুকালে কুলিয়ার গঞ্জ বাজার করিতে আসিতেন এবং সে সময় কুলিয়া গ্রামের অনেক অংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

—সজ্জনতোষণী ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি

জীবের কৃষ্ণনাম ব্যতীত আর ধন নাই, গতি নাই। শুদ্ধ জীবগণ মুক্ত অবস্থায় শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা হরিনাম গান করিয়া থাকেন। সংসারী বদ্ধজীবগণ যখন জীব-গতি বিচার করিতে সমর্থ হন, তখন সুতরাং হরিনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন। অপরাধ শূন্য হইয়া 'নাম' না করিলে কখনই নামের একান্ত আশ্রয় ঘটে না। দশটী নামাপরাধ* মধ্যে 'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি'ও একটি বৃহদপরাধ। সুতরাং নামাশ্রয়ী সংসারী ব্যক্তির পক্ষে এই অপরাধটী বহু যত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

পাপ কাহাকে বলে? সংসারী জীবের পক্ষে যে সকল অশুভ কর্ম্ম বেদে নিষিদ্ধরূপে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মকে 'পাপ' বলা যায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীরূপ-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিকে নিষিদ্ধাচার-রূপ দোষ পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছেন। শাস্ত্র পাপকে বিকর্ম্ম বলিয়া কোন কোন স্থলে উক্তি করিয়াছেন। পাপকে অনেকস্থলে 'পাতক' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সংসারী জীবের স্বধর্ম্ম হইতে যে কর্ম্ম মানবকে নিপাতিত করিয়া নিরয়গামী করে তাহাই পাতক। পাতকসমূহ গুরুলঘু বিচারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক—এই তিন শ্রেণী। মনু মহাপাতককে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন——

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ।।

—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নী-গমন—এই চারিটী মহাপাতক। মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করাও একটী মহাপাতক।

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামী চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া।।

---

*দশবিধ নামাপরাধ— ১। সাধুনিন্দা, ২। কৃষ্ণেতর দেবতায় স্বতন্ত্র ভগবজ্ জ্ঞান, ৩। গুর্ব্ববজ্ঞা, ৪। শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন, ৫। শ্রীহরিনামে অর্থবাদ, ৬। শ্রীনামে কল্পনা-জ্ঞান, ৭। নামবলে পাপবুদ্ধি, ৮। শ্রীহরিনামগ্রহণকে প্রমাদবশতঃও অন্য শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান, ৯। জড়াসক্তিক্রমে শ্রদ্ধাহীনে নাম দান, ১০। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও জড় অহং-মমাদি ভাবপ্রযুক্ত নামের প্রতি অপ্রীতি।

---পরের অপকর্ষমূলক স্বীয় উৎকর্ষসাধক মিথ্যাভাষণ, অপকার, রাজদ্বারে পরের নিন্দা, গুরুসম্বন্ধে সরল ব্যবহার পরিত্যাগ---এই গুলি ব্রহ্মহত্যার সদৃশ মহাপাতক। অতএব এই প্রকার পাতক সকল অনুপাতক।

মনুর মতে গো-বধ, পরদারগমন, পরপীড়ন, গুরু, পিতা ও মাতার অবহেলন প্রভৃতি পাতকসকল উপপাতক। যে সকল পাপের জন্য সমাজচ্যুতি ও রাজদণ্ড বিধান আছে, সে সমুদয় পাপই উপপাতক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাতকসকলকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। মূল কথা এই যে, যাহাতে পুণ্যময় স্বধর্ম্মের হানি হয়, সে সমুদয়ই পাপ। নাস্তিক্য, পরের অপকার ও স্বীয় মনুষ্যত্ব-হানিজনক সকল ক্রিয়াই পাপ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বেদ যাহাকে নিষেধ বলিয়া বলিয়াছেন, তাহাই পাপ। সংসারী বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে পাপনিষেধক প্রায়শ্চিত্তও পৃথক্ পৃথক্। ইষ্টাপূর্ত্ত-ব্রত-যোগাদিরূপ পুণ্যকর্ম্মের বিধান দেখা যায়। পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠানই বিধি। জীব যখন বহির্ম্মুখতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখন তিনি সহজেই পুণ্যপাপের অতীত। কেন না, তখন তাঁহার সংসারী ব্যক্তির ধর্ম্ম পরিবর্জ্জিত হইয়া পড়ে। তখন একমাত্র কৃষ্ণদাস্যই নিত্য স্বধর্মরূপে উদিত হয়।

সংসারী বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম্ম কর্ম্ম-কাণ্ডান্তর্গত। কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার থাকে না। ভাগবতে--(১১।২০।৯)

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।"

যে পর্য্যন্ত জীবের পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইয়া নির্ব্বেদ না জন্মে, অথবা হরিকথা-শ্রবণাদিতে নিরুপাধিক শ্রদ্ধা না জন্মে সে পর্য্যন্ত জীব অবশ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। দেহযাত্রাদি নির্ব্বাহের জন্য শরীর, মানস, দৈহিক ও সামাজিক ক্রিয়াসকল হরিভক্তির অনুকূল হইলে অঙ্গীকার এবং প্রতিকূল হইলে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ক্রিয়াসকলের অঙ্গীকারপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলেও ঐ সকল ক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ডলক্ষণ কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত নহে। বস্তুতঃ তাহারা কর্ম্মনাশক-ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে নিপতিত হয়। সুতরাং ঐ অবস্থায় পাপপুণ্য কিছুই থাকে না এবং

প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজনীয়তা নাই। লোকোদ্দেশে বা প্রতিষ্ঠোদ্দেশে কোন কর্ম্ম তখন কৃত হয় না, কেবল নিষ্পাপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কৃত হয়। সুতরাং যখন পুণ্যকর্ম্মই নাই, তখন অধম পাপকার্য্য কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির নিকটে যাইতে পারে না।

"কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়ো নৃপ।"

হে নৃপ, কর্ম্মকাণ্ডী লোকেরা বহু যত্ন করিয়া যে যম-নিয়মাদির অভ্যাস করে এবং শৌচবিধি পালন করে, সে যম-নিয়মাদির সদ্‌গুণ ও সদাচার এবং শৌচ স্বয়ং কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিকে যত্ন করিয়া তাহাদিগকে সংগ্রহ্ করিতে হয় না। আবার বলিয়াছেন--

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তব হিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে, ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।।"

---হে ব্যাধ, তুমি পূর্ব্বে যখন বহির্ম্মুখ সংসারী ছিলে, তখন তোমার হিংসা-প্রবৃত্তি নৈসর্গিকরূপে তোমাকে আশ্রয় করিয়াছিল। এখন তুমি হরি ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। সুতরাং জীব-হিংসাদি পাপ্প্রবৃত্তি আর তোমার থাকিতে পারে না। জীবের স্বভাব যে কৃষ্ণদাস্য, তাহা তোমার নিত্য স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম যে পরিমাণে উদিত হইতেছে, তোমার নৈমিত্তিক স্বধর্ম্মরূপ পুণ্যপ্রবৃত্তি সেই পরিমাণে ক্ষয় হইতেছে। এখন তোমার নিত্য স্বধর্ম্মদ্বারা উত্তেজিত হইয়া তুমি যাহা যাহা করিবে, সে সমস্তই নৈমিত্তিক স্বধর্ম্মবৃত্তিরূপ পুণ্য হইতে অতি উচ্চ মহাপুণ্যরূপ বৈষ্ণব-সংসার করিতে থাকিবে, সুতরাং তোমার সামান্য পুণ্যই যখন তুচ্ছ হইল, তখন অতি হেয়রূপ জীব-হিংসাদি পাপ কখনই তোমার প্রবৃত্তিগত হইতে পারে না, তুমি যে নিষ্পাপ জীবনে কৃষ্ণনাম করিতেছ, ইহা আশ্চর্য্য নয়। এরূপ সকলেরই হইয়া থাকে।

এখন দেখুন, হরিনামাশ্রিত জীবের পাপপ্রবৃত্তি থাকে না। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য---এই ছয়টী চিত্ত প্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই 'পাপ' হয়। কৃষ্ণ কথা-সেবামূলক বৈষ্ণব-সংসারে 'কাম' কে নিযুক্ত করিয়া আর পরস্ত্রী-সংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা-তৎপরতা, বঞ্চনা, চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট-কর্ম্ম করেন না। কৃষ্ণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি 'ক্রোধ'-কে নিযুক্ত করিয়া

বহির্ম্মুখ সংসর্গ দূর করেন, সুতরাং পর-পীড়ন ও নির্য্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন। ক্রোধ সে স্থলে তরুধর্ম্মের ন্যায় সহিষ্ণুতারূপে পরিণত হয়। কৃষ্ণ-রসাস্বাদনে 'লোভ'কে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া-পরা ও সুন্দরীস্ত্রীসঙ্গ ও অপর্য্যাপ্ত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রতি দৃকপাত করেন না। 'মোহ'কে চিদ্রসে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলা-সৌন্দর্য্য এবং বৈষ্ণব-চরিত্রে মোহিত হন। ধন, জন ও জড়সুখাদিতে মোহ প্রাপ্ত হন না। অসৎসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না। 'মদ' কে কৃষ্ণদাস্যাভিমানে নিযুক্ত করিয়া জাতি মদ, ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ্ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। 'মাৎসর্য্য'কে অর্থাৎ পরহিংসা দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধন একেবারে পরিত্যাগ করেন। এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না। পাপ-প্রবৃত্তি নির্ম্মূলিত হয়। তবে কখন কাহার ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে, তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তে প্রশমিত হয়। সেরূপ দৈবাৎ আগত পাপ দৃষ্টি করিয়া কোন বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। চিত্তে পাপ-প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু হঠাৎ কোন ঘটনাক্রমে কোন সামান্য পাপ উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণবতা দূর হয় না। এইজন্য জগদারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন (গীতা ৯।৩০)—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।।"

—হে অর্জ্জুন, আমার অনন্য ভক্তের কখন পাপপ্রবৃত্তি হয় না। নামানুশীলনরূপ একটী চিদ্ব্যাপার আমার অনন্যভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। জড়গত পাপ তাহার ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যদি কোন ঘটনাক্রমে হঠাৎ পাপক্রিয়া হয় এবং সে পাপ যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সুদুরাচার বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি আমার অনন্যভক্তের নিন্দা করিবে না। কেন না (গীতা ৯।৩১)—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।"

—হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করিতেছে, তাহার চরিত্রে কেবল দুই প্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামে রুচি হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্ব

হইতে তাঁহার কোন একটী পাপ-সংসর্গ ছিল। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, মৎস্য-মাংসাহার, আসবসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোন একটী চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল।

'কাম' কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণে 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে
'লাভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা।।

——শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর।

অনন্যভক্তি উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সব পাপ-প্রবৃত্তি গেল, কিন্তু ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্যভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ অন্যোপায় সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটী যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না। কিছুদিন থাকে। যেকাল পর্য্যন্ত নির্ম্মুল না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই অনন্যভক্তকে তন্নিবন্ধন অবজ্ঞা করিবে না। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, অনন্যভক্তি সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমার ভজন করেন। তথাপি জড়দেহ সত্ত্বে কখন কোন গতিকে রোগীর অমেধ্য-সংযুক্ত ঔষধ-সেবনের ন্যায় কোন পাপ-ক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অত্যন্ত অস্থায়ী, কেননা, প্রবৃত্তিগত নয়। সুতরাং এই দুই প্রকার পাপ হইতে আমার অনন্যভক্ত অতি শীঘ্রই আমার ভক্তিকৃপায় শুদ্ধ ধর্ম্মাত্মা হইয়া পাপ হইতে শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়, এই একটী আমার প্রতিজ্ঞা যে, আমার অনন্যভক্ত কখন নষ্ট হইবে না।

এখন দেখুন, অনন্যভক্তি হইলে আর পাপ-প্রবৃত্তি কখনই থাকে না, কেবল পাপক্রিয়া কিয়ৎপরিমাণে থাকিতে পারে, তাহাও অল্পদিন। আবার তাহাও দিন দিন হীনবল হইয়া খর্ব্ব হয়। জগাই-মাধাই চরিতে দেখা যাইবে যে, ভক্তিলাভের পর আর সেই দুইটী ব্যক্তির পাপ-প্রবৃত্তি মাত্রই ছিল না। অপারকরুণাময় মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নামাশ্রয় দিয়া কহিলেন,—

"প্রভু বলে--তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে--আর নারে বাপ।।"

—শ্রীচৈতন্যভাগবত ম ১৩।২২৫

আমাদের পরমারাধ্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগজ্জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সকলকে ধর্ম্মচরিত্রে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। দস্যু ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিয়া কহিলেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুইঁ।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি।।
পরহিংসা ডাকাচুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর।।
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবে পরিত্রাণ।।
যত সব দস্যু-চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত ম ৫।৬৮৫-৬৮৮)

পরম কারুণিক প্রভু নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার। সেই ধর্ম্মমূর্ত্তি এই কথা উপদেশ করিলেন যে, যখন তুমি ধর্ম্মপথে থাকিয়া হরিনাম লইবে, তখন তুমি বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়া লোকের পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে। যাঁহারা আচার্য্যপদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য জীবগণকে স্বীয় সচ্চরিত্র দেখাইয়া শ্রদ্ধা সংগ্রহ করিবেন। আচার্য্যপুরুষের সদাচারই সকলে আদর করিয়া গ্রহণ করেন। অন্য জীব-হিংসা, ডাকাতি, চুরি, অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ, অমেধ্যভক্ষণ, আসব-পান প্রভৃতি সমস্ত দুরাচার পরিত্যাগ করিবেন। নিজে লম্পট হইলে শিষ্যকে কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন? সকল আচার্য্যদিগের আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত হইলেও কখনই নিজ চরিত্রে কোন দুষ্টাচার দেখান নাই। এমত নির্ম্মলচরিত্র প্রভুকে যাঁহারা দুষ্টাচারী বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদের জীবনে ধিক্। অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্যচরিত্রে দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহা করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্মমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গ দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নবরসিকমধ্যে গণন করেন। নির্ম্মলচরিত্র শ্রীরূপ-গোস্বামী ও রামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রী-

সঙ্গ দোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন। এ সমস্তই দুষ্ট কলির কার্য্য। মূল কথা এই যে, কাপট্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ না করিলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ধর্ম্মের ছলে পাপাচরণ করিয়া জগদ্‌-বঞ্চক হইয়া পড়ে। যিনি অকপটে হরিনাম আশ্রয় করিবেন, তিনি সমস্ত পাপপ্রবৃত্তিশূন্য হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? প্রহ্লাদ কহিয়াছেন (ভাঃ৫।১৮।১২)—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।।"

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে অকিঞ্চনা ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার শরীরে সমস্ত দেবতা সমস্ত মহদ্‌গুণের সহিত নিয়ত বাস করেন। ভগবদ্ভক্তি-উদয় এবং পাপ-প্রবৃত্তি নাশ যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য শ্রীমন্নিতানন্দপ্রভু দ্বিজকে সর্ব্বাপরাধ-বিমুক্ত হইয়া হরিনাম লইতে উপদেশ দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।"

সুতরাং অপরাধের সহিত লইলে নাম হয় না—

নামাপরাধ হয়। অবশেষে নামাপরাধে নিতান্ত অধঃপতন হইয়া পড়ে। নামাভাস করিলেও পরে সাধু-সঙ্গে নামাভাসত্ব ঘুচিয়া নামের উদয় হইতে পারে। ততদূর না হইলেও নামাভাসে পাপ নষ্ট হয় এবং চারি পুরুষার্থ লাভ হয়। কিন্তু নামাপরাধ বড়ই কঠিন বস্তু। ইহাতে সুমঙ্গল উদয় হওয়া বড়ই দুর্ঘট। নামাভাসী ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করিয়া শুদ্ধনাম লাভ করুন। নামাপরাধী অপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুপদাশ্রয় করতঃ শুদ্ধনামের অন্বেষণ করুন।

কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কোন সুকৃতিবলে নামাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার দেখা উচিত যে, নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি না হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, নামাশ্রয় করিয়াও পূর্ব্ব পাপ সম্বন্ধের অবশেষ কিছু কিয়দ্দিন থাকিতে পারে এবং ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য্য হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার পাপপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। পাপ-প্রবৃত্তি ও পাপাসক্তি একই কথা। যদি কৃষ্ণনামে রুচি হয়, তবে সেই রুচি ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া কৃষ্ণনামে আসক্তি হয়। যদি অন্য বিষয়ে বা পাপকার্য্যে আসক্তি থাকে, তবে তাঁহার নামে আসক্তি হইতে পারে না। আসক্তি একটী অনন্য-প্রবৃত্তি-বিশেষ। তাহা হয় কৃষ্ণে হইবে, নয় অসদ্‌বিষয়ে হইবে। কৃষ্ণে যাঁহার নিষ্কপট শ্রদ্ধা, তাঁহার নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি শ্রীকৃষ্ণে অনন্যরূপে অবশ্য হইবে। তখন অন্য কোন পুণ্য বা পাপবিষয়ে সে

প্রবৃত্তি হইবে না। অনন্যরূপ বিশেষণদ্বারা অন্যাসক্তি দূরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার পাপপ্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্যশ্রদ্ধার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। যদি তিনি অন্য সকল লক্ষণ দেখান, তথাপি তাঁহার অনন্য-নামাশ্রয়-প্রবৃত্তি স্বীকার করা যাইবে না। যে ব্যক্তির সত্যই পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনামে পুলকাশ্রুপাত করিয়াও কপট-বৈষ্ণব-মধ্যে গণিত হইবেন। কেন না, তিনি নামাপরাধী। নামাপরাধী কখনই শুদ্ধ-বৈষ্ণব নয়। এই জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে "শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়"---এই বাক্যদ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।

সেই বৈষ্ণব-প্রায় ব্যক্তিগণ বলেন যে, এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরণ করে কোটী জন্মেও পাপী তত পাপ করিতে পারে না। সুতরাং যখন আমার নিকট সেই হরিনাম আছে, তখন আর পাপ করিতে ভয় কি? হরিনামও করি, পাপও করি। জমাখরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যিনি নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন পাপ করেন, তাঁহাকে কপটী ও নামাপরাধী বলা যায়। ইহার উদাহরণ এই যে, জীবহিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন গৃহস্থ নামাশ্রয় করিলেন। পরে একদিন কোন কুসঙ্গে ভাল মৎস্য বা মাংস খাইতে ইচ্ছা করিলেন। তখন প্রবৃত্তি-চরিতার্থ্যের জন্য এই স্থির করিলেন যে, অদ্য আমি আর দশ সহস্র নাম করিয়া মৎস্য-ভোজন পাপ দূর করিব। এইরূপ মনে করিয়া যিনি মৎস্য-ভোজন করিয়া নাম করেন, তিনি নামাপরাধী। অন্য উদাহরণ এই যে, কোন ভিক্ষাশ্রমগত বৈষ্ণবপুরুষ কোন সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিলেন যে, "যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে হরিনাম-শিষ্য করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে অবশ্যই ক্ষয় হইবে। বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী হইল। বৈষ্ণবসঙ্গ দুর্ল্লভ। আবার উহার সঙ্গে গোপীভাব অনেক শিক্ষা হইবে। এরূপ দুর্ল্লভ সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায়?" এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণবসেবা গ্রহণ করিলেন। এ স্থলে নামাপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল। এই দুইটী উদাহরণ বিচার করিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ ও ভেকধারিগণ নামাপরাধ হইতে সতর্ক হইবেন।

চতুরের কার্য্য

'শুদ্ধা ভক্তিই জীবের প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায় এবং শুদ্ধ জীবই ভগবদ্ভজনের যোগ্য ও শুদ্ধ কৃষ্ণমূর্ত্তি---তত্ত্বই শুদ্ধ জীবের উপাস্য।'---এইটী যে পর্য্যন্ত না জানা যায়, সে পর্য্যন্ত পরমার্থ-চেষ্টা সুন্দররূপে হয় না জ্ঞানমিশ্রতা, যোগমিশ্রতা হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে; নবম অধ্যায়ে উপাস্য তত্ত্বের শুদ্ধতাই একমাত্র উপদিষ্ট। শুদ্ধ উপাস্যতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই তত্ত্বের (তত্ত্বান্ধকল্পিত) মলসকল বর্ণনপূর্ব্বক দেখাইতে হয়। এই জন্য বিজ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপা ভগবন্মুক্তির নিত্য সিদ্ধত্ব দেখান হইল। সেই নিত্যমূর্ত্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের প্রভাব-রূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকেই জ্ঞানী, যোগী ও যাজ্ঞিকেরা উপাসনা করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তসকল সেই পরমার্থ-তত্ত্বের খণ্ডভাবকে উপাসনা না করিয়া নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথগ্-বোধে অন্যান্য দেবের উপাসনা---নিতান্ত অজ্ঞান-কার্য্য; যেহেতু সেই সেই দেবতার ভজন করিলে সেই সেই খণ্ডভাব-বিশিষ্ট গতি লাভ হয়। ভক্তিযোগের কথা এই যে, অন্য দেবাদির উপাসনা হইতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষশূন্যভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নববিধা ভক্তি আলোচনাপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এরূপ অনন্য ভক্ত যদি প্রথমাবস্থায় সুদুরাচারও হ'ন তথাপি তিনি---কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সাধু; যেহেতু অতি অল্পদিনের মধ্যে ঐকান্তিকভাবে দৃঢ় হইলে আর কোন প্রকার চরিত্রকষায় থাকিবে না। ভগবানে শুদ্ধা ভক্তিই সেই ফল উৎপন্ন করিবে। শুদ্ধভক্তের নাশ বা পতন কখনই হয় না; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার যোগ-ক্ষেম বহন করেন। অতএব শুদ্ধ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই চতুরের কার্য্য।

"যেই জন কৃষ্ণভজে সে বড় চতুর।"

বৈরাগ্য

বৈরাগ্য কি ব্যাপার? ইহা কি বিশেষ যত্নের সহিত সাধিত হয়? ইহা কি ভক্তির একটী অঙ্গ বা চরম ফল? জ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? বৈরাগ্য কি একটী কর্ম্ম বিশেষ? বৈরাগ্য হইলেই কি জীবের সম্পূর্ণ লাভ হইল? ইহা কি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ?

জ্ঞানমার্গীয় লোকেরা বৈরাগ্যের বিশেষ সম্মান করেন। বৈরাগ্যকে জীবনের চরম ফল বলিয়া তাঁহারা জানেন। জ্ঞানের স্বভাব—বিবেক। তাঁহারা বলেন যে, যখন বিবেকের উদয় হয়, তখনই বিরাগ আসিয়া জীব-হৃদয়ে প্রবেশ করে। সংসারে মোহিত হইয়া জীব বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ। যখন সংসার-গতি বিচার করিয়া বিবেক দ্বারা স্থির করেন যে, সংসার-ধ্বংসই প্রয়োজন, যেহেতু তাহাতেই জীবের মুক্তি হয়, তখন বিরাগ আসিয়া জীবকে সংসার ছাড়াইয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করে।

কর্ম্মমার্গীয় লোকেরা সংসার-ভোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা জৈমিনী ঋষির মত অনুসরণ পূর্ব্বক বলেন যে, জীবের সংসার-বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নাই। অন্ধ, বধির, খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিগণ কেবল বিরাগের অধিকারী, যেহেতু তাহারা অকর্ম্মণ্য।

জ্ঞানমার্গীয় এবং ভক্তিমার্গীয় মানবগণ বিরাগকে এত সম্মান করেন যে, সংসার ও বৈরাগ্যের দুইটী পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি স্থির করিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেকমার্গীয় প্রক্রিয়ায় অনেক গুলি বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। দত্তাত্রেয়, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানি-দলপতি-মহাত্মাগণ শাস্ত্র-বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৈরাগ্যের সম্বন্ধে অনেক প্রকার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সেই মতানুসারে দশনামী সন্ন্যাসিগণ এবং কাণফাটা যোগিগণ ও গোরক্ষনাথী সন্ন্যাস-প্রায় ব্যক্তিগণ নানা আকারে সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন। দণ্ডী, মুণ্ডী প্রভৃতি নানাপ্রকার বেষধারিগণের সেই সকল দলে প্রভূত সম্মান। লিঙ্গই তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের চিহ্ন বলিয়া যত্নের সহিত অঙ্গীকৃত হয়। চিত্তের বিরাগ যে কি বস্তু, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। লিঙ্গ দেখিয়াই সেই সেই মতস্থ সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন।

ভক্তি মার্গেও বৈরাগ্যের অনেক সম্মান দেখা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই বৈরাগ্য-চিহ্ন-ভূষিত হইয়া বিচরণ করেন। জ্ঞান-মার্গীদের ন্যায় তাঁহাদেরও অবস্থায় মঠ, শিষ্য সংগ্রহ ও বিধি-নিষেধের সজ্জা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। মঠধারী হইয়া অনেকে অনেক সম্পদ্ও হস্তগত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী---রাজাদিগের ন্যায় যান-বাহনাদিতে বিচরণ করেন, অনেক শিষ্যকে শিক্ষা দেন, অনেক মনুষ্যকে ভোজন-পানাদি দান করিয়া নিজ নিজ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অনেক স্থলেই প্রকৃত বৈরাগ্য না থাকিলে ও তাঁহারা বৈরাগীর সম্মানে মাননীয় এবং বহু জনের দণ্ডবৎ-প্রণতি প্রাপ্ত হন। সংসারের একটী চিহ্ন অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী তাঁহাদের না থাকিলেই তাঁহাদের ধর্ম্ম বজায় থাকে এবং তাঁহারা 'বৈরাগী'-পদবাচ্য হইয়া পূজিত হন। বিবাহিতা স্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত কৌপীনটীই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম-চিহ্ন। বিষয়াসক্তি, মোকদ্দমা, পরের প্রতি আক্রোশ, ধন-সঞ্চয় প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুতি হয় না। 'বর্ণত্যাগ'--এ কথা তাঁহারা জল্পনা করেন বটে, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণবর্ণের পূজা এবং 'আমি সন্ন্যাসী হইলেও ব্রাহ্মণ আছি'---এ-কথাটা বলিয়া বর্ণ-গর্ব্ব ছাড়েন না।

আমাদের শ্রীমদ্গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েও সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্মান আছে। প্রভু সন্তান গোস্বামী আচার্য্যগণ গৃহস্থ, এই জন্য কথায় কথায় বৈরাগিগণ গোস্বামি প্রভুদিগকে 'গৃহস্থ' বলিয়া কিয়ৎ পরিমাণে নিম্নাধিকারী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা গোস্বামী মহাশয়গণ অগত্যা সহ্য করেন। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, 'বৈষ্ণব' বলিলে বৈরাগী বুঝাইবে এবং 'আচার্য্য' বলিলে গৃহস্থ প্রভু সন্তান, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বুঝা যায়। যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ে আজকাল গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈরাগীর সম্মান অধিক। বৈরাগিগণ কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক বিশিষ্ট-বৈষ্ণব-সম্মানে মঠ বা আখ্ড়ায় বাস করেন। কতকগুলি নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী অনিকেত হইয়া তীর্থে বা গ্রামে গ্রামে অভ্যাগতরূপে বিচরণ করেন। শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর বিরচিত সংস্কারদীপিকা নামক গ্রন্থে অনিকেত শুদ্ধ বৈরাগীর বৈরাগ্য-প্রথায় অধিকার-বিচার কথিত হইয়াছে,---

বিজিতষড়্গুণো যস্তু দম্ভহিংসাদিবর্জ্জিতঃ।
মৈত্রকারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছা জিতেন্দ্রিয়ঃ।।

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যাদিসাধকঃ।
তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতে যতি সাধুভিঃ।।
দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্ম্মনাশনম্।।

যাঁহারা ভেক দিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রথমেই দেখিবেন যে, কৌপীনপ্রার্থী ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ে শ্রীভগবন্মন্ত্রে লোভ করিয়া যথাবিধি ভক্তি সাধন করিয়াছেন। সেই সাধন-ফলে বিজিত ষড়্গুণ হইয়া দম্ভ-হিংসাদি বর্জ্জন করিয়াছেন—মৈত্রকারুণ্য-স্বভাব, নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন। দাম্ভিক, শুদ্ধ-ভক্তিহীন ও শঠ কপটকে কখনই বৈরাগ্য-চিহ্ন প্রদান করিবেন না, করিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ধর্ম্ম নাশ হইবে। এইরূপ অধিকার বিচার না করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে বৈরাগ্য হয় না, কেবল শঠতা ও দম্ভ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বৈরাগ্যের অধিকারগত সম্মান ও সেবা পাইবার যোগ্য হন না। আমরা বারম্বার বলি যে, যেন আমাদের ঐরূপ অনধিকার-স্থলে বৈরাগ্য-গ্রহণ না হয়। পক্ষান্তরে গ্রহীতা দেখিবেন যে, বৈরাগ্যদাতা গুরু এই প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পাত্রের নিকট বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দৃষ্টি না করিলে মঙ্গল হইবে না।

এ সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামী, দাসগোস্বামী প্রভৃতির চরিত্র-দৃষ্টে কার্য্য করা আবশ্যক। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর চরিত্রও বিবেচনা করা উচিত।

বৈরাগ্য-সম্বন্ধে আমরা যে সকল শাস্ত্র দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি এবং মহাত্মা প্রাজ্ঞ পুরুষদিগের কৃপায় যাহা জানিয়াছি এবং সেইসকল বিচার পূর্ব্বক আমরা কিছু কিছু নিজের উপকারার্থে লিখিয়া রাখিব। অন্যকে শিক্ষা দিবার অধিকার বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যদি কখনও কাহারও হাতে এই প্রবন্ধ পড়ে, তিনি পাঠ করিয়া তাঁহার অপ্রিয় কথা যাহা পান, তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। মূঢ় দীন ব্যক্তির কথায় ক্রুদ্ধ হওয়া মহজ্জনের উচিত নহে।

বৈরাগ্য কি? বিরাগ-ধর্ম্মকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলেন। মায়াবদ্ধ জীবের যে বিষয়ে আসক্তি, তাহাকেই 'রাগ' বলি। সেই আসক্তি-রাহিত্যকেই 'বিরাগ' বলা যায়। মায়ামুক্ত জীব-সহজে কৃষ্ণে রাগ প্রাপ্ত পুরুষ। কৃষ্ণে রাগ যত উদয় হইয়া প্রবল হইতে থাকে, ততই বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়। সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে সহজেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য কখনই অভ্যাস দ্বারা লাভ করা যায় না।

শ্রীমদ্ ভগবদগীতায় ২য় অঃ ৫৯ শ্লোকে---

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে।।

তাৎপর্য্য এই যে, মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণরাগ লুপ্ত হইয়া বিষয়-রাগ হইয়াছে। তাহা বিষয়-ত্যাগমাত্রেই যায় না, কেননা, মনে মনে বিষয় প্রবল থাকে এবং পুনঃ পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণরস-আস্বাদন হয়, তখন সহজেই বিষয়-রস-তৃষ্ণা তুচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক বিষয়-বৈরাগ্য স্থির হয়।

বৈরাগ্য ভক্তির হেতু, অঙ্গ বা চরমফল নহে। বৈরাগ্য---জ্ঞানের ভ্রাতা, পদ্মপুরাণে (উত্তরখণ্ড ৬৩ অঃ) ভক্তিদেবী স্বয়ং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ রূপকভাবে বর্ণন করিয়াছেন,---

অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ।
জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কালযোগেন জর্জ্জরৌ।।

পুনঃ নারদ কহিলেন---

অঙ্গীকৃতং ত্বয়া যদ্বৈ প্রসন্নোহভূদ্ হরিস্তদা ।
মুক্তিং দাসীং দদৌ তুভ্যং জ্ঞানবৈরাগ্যকাবিমৌ।।

এই প্রমাণের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, ভক্তিই---মূল তত্ত্ব। মুক্তি---কেবল ভক্তির পরিচারিকা। জ্ঞান ও বৈরাগ্য---ভক্তির দুইটী সন্তান। শ্রীমদ্ ভাগবতেও (১।২।৭) এইরূপ সিদ্ধান্ত-বাক্য পাওয়া যায়,---

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।

ভগবানে যিনি শুদ্ধ ভক্তিযোগ করেন, তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং অহৈতুকী জ্ঞানের উদয় হয়। ফলানুসন্ধান-রহিত আত্মার যে স্বতঃসিদ্ধ বোধ, তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে শ্রীমহাপ্রভু 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। কৃষ্ণ, জীব ও ইতর জগৎ---ইহাঁদের মধ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলেই সম্বন্ধ-জ্ঞান হয়। কৃষ্ণই একমাত্র সেব্যবস্তু, জীব তাঁহার নিত্য সেবক এবং ইতর-জগৎ অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ---বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণের সহিত লীলার ভূমি। এই জগতে চিদণুস্বরূপ জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া দণ্ড্যস্বরূপে বদ্ধ আছেন। কৃষ্ণ

কৃপা করিয়া জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনন্ত লীলা প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল বিষয়ে যে শুদ্ধজ্ঞান, তাহাই সম্বন্ধ-জ্ঞান। সাধুসঙ্গে জীবের যে ভক্তির উদয় হয়, তদ্দ্বারা এই জ্ঞানটী জীবচিত্তে ভক্তিবলে উদিত হইয়া থাকে। ভক্তির ক্রিয়া দ্বারা জীবের এই প্রাকৃত জগতের প্রতি যে তাচ্ছিল্য স্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তাহাই বৈরাগ্য। ভক্তিজনিত জ্ঞানে মোক্ষাভিসন্ধি থাকে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে স্পৃহা ভক্তির বিরোধী তত্ত্ব। ইহারই নাম--শুদ্ধ-অদ্বয়জ্ঞান। ভক্তিই শুদ্ধ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের একমাত্র জননী। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন; —

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।।"

আত্মা যখন শুদ্ধভক্তিযোগে পরমাত্মাকে স্ব-সত্তায় দেখিতে পান, তখন ঐ শুদ্ধভক্তির ক্রিয়ায় জ্ঞান-বৈরাগ্যের সাহচর্য্য পরিলক্ষিত হয়, যথা ভাগবতে (১।২।১২); —

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া।।

তাহার প্রক্রিয়া ভাগবতে (১।২।১৫, ১৭-২১) বলিয়াছেন, যথা; —

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্।।
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।।
নষ্ট প্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।।
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি।।
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে।।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।

ভগবদ্বিষয়িনী দ্রবময়ী রতিই আত্মার সহজধর্ম্ম। বিষয়রাগে মুগ্ধ জীবের সেই রতি অপ্রকাশ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে সর্ব্বাত্মার আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ মায়ার অধীশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যখন ঐ রতি কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধাকারে উদিত হয়, তখন সাধু-চরিত্র অনুসরণ দ্বারা স্বীয় চরিত্র পবিত্র করিতে ইচ্ছা হয়। তাহারও ক্রম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, যথা; —

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।

হে অর্জ্জুন, এই সংসার-যাতনা-সমুদ্রে পতিত কোটী কোটী জীবের মধ্যে কেহ বা সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে আমাকে ভজন করে। মূলে তাহারা কেহ আর্ত্ত হইয়া, কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া, কেহ কেহ অর্থার্থী হইয়া, কেহ বা জ্ঞানী হইয়া, সাধুসঙ্গাশ্রয়ে আমার তত্ত্ব অবগত হইয়া ঐ আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থকামনা ও জ্ঞানরূপ সংসার-কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ ভজন করে। গজেন্দ্র, শৌনক, ধ্রুব ও শুক প্রভৃতি মহাত্মাগণই ঐ বিষয়ের উদাহরণ। সংসারক্লেশক্লিষ্ট হইয়াই তাঁহারা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী হন অর্থাৎ পীড়া, শত্রু ইত্যাদি দ্বারা আর্ত্ত, কিসে সংসার-কষ্ট হইতে উদ্ধার হইব—এই অনুসন্ধান হইতে জিজ্ঞাসু, কিসে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,—এই ভাবনায় অর্থার্থী এবং কিসে সংসার-মুক্ত হইবে,—এই ভাবনায় দর্শনাদির আলোচনাক্রমে 'আমি ব্রহ্ম' বা 'ঈশ্বরাদি কেহ নই, আমাদের মরণেই সকল লাভ'—এই প্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞানাভিমানী হইয়া পড়ে। জ্ঞানীদের মধ্যে যাহারা আমার তত্ত্ব ও সম্বন্ধ জানিয়া ভাল জ্ঞানী হয়। তাহারাই ঐ চারি শ্রেণীর মধ্যে আমার অধিক প্রিয় হয়। সুতরাং তাহারা সকলে সাধুকৃপায় ভজন-প্রক্রিয়া অবগত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার ভজন করে। আবার ভাগবতে (১১।২০।২৭-২৮) বলিয়াছেন; —

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।

এই প্রকারে লোকে কৃষ্ণভজন আরম্ভ করিলেও তাঁহারা বিরল। অতএব শ্রীরূপ-শিক্ষায় মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।।

গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে কোন ভাগ্যবান্ শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণ-নামে, কৃষ্ণ-গুণে ও কৃষ্ণ-কথায় শ্রদ্ধা লাভ করিলে তিনি ক্রমশঃ গুরূপদেশক্রমে কৃষ্ণকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুধ্যাসন করিতে থাকেন, তাহাতে তিনি স্বীয় কর্ম্মগ্রন্থি যে অবিদ্যা তাহা ছেদন করিতে সক্ষম হন। এই স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, না রাখিলে সমস্ত বিফল হইবে; কৈতব বা কপটতা ও ভুক্তি-মক্তি-স্পৃহা একেবারে দূর না করিলে আত্মধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে না। সাধুসুহৃৎ, চিত্ত-ননীচোর কৃষ্ণ স্বীয় কথার অকৈতব আলোচনা দেখিবামাত্র ঐ চিত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক হৃদ্যন্তঃস্থ হইয়া সমস্ত অভদ্র ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করেন। অভদ্র গুলি নিত্য ভাগবত-সেবার দ্বারা নষ্ট প্রায় হইলে কৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। অভদ্রগুলির মধ্যে বিষয়াসক্তিই প্রধানরূপে পরিগণিত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে যে আসক্তি থাকে, তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় হয়, ইহাই ভক্তিজনিত বৈরগ্য। বৈরাগ্য-জন্য পৃথক্ অভ্যাস করিতে হয় না। ভক্তিসম্বন্ধীয় একাদশ্যাদি ব্রত-পালনে অসদাভ্যাস স্বয়ং দূর হয় ও সদাভ্যাস বলবান্ হয়। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, ততই বৈরাগ্য নিজে নিজে বৃদ্ধি ও সম্বন্ধ-জ্ঞানের বল বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং রজস্তমোভাব ও কামলোভাদি দৌরাত্ম্য আর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। চিত্ত রজস্তম-কাম-লোভাদি দ্বারা যতই অনাবৃত থাকিবে, ততই সত্ত্বে স্থিতি লাভ করিয়া প্রসন্ন হইতে থাকিবে। এইরূপ প্রসন্নমনা হইলেই ভগবদ্ভক্তিযোগের প্রভাবে ভগবত্ততত্ত্ব বিজ্ঞানরূপ ভাবভক্তি মুক্তসঙ্গ পুরুষের উদয় হয়। এই অবস্থায় জীবের বৈরাগ্য-চিহ্নাদি গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মে। কেননা, তখন সংসারগ্রন্থি নিজে নিজেই ছিন্ন হয়। সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। যেহেতু, তখন সর্ব্বাত্মার আত্মা যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আত্মতত্ত্বে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়।

বিকাশ-ক্রম যে পর্য্যন্ত না অবলম্বিত হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই বলিলেও হয়। ভেকমাত্র গ্রহণ করিয়াই 'আমাদের আত্মবিকাশ-ক্রম উদয় হইয়াছে,' এরূপ মনে করিলে আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। আমাদের সাধকাবস্থায়

এ বিষয়টী প্রতিদিন সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সতর্ক হইবার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী পদ্ধতি বলিয়াছেন যথা; —

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্রচৈষত্রিকঃ একঃ কালঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।

আমাদের প্রতিদিন দেখা উচিত যে, আমাদের শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে কিনা। যদি না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আমাদের ভক্তি-চেষ্টায় কৈতব আছে। সেই কৈতবকে বহু যত্নে দূর করিতে হইবে। ইহারই নাম ক্রমোর্দ্ধ গমন।

এই বৈরাগ্য-কাণ্ডে এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাগুলি অনুশীলন করিতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ৬ পঃ)—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।

যাহা দেখি প্রীত হন গৌর-ভগবান্।।

পুনরায় এই গ্রন্থের মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদে—

সনাতনের বৈরাগ্যে মহাপ্রভুর আনন্দ অপার।

*　　*　　*　　*　　*

যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল।

শুষ্কবৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল।।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন----

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজ-ভক্তি-যোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবশেষে (১২।১৩।১৮) লিখিয়াছেন; —

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং

যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।

তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং

তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।

এই শ্লোকেও জ্ঞান, বিরাগ ও ভক্তির ক্রিয়া দ্বারা যে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ক্রিয়াস্থিতি, তাহা কথিত হইল। বৈরাগ্য---সহজ-ভক্তির একটী অবান্তর ফল, তাহা বুঝিতে পারিলে আর বৈরাগ্যের জন্য পৃথক্ প্রয়াস থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভক্তিতে স্থিতি লাভ না করিয়াই বৈরাগ্যের প্রয়াস করেন, তাঁহাদের জীবন বৃথা হইয়া পড়ে এবং অবশেষে উৎপাত আসিয়া তাঁহাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করে; যথা (ভাঃ ৩।২৩।৫৬); ---

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।

দেহ-যাত্রার জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করা যায় এবং সমাজযাত্রার জন্য যে সকল নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম কৃত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত যদি ধর্ম্ম-উদ্দেশে কৃত না হয়, তবে নিতান্ত হেয়; ধর্ম্ম-উদ্দেশে কৃত হইলে কর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলি; ঐ ধর্ম্ম যদি বিরাগের উদ্দেশে না করা যায়, তাহা হইলে তাহাও নিতান্ত হেয়। বিরাগের জন্য যদি ঐ সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায়, তখন ঐ ধর্ম্মকে 'বৈরাগ্য' বলি। বৈরাগ্যও যদি ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে না করা হয়, তাহাও নিতান্ত হেয়। সেই রূপ বৈরাগীকে জীবিত অবস্থায় শবতুল্য অকর্ম্মণ্য পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত মতে ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ভক্তির অবান্তর ফলস্বরূপ জানিয়া বৈরাগ্য স্বীকার না করিলে মঙ্গল নাই। সুতরাং বৈরাগ্য প্রয়োজনতত্ত্বে স্থান না পাইলেও তাহা সাধুলোকের অবশ্যলভ্য ধর্ম্মবিশেষ। ভক্তিমান্ পুরুষকেঅবশ্য বৈরাগী হইতে হইবেই হইবে। যাঁহার যতটুকু ভক্তি, তাঁহার ততটুকু সহজ বৈরাগ্য। যে স্থলে অধিক ভক্তি দেখা যায়, অথচ বৈরাগ্য নাই, সে স্থলেই মূলে ভক্তি-সম্বন্ধে নিশ্চয় সন্দেহ করিতে হইবে। ভক্তি যখন বিশেষ বল লাভ করেন, তখন বৈরাগ্যও প্রবল হইয়া ভক্তের সংসার ছেদন করেন। ক্রমে ক্রমে মায়াবন্ধন হইতে সহজ মুক্তি, নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। গীতায় বলিয়াছেন---

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।

জড়-সম্বন্ধে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য হইবামাত্র ভক্তের ভক্তি ভাবাকারে উদিত হয়, তাহার নাম প্রেমভক্তি। যে মুক্তিটি উদিত হইল, তাহা ভক্তিতে নিতান্ত

অনুগত হইয়া সন্তান বা নিতান্ত সেবকের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল; বৈরাগ্য বা মুক্তি আর স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে পরিলক্ষিত হইল না। কর্ম্মসকল যেরূপ নৈষ্কর্ম্যরূপে পরিপাক হইয়া ভক্তি হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য নিজ নিজ ক্রিয়ার পরিপাকে ভক্তির সহিত সারূপ্য ও ক্রমশঃ সাযুজ্য লাভ করে। ভক্তি---নিত্য, অনাদি ও অন্তর। কর্ম্ম, বৈরাগ্য ও বিবেক---এ সকলই অনিত্য, সুতরাং নিত্যধর্ম্মে পরিণতি লাভ করে। এইরূপে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি, কৃষ্ণেতর জীব-সকলকে কৃষ্ণদাস বলিয়া ভ্রাতৃজ্ঞান, কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণ-প্রীতি-কামে কর্ম্মচেষ্টা--এই মাত্র স্থিতি হয়।

এখন কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, সংসারে অবস্থিত হইয়া বস্তুসিদ্ধি পর্য্যন্ত যদি এই সমস্ত সাধিত হইতে পারে, তবে কৌপীনাদি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? নিদাঘ, ঋভু, জনক, রামানন্দ, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া প্রেমভক্তির সাধন করিলেই যখন হয়, তখন পৃথক্ ত্যাগাবস্থার প্রয়োজন কি? বৈরাগ্যক্রমে কিছু আহার্য্য-সংগ্রহ ও কিছু পরিমাণ অর্থেরও প্রয়োজন, তবে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে ও বৈরাগ্যশ্রমে ভেদ কি? উত্তর এই যে, বৈরাগ্যাশ্রমে অনেকটা অর্থ-চেষ্টার লাঘব আছে। অল্পেই অভাব-মোচন হয়, নিরন্তর অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বেগ থাকে না। অকিঞ্চন-বেষে অনেক প্রকার বস্ত্র-সংগ্রহের প্রয়োজন থাকে না। এই জন্যই সনাতন গোস্বামী ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে রামানন্দকে বলিয়াছিলেন; —

ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম।।
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তার রীতি।
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি।।
সনাতনে কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন।।
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে তা'র করিহ পালন।।

গৃহস্থাশ্রমেই যে ভক্তিবলে বৈরাগ্য সাধিত হয়, এ কথা সত্য বটে, তথাপি শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথকে এইরূপ বলিয়াছেন,---

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ-কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে।।
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব বন্ধ।।
হেন-বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ষষ্ঠ পঃ)

অবস্থা-বিশেষে সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যশ্রম গ্রহণ করা যে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়, ইহাতে আর সংশয় কি? মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে ফল্গু-বৈরাগ্য পরিত্যাগ ও যুক্ত-বৈরাগ্যের স্বীকার করায় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু-বৈরাগ্যের ভেদ বিচার করিয়া না রাখিলে সংশয় দূর হয় না। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যুক্ত-বৈরাগ্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।

ফল্গু-বৈরাগ্যের লক্ষণ, যথা—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।।

ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয়-গ্রহণ করাকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলা যায়। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে অবশ্য বিচরণ করিবে। কৃষ্ণার্চ্চন-পদ্ধতি,যাহা পূর্ব্ব-মহাত্মাগণ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল ক্রিয়ায় বিষয়কে কৃষ্ণসেবার উপকরণ করিয়া সরলভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিলে কৃষ্ণ-সংসারে থাকিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্য হইতে পারে।

পক্ষান্তরে, এই প্রকার হরিসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত বস্তুসকল ও ব্যক্তিগণকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি করিয়া বিষয়-বন্ধ হইতে মুক্তির চেষ্টায় যে বৈরাগ্য-পন্থা করা যায়, তাহাই ফল্গু বৈরাগ্য। প্রথম সাধনকালে প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কি

প্রকার সাধন হয় এবং সেই সাধন কতদিনই বা থাকিতে পারে? ফলপাইবার কোন আশা সে সাধনে নাই।

ভক্তি-বিকাশের ক্রম-বিচারেই একথা দেখা যাইবে। আদৌ সংসারী জীব কোন সুকৃতিক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন। 'কৃষ্ণভক্তি আমার নিত্যধর্ম্ম এবং তদতিরিক্ত আমার নিত্যলাভ আর কিছুতেই নাই'—এইরূপ সাধু উপদেশে যে বিশ্বাস, তাহার নাম শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার উদয় হইলে সাধু-গুরু-সঙ্গ করিতে হয়। তাহাতে ভগবানের ভজন-শিক্ষা ক্রমশঃ হইয়া থাকে। নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত ভজন করিতে করিতে অনর্থ-সকল নিবৃত্তি হয়।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোহপি মনুতেহনর্থঃ তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
মায়ামুগ্ধস্য জীবস্য জ্ঞেয়োহনর্থশ্চতুর্ব্বিধঃ।
হৃদ্দৌর্ব্বল্যঞ্চাপরাধোহসত্তৃষ্ণা তত্ত্ববিভ্রমঃ।।
স্বতত্ত্বে পরতত্ত্বে চ সাধ্য-সাধন-তত্ত্বয়োঃ।
বিরোধিবিষয়েচৈব তত্ত্বভ্রমশ্চতুর্ব্বিধঃ।
ঐতিকেষ্বেষণা পারত্রিকেষু চৈষণাহশুভা।।
ভুক্তিবাঞ্ছা মুমুক্ষা চ হ্যসতৃষ্ণা চতুর্ব্বিধাঃ।
কৃষ্ণনাম-স্বরূপেষু তদীয়-চিৎকণেষু চ।
জ্ঞেয়া বুধগণৈর্নিত্যমপরাধাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।।
তুচ্ছাশক্তিঃ কুটীনাটী মাৎসর্য্যং স্ব প্রতিষ্ঠতা।
হৃদ্দৌর্ব্বল্যং বুধৈঃ শশ্বজ্জ্ঞেয়ং কিল চতুর্ব্বিধম্।।

এই সমস্ত অনর্থের মধ্যে স্বরূপবিভ্রমই প্রধান অবিদ্যাবন্ধন কার্য্য। যথা ভাগবতে (১১।২।৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।

'আমি---অমুক শর্ম্মা, আমার কর্ম্ম এই এই বিষয়-ভোগ'---এই যে জড়ে অহঙ্কার, ইহা হইতেই যত উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। ভজন করিতে করিতে যে অহঙ্কারের ক্রম-নিবৃত্তি, তাহাকে বৈরাগ্য বলি এবং ঐ অহঙ্কারের পূর্ণনিবৃত্তির নাম মুক্তি। সুতরাং মুক্তি ও বৈরাগ্য একই তত্ত্ব। ক্রম-গতিতে প্রথমে বৈরাগ্য ও চরমে মুক্তি হইয়া পড়ে। মুক্ত পুরুষেরই প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে।

এই ভয়ঙ্কর সংসার-বন্ধনকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ছেদন করা দুঃসাধ্য। সুতরাং ইতর-বিষয়ে যুক্তবৈরাগ্য না করিলে ভজন হয় না এবং ভজন না হইলেও প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। অবিচারিত বিধানের দ্বারা যাঁহারা সমস্ত সংসারবন্ধন ক্ষণেকে নাশ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই ফল্গু-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া চরমে নৈরাশ্য ভোগ করিতে থাকেন।

এবং নির্ব্বিষয়ং চেতঃ ক্রমাদ্ভবতি নান্যথা।
ক্রমং বিসৃজ্য রভসাদারুরুক্ষুঃ পতত্যধঃ।।

ভজন-বিকাশ-ক্রম যিনি ভালরূপ বুঝিলেন না, তিনি অবশ্য আরুরুক্ষু অবস্থা হইতে অধঃপতিত হইবেন, ইহা নৈসর্গিক ধর্ম্ম। সুতরাং ভজনকারীর পক্ষে যুক্তবৈরাগ্য নিতান্ত অবলম্বনীয়। ভজনপক্ক হইতে হইতে দুইটী অবস্থায় সাধক কৌপীন ধারণপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিতে পারেন। ভজন হইতেছে, কিন্তু সে সময় গৃহ তাঁহার পক্ষে যদি ভজনবিরোধী হয়, এ কথাটী সাধু সাধক সে সময়ে স্বীয় সদ্‌বুদ্ধি এবং সদ্‌গুরূপদেশ আশ্রয় পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবেন। আবার সম্পূর্ণ বিরাগ হইয়াছে, আর গৃহ ভাল লাগে না, এইরূপ স্থির-বৈরাগ্য হৃদয়ে উদিত হইলে গৃহত্যাগ করিতে পারেন। কৃষ্ণ-ভজনের স্বভাব ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত যিনি ভজন আরম্ভ করেন, অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার ভক্তিবিষয়িনী শ্রদ্ধা অনেকটা অনর্থহীন হইয়া পরে নিষ্ঠা হইয়া পড়ে ও নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেযামভীপ্সিতঃ।।

ভজন চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে অনর্থ আরও অধিক পরিষ্কৃত হওয়ায় ভক্তিবিষয়িনী নিষ্ঠা রুচি হইয়া পড়ে। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিষয়িনী রুচি ক্রমশঃ আসক্তি হয়। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিষয়িনী আসক্তি ভাবরূপা হয়। ঐ প্রক্রিয়া-

ক্রমে ভক্তিবিষয়ক ভাব রতি হয়; ভাব-রতি ক্রমশঃ ঐ প্রকারে ভক্তিরস হয়। ইহাই ভক্তির বিকাশক্রম। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্য ও জ্ঞান মুক্তিরূপে সহজে পরিণত হইয়া কৃষ্ণকৃপায় ভক্তির স্বরূপে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। তখন অখণ্ড প্রেম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়া অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ স্বীয় জ্যোৎস্না বিস্তার পূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীব্রজ-রসকে উদয় করায়।

ভজনের বিকাশের স্বরূপ কি ইহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কৃষ্ণ ও তদীয় সমস্ত পরিচয়---অপ্রাকৃত, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দতত্ত্ব। জীব ঐ তত্ত্ব-সূর্য্যের কিরণ-কণ হইয়া সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিবার যোগ্য-পাত্র। সম্প্রতি জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় স্বীয় স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও তদুভয়ের সংযোগ-স্বরূপ জৈব জ্ঞানে বিপর্য্যয়-ধর্ম্ম ভোগ করিতেছে। ঐ বিপর্য্যয়-ভাবটী দূরীভূত হইয়া স্বরূপভাবের উদয় করার যে চেষ্টা, তাহার নাম সাধন-ভজন। উদয় হইলে ভাব-ভজন ও সম্পূর্ণ উদয় হইলে প্রেম-ভজন আসিয়া পড়ে।

সাধন-ভজন কেবল অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা। বদ্ধজীবের যে লুক্কায়িত-প্রায় অপ্রাকৃত শুদ্ধভাব আছে, তাহাকে উদঘাটন করিতে সাধনের দৃঢ় প্রবৃত্তি। এরূপ সাধন না করিলে জীব পুনরায় স্বীয় অপ্রাকৃত স্বভাব পাইতে পারে না। এই কার্য্যে কিছু শুদ্ধ চেষ্টা ও কিয়ৎপরিমাণে কৃষ্ণ-কৃপার প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াটী বাক্যের দ্বারা বর্ণন ও অবিদ্যা-বন্ধ মনের দ্বারা চিন্তন করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। সুকৃতিমান্ সাধক সদ্গুরুর ভক্তিভাব ও চরিত্র অনুসরণ পূর্ব্বক যখন অত্রস্থ মায়িক দ্রব্য, দেশ, কাল, দেহ, চিন্তা, গৃহ, ভোজন, আচ্ছাদন ইত্যাদিতে অপ্রাকৃত ভাবকে মিশ্রিত করিয়া ভজন করেন, তখন অকিঞ্চন হইয়া কৃষ্ণ-চরণে শরণাপত্তি সহকারে অকৈতব আত্ম-দুঃখ নিবেদন করেন। তখন কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন। সেই তত্ত্বের আলোকে সাধকের অপ্রাকৃত চক্ষু ক্রমে উন্মীলিত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মসংহিতায়, যথা---

[illegible]
'মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

প্রেমাঞ্জনাচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়োহপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

এইরূপ কৃপা দর্শন হইলে প্রকৃত অপ্রাকৃত ভজন হইতে থাকে ও বিকাশ সহজে হয়। বহির্ম্মুখ চেষ্টা, অসত্তৃষ্ণা, ঔদাসীন্য, জাড্য ও অসৎসঙ্গ---এইগুলি অপ্রাকৃত চেষ্টায় মহা-প্রতিবন্ধক। মূল কথা এই যে, প্রাকৃত চেষ্টায় অপ্রাকৃত লাভ হয় না। কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনী মতি থাকিলে অপ্রাকৃত দেশ-কাল-দ্রব্যেও কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনী চেষ্টা হইতে পারে, তদাশ্রয়ে প্রাথমিক ভজন হয়, কিন্তু প্রাথমিক ভজনকালে সাধু-গুরু-কৃপায় যিনি কৃষ্ণ-নির্ব্বন্ধিনী মতিকে বরণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহার আর উপায় নাই। এই জন্য বিশেষ যত্নসহকারে সদ্‌গুরু-বরণেই সমস্ত লাভ হয়। অসদ্‌গুরুর-বরণ-স্থলে কেবল নিষ্ফল লৌকিক সাধনমাত্র হইয়া থাকে। ভাগবতে (২।৭।৪৬) শ্রীশুকদেব দৃঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতিধারণা যে।।

যাঁহারা বিশুদ্ধ সাধন-ভজন, সদ্‌গুরু ও সাধুসঙ্গকে অবহেলা করে, তাঁহাদের ভজনের ফল লাভ হয় না। হৃদয় কঠিন হইয়া কৈতবযুক্ত হইয়া যায় এবং অপ্রাকৃত ভাবকে স্পর্শ করে না; যথা শ্রীশুকবাক্যে (ভাঃ ২।৩।২৪); ---

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।

এখন বৈরাগ্যাশ্রিত মহাত্মাদিগের ব্যবহৃতি সম্বন্ধে যে দুইটী আচার্য্য-শিক্ষা ও শাস্ত্র-শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি; ---

শুনি' তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা।।

বৈরাগী করিবে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ।।
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধ নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।।
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ।।
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ।।
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।
গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্য-বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না পরিবে, আর ভাল না খাইবে।।
অমানী মানদ কৃষ্ণ-নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে।।

শাস্ত্রবাক্য, যথা ভাগবতে (১১।৭।৩৯)---

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ।।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীমন্মহাপ্রভু-বাক্য---

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং
পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।।
ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ।।

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ।।
শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তস্য মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ।।
যাবতা স্যা স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।

তাৎপর্য্য এই যে, বৈরাগ্য-চিহ্ন কৌপীন গ্রহণানন্তর বনবাস বা ভক্তদিগের দেবালয়ে কিম্বা বিশুদ্ধতীর্থে বাস, বিষয়িসঙ্গ-পরিত্যাগ এবং প্রত্যহ কৃষ্ণ যাহা দেন, তাহাতেই দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ করিয়া দিনযাপন, অসঞ্চয় ও যথালাভে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং কাহারও সহিত বা অন্যপ্রকার সঙ্গ না করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তন করা প্রয়োজন। মৃত্যু হইলে দেহের কি হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করা উচিত নহে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রয়োজন তত্ত্ব

প্রয়োজন তত্ত্ব

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সনাতনকে কহিতেছেন; —

"এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান।।
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়ী ভাব নাম।।"

প্রভুবাক্যের তাৎপর্য এই যে, ভক্তি প্রথমে সাধনাবস্থায় ভক্তি-নামে অভিহিত হন, পরে সাধনের ফল উদয়কালে সেই ভক্তিই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং ভক্তিই চরমে প্রেমরূপে উদিত হন। সাধন ভক্তির অবধি ভাব, রতি বা প্রীত্যঙ্কুর। * বৈধী ও রাগানুগা-সাধনের ধর্ম্মভেদ এই যে, বৈধী কিছু বিলম্বে ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাগানুগা ভক্তি অতি স্বল্পেই ভাবাবস্থা পাইয়া থাকেন। † শ্রদ্ধা রাগানুগা ভক্তদিগের-হৃদয়-নিষ্ঠাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রুচিরূপে উদয় হয়। সুতরাং ভাব হইতে তাহাতে বিলম্ব হয় না। ∇

---

* পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্মিস্তুষ্টির্নিবৃতির্মিথ আত্মনঃ।।
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম।। (ভাঃ ১১।৩।৩০-৩১)

† শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্যাণ্যুদ্দামানি হরের্ম্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ।। (ভাঃ ৬।৩।৩২)

∇ কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা।।
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নয়াদ্‌যত্নবানপি।। (ভাঃ ১১।১২।৮-৯)

সাধকের হৃদয়ে যে সময়ে ভাবের উদয় হয়, তখনই নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু বলিলেন; —

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়।।
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়।।
সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি জানে।।
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নাম-গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণ-নাম।।
কৃষ্ণ গুণাখ্যানে করে সর্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্বদা বসতি।।"

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতের পঞ্চম বৃষ্টি আলোচনা করিলে প্রভুর এই সকল উপদেশের বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। প্রেমলক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ। অতএব তৎসম্বন্ধে প্রভুবাক্য এই যে; —

"কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন।।
যার চিত্তে কৃষ্ণ প্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।।"

* * * * *

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।।

(ভাঃ ১১।৩।৩২)

প্রেম---শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে পঞ্চবিধ। মধুর প্রেম ও মধুর রস সর্বাপেক্ষা উত্তম। মধুর রসে কৃষ্ণমাধুর্য পরম সীমা লাভ করিয়াছে। * মধুর-রসস্থিত ভক্ত প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। † চতুঃষষ্টিগুণ কৃষ্ণে সম্পূর্ণ ব্রজমধুররসে লক্ষিত হয়। ব্রজভক্তেও তদ্রূপ অনন্ত মাধুর্য উদিত হইয়া পড়ে। ভক্তগণচূড়ামণি শ্রীমতী রাধিকা-সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন; ---

"অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্।।"

যাঁহারা পরমভাগ্যবলে মধুর রসের অধিকারী হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই রসের আস্বাদন পান। ∇ বিচারদ্বারা ইহা কাহাকেও বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব প্রভু বলিলেন যে; ---

"এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯৩)

এই সমস্ত প্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া অবশেষে প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল যে শুষ্কবৈরাগ্যত্যাগ (তাহা) (এবং) তৎপ্রাপ্তির অনুকূল যুক্ত-বৈরাগ্যর স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন, যথা; ---

---

* নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।।
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।।

(ভাঃ ১০।২৯।১৪-১৫)

† ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশেকুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।

(ভাঃ ৯।৪।৬৬)

∇ স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ।।

(ভাঃ ৪।২৯।৫১)

"যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান নিষেধিল।।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯৩)

যুক্তি ও যুক্তির অনুকূল বেদবাক্যের লক্ষণ দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তি মনে স্থির করেন যে, আমি ব্রহ্ম বটে, কিন্তু প্রপঞ্চজড়িত হইয়া ব্রহ্মানুভব হইতে দূরে পড়িয়াছি। প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? মানবদেহটা ত' প্রপঞ্চ, গৃহপ্রপঞ্চ, স্ত্রীপুত্র প্রপঞ্চ, আহারাদি প্রপঞ্চ,—সকলই প্রপঞ্চ। কি করিয়া এই প্রাপঞ্চিক উৎপাত হইতে উদ্ধার হই? —এই ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া দেহকে বিভূতি ইত্যাদি মাখাইয়া কৌপীনাদিদ্বারা আচ্ছাদন করেন। শুষ্ক দ্রব্যাদি খাইয়া স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করতঃ আপনাকে মুমুক্ষু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য গৃহাদি ত্যাগপূর্বক বনে বিচরণ করেন বা মঠে বাস করেন। তাহা করিয়া কি লাভ হইবে, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া যে হরিসম্বন্ধদ্বারা উদ্ধার হইয়া যায়, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া শুষ্কজ্ঞানমাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। পাপও গেল, পুণ্যও গেল, আমি ও আমার সকলই গেল বটে, কিন্তু কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলেন না। বেদান্তের অধিকরণের সহিত দিনযাপন করিতে লাগিলেন। মৃত্যু হইল, তাঁহার মতের আর দুই চারিজন আসিয়া তাঁহার মস্তকে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে ভূমিতে রাখিলেন। কি হইল? হরি ত' মিলিলেন না। তাঁহার ব্রহ্ম হওয়া সেই পর্যন্ত। তাহা না করিয়া যদি তিনি দেহে, গেহে, ভোজনে, শয়নে, কালে, দিক্‌সমূহে হরিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুশীলন করতঃ ক্রমশ ভক্তিবৃদ্ধি করিতেন, তবে চরমফল যে প্রেম, তাহা অবশ্য লাভ করিতেন *। এইরূপ বৈরাগ্যের নাম ফল্গুবৈরাগ্য।

প্রভু তাহা নিষেধ করিয়া সনাতনকে যুক্তবৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং দাস গোস্বামীকেও সেই শিক্ষা দিয়াছেন। যথা,—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।।

---

* জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃসর্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৩৭-৩৯)

স্বচ্ছন্দে দিনযাপনমানসে গৃহে স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া অন্তরনিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে পারিলে ক্রমে প্রপঞ্চ খসিয়া পড়ে। আত্মা ভক্তিবলে বলীয়ান হইয়া ভগবৎ-সম্বন্ধে স্থিত হন *। নতুবা মুমুক্ষু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য করিয়া ফেলে। যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর—এই আজ্ঞার তাৎপর্য এই যে, ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর। আত্মপ্রসাদ ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে ছাড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চনার উপকরণ, সমাজ সকলই যুক্তবৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলে সব লাভ হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোকব্যবহারমাত্র। অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপট-ভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরেই তিরোহিত হয়। ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্যই বাড়িতে থাকিবে।

সরল ভক্তজীবনে কেবল কৃষ্ণনামাশ্রয় সর্বোত্তম সাধন † । প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন; —

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি।।

---

* ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্প্যতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ।। (ভাঃ ১।২।৯-১০)

† প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।। (ভাঃ ১১।২০।২৯-৩০)

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য)

আবার বলিয়াছেন; —

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন।।
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য ।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত--হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৬৫-৬৮)

প্রভুর বাক্যগুলির নির্গলিতার্থ এই যে, যদি ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়, তবে সৎসঙ্গে হরিনাম গ্রহণ কর। কর্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় চিত্তকে চঞ্চল করিবে না। সংখ্যাবিধিক্রমে "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম নিরন্তর কীর্তন করিবার যত্ন কর। দেহ, গেহ ও সমাজকে নামানুশীলনের অনুকূল করিয়া সেই সেই পদার্থের রক্ষণাবেক্ষণে যতটা প্রয়াস হয়, তাহা নিষ্কপটে কৃষ্ণার্পণ করিয়া করিবে। আর কোন বিষয়ে প্রয়াস এবং এই এই বিষয়েও অতি প্রয়াস করিবে না। ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু আহার করিবে না বা অন্য বিষয়ে ব্যবহার করিবে না। জীবের শুদ্ধজ্ঞান এবং অনুকূল রাগাদি ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয় যাহাতে নাশ বা বিকৃত না হয়, এরূপ প্রাণবৃত্তিরূপ পরিমিত সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহ-রক্ষা কর। অধিক প্রয়াস ও কষ্টসাধ্য না হয়, এরূপ নির্জন আবাস স্বীকার কর। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়, এরূপ একটী সমাজে থাকিয়া তদুন্নতির যত্ন কর। এ সমস্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, নিশ্চিত হইয়া নির্জনে দৃঢ় যত্নের সহিত ভজন করিবে। যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ একবারে বর্জন কর। অভক্তসঙ্গ না হয়, এরূপ বিশেষ সতর্ক হও। পরচর্চা পরিত্যাগ কর। নিজে আপনাকে নিষ্কপটে অতিশয় দীন বলিয়া জান। তিতিক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে সকল বিষয় সহ্য করিয়া জগতের যথার্থ

উপকার কর। নিজের বর্ণ, ধন, জন, রূপ, বল, পার্থিব-বিদ্যা, পদ ইত্যাদির কোন অভিমান রাখিবে না। সকল ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য সম্মান কর। এই প্রকার জীবনে নিরন্তর ভাবপূর্ণ হরিনাম কর। ইহাতেই কৃষ্ণকৃপা হইতে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিবে।

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্তিদাশুচি।। (ভাঃ ১১।২৫।২৮)
বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্।। (ভাঃ ১১।২৫।২৫)

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,— (এ) সমুদায় তোমার কিঙ্করস্বরূপ কার্য করিবে। কিয়ৎপরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকারপূর্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করতঃ তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্মে দুইটী মাত্র কথা অর্থাৎ "নামে রুচি ও জীবে দয়া।" এই ধর্ম যাঁহার যে পরিমাণে থাকে, তিনি ততই বৈষ্ণব (১)। অন্য সদ্‌গুণ লাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভক্তজনের সকল গুণই আপনি উদয় হয় (২)। ভক্তগণ স্বভাবতঃ শ্রেয়ঃ আচরণে সর্বদা আনন্দ লাভ করেন (৩)। কৃষ্ণদাস হইলে আর জীবের কোন দুঃখ বা ক্লেশ থাকে না (৪)। গুরু ও আত্মীয়বর্গ কোন্ সময়ে সঙ্গযোগ্য তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। ভাবুক ভক্তের

---

(১) সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্।। (ভাঃ ১০।৪১।৫১)
(২) যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ (ভাঃ ৫।১৮।১২)
(৩) এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।। (ভাঃ ১০।২২। ৩৫)
(৪) তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।। (ভাঃ ১০।১৪।৩৬)

জীবন অতিশয় পবিত্র। তাঁহাদের রুচি সর্বদা বিশুদ্ধ। এই সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্ত-সার শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন— (যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্য, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) ঃ—

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে বলিল।
তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল।।
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে।।
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়।।
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।।
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে।।
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পারে সবিশেষ।।

এই উপদেশে গূঢ়রূপে প্রভু দাসগোস্বামীকে অষ্টকাল-ভজনপ্রণালী বলিয়াছিলেন। ভাবভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বৈধ-ভক্তির যে উত্তম ও একান্তভাবে অনুশীলনবুদ্ধি, (তাহাকে) আবার প্রেমভক্তির আবির্ভাব লভ্য করিয়া ভাবভক্তির নির্বন্ধিত অনুশীলনবুদ্ধিকে নির্বন্ধিনী মতি বলা যায়। সেই নির্বন্ধিনী মতি থাকিলে ভক্তিসিদ্ধি অতি শীঘ্রই ঘটে। ইহার অপর নাম উপযুক্ত যত্নাগ্রহ *। সাধকগণ প্রথমেই নির্বন্ধিনী মতির আশ্রয় করিবেন। যত্নাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে উদাসীন হইবেন।

---

* সদ্ধর্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্বার্থ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।। (নারদীয়বাক্যম্)

প্রেমোৎপত্তির ক্রম

সংসার ভ্রমণ করিতে জীবের দৈবাৎ ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয়। শুদ্ধভক্তির যে সকল অঙ্গ নির্দিষ্ট আছে, তাহার কোনটী না কোনটীর কার্য নরজীবনে দৈবাৎ কৃত হয়, যথা—ঘটনাক্রমে একাদশাদি দিবসে উপবাস, ভগবল্লীলা তীর্থের দর্শন ও সংস্পর্শ, অতিথি-বোধে শুদ্ধ ভক্তের উপকার, নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের বদন-নির্গত হরিনামাদির কথা বা গীত-শ্রবণ। উক্ত সমস্ত কার্যে যাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে উহারা ভক্তিপ্রদ সুকৃতি হয় না। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল ঘটনাক্রমে বা লোকদৃষ্টিতে যদি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা-রহিত হইয়া ঐ সমস্ত কার্য করে, তাহা হইলে ঐ সকল কার্যে ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয়; সেই ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বহু জন্মে পুঞ্জীভূত হইলে বল লাভ করিয়া অনন্যভক্তিতে 'শ্রদ্ধা' উদয় করায়। অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে 'শুদ্ধভক্ত-সাধুর সঙ্গ' করিবার স্পৃহা জন্মে; ভক্তসাধুগণের সঙ্গ হইলে 'সাধন ও ভজন' ক্রমে ক্রমে হয়; ভজন করিতে করিতে 'অনর্থসকল' দূর হয়; অনর্থ দূর হইলে পূর্বে যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নির্মল হইয়া 'নিষ্ঠা'-রূপে পরিণত হয়; নিষ্ঠা ক্রমশঃ অধিকতর নির্মল হইয়া 'রুচি' হইয়া পড়ে; রুচি ভক্তির সৌন্দর্যে বদ্ধ হইয়া 'আসক্তি' রূপে পরিণত হয়; আসক্তি ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিলে 'ভাব বা রতি' হয়; রতি সামগ্রীযোগে 'রস' হয়—ইহাই 'প্রেমোৎপত্তির ক্রম'। মূল কথা এই যে, শুদ্ধ সাধু-দর্শনে সুকৃত পুরুষের সাধু-অনুগমনের প্রবৃত্তি জন্মে। সিদ্ধান্ত এই যে, ঘটনাক্রমে প্রথমে সাধুসঙ্গ, পরে শ্রদ্ধা ও পরে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ হয়। প্রথম সাধুসঙ্গের ফল শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার অপর নাম শরণাপত্তি। হরিপ্রিয় দেশ, কাল, দ্রব্য ও পাত্র—এই সকলের সন্নিকর্ষই প্রথম সাধুসঙ্গ; প্রথম সাধু সঙ্গের ফল যে শরণাপত্তিরূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহার লক্ষণ 'গীতা'র (১৮।৬৬) চরম শ্লোকে দ্রষ্টব্য—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"

অর্থাৎ স্মার্ত্যধর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি ধর্মসকল 'সর্বধর্ম'-শব্দে উক্ত হইয়াছে; সেই সকল ধর্মের দ্বারা জীবের প্রয়োজন সাধন হইতে পারে না, এইরূপ বুদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই সেই ধর্মত্যাগের কথার উল্লেখ।

সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ আমি ব্রজবিলাসী কৃষ্ণই জীবের একমাত্র গতি, ইহা জানিয়া অনন্যভাবে ভোগমোক্ষাদিচিন্তারহিত হইয়া আমার শরণাগত হওয়াই প্রপত্তিরূপ শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা উদিত হইলে জীব কাঁদিতে কাঁদিতে বৈষ্ণবসাধুর অনুগমনে রত হয়; এইবার যে সাধুর আশ্রয় করেন, তিনিই গুরু।

অনর্থ চারি প্রকার— ১। স্ব-স্বরূপের 'অপ্রাপ্তি', ২। 'অসত্তৃষ্ণা', ৩। 'অপরাধ', ৪। 'হৃদয় দৌর্বল্য'। আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস--ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধজীব দূরে পড়িয়াছেন; সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ; জড়বস্তুতে অহংমমাদি বুদ্ধি করিয়া অসদ্‌বিষয়ে সুখাদির তৃষ্ণাকে অসতৃষ্ণা বলি। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা---এই তিন প্রকার অসত্তৃষ্ণা। নাম অপরাধ দশবিধ। হৃদয়-দৌর্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারিপ্রকার অনর্থ অবিদ্যাবদ্ধ-জীবের নৈসর্গিক ফল। সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়। যোগাদি অন্যান্য পন্থায় প্রত্যাহার যম-নিয়ম-বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয়ের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা উদ্বেগরহিত উপায় নয়; তাহাতে পতনের অনেক আশঙ্কা আছে এবং তদ্দ্বারা চরমে শুভ হওয়া নিতান্ত কঠিন। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই উদ্বেগশূন্য উপায়। অনর্থগুলি যত যায়, মায়িক দশা ততই তিরোহিত হয়; মায়িক দশা যে পরিমাণে তিরোহিত হয়, জীবের স্বরূপ সেই পরিমাণে উদিত হইতে থাকে।

অনর্থমুক্ত ব্যক্তিগণই শুদ্ধভক্ত। ভক্ত অতি দুর্লভ—কোটি কোটি মুক্তলোকের মধ্যে অন্বেষণ করিলে একটি কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায়, অতএব কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা আর দুর্লভ সঙ্গ জগতে মিলিবে না।

ভক্তিলতার প্রেমফল

জীব সকল আপন আপন কর্মসূত্রে নানাযোনিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহার ভক্তিজন্মোপযোগী সুকৃতিরূপ-ভাগ্যোদয় হয়, তিনি গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ যে 'শ্রদ্ধা', তাহা লাভ করেন। সেই বীজ পাইবামাত্র মালিস্বরূপ হইয়া নিজ হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা রোপণ করেন। বীজ রোপিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে হইতে ভগবৎকথা ও ভক্তকথার শ্রবণ-কীর্তন-রূপ জলে সেই ক্ষেত্রের সেচন করেন। ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে বাড়িতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমে স্থান প্রাপ্ত হয়। সেই পরব্যোমে লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন পর্যন্ত গমন করতঃ কৃষ্ণচরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। কৃষ্ণচরণারূঢ় ভক্তিলতাতেই 'প্রেমফল' ফলে। এ যাবৎ মালী শ্রবণ-কীর্তন-জল সেচন করিতে থাকেন। এই প্রক্রিয়া-সময়ে জলসেচন ব্যতীতআর একটি প্রক্রিয়া আছে। কিছুদিন জল সেচন করিতে করিতে লতা যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন অপর জন্তু আসিয়া তাহার পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে বা উত্তাপাদিতে পাতা শুকাইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় বৈষ্ণব-অপরাধই দুষ্ট জন্তু স্থলীয় বস্তু। সেই বৈষ্ণব-অপরাধই মত্ত হাতীর ন্যায় ঐ সমস্ত ক্ষতি করে। সে সময়ে মালী বেড়া দিয়া বা আবরণ প্রস্তুত করিয়া বিশেষ যত্ন করিতে থাকে, তাহাতে অপরাধ হস্তীর উদগম হয় না।

এই সময়ে আর একটি উৎপাত আছে---যে সময়ে ভক্তিলতা উঠিতে থাকে, সে সময়ে যদি উপশাখা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাতে দোষ জন্মে। উপশাখা যথা ভুক্তি-বাঞ্ছা, মুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, নিজের জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে শ্রবণ-কীর্তনাদি সেক জলে মূল-লতার প্রতিকূলে উপশাখাগণই অত্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপ-শাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্তন জল-সেচন সময়ে প্রথম হইতে ছেদন করিবেন; তাহা হইলেই, মূলশাখা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনে যায়। এই প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারি পুরুষার্থ ইহার নিকট তৃণতুল্য।

(দশবিধ নামাপরাধ— ১। সাধুনিন্দা, ২। কৃষ্ণেতর দেবতায় স্বতন্ত্র ভগবদ্-জ্ঞান, ৩। গুর্ববজ্ঞা, ৪। শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দন, ৫। শ্রীহরিনামে অর্থবাদ, ৬। শ্রীনামে-কল্পনা-জ্ঞান, ৭। শ্রীনামবলে পাপবুদ্ধি, ৮। শ্রীহরিনাম-গ্রহণকে প্রমাদ বশতঃ অন্য শুভকর্মের সহিত সমানজ্ঞান, ৯। জড়াসক্তি ক্রমে শ্রদ্ধাহীনে নাম-দান, ১০। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও জড় অহংমমাদি ভাব প্রযুক্ত নামের প্রতি অপ্রীতি। শ্রীনাম-পরায়ণ সাধক এই দশবিধ নামঅপরাধ অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন। গুরু-বৈষ্ণবে মর্ত্য বুদ্ধি এবং প্রাকৃত জাতিবুদ্ধি ভীষণ বৈষ্ণব-অপরাধ ও গুর্ববজ্ঞা অপরাধ।)

প্রীতি

'প্রীতি'—এই শব্দটি বড়ই মধুর, উচ্চারিত হইবা মাত্র উচ্চারণকারী ও শ্রোতাগণের হৃদয়ে একটী তীব্র মধুময় ভাব উদয় করায়। সকলে ইহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারে না, তবুও এ নামটী শুনিতে ভালবাসে। জীবমাত্রই প্রীতির বশীভূত। প্রীতির জন্য অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

প্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন—স্বার্থলাভই জীবের মুখ্য প্রয়োজন। তাহা নহে, প্রীতির জন্য মানবগণ সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দতা অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যেখানে স্বার্থ ও প্রীতির বিরোধ হয় সেখানে সর্ব্বত্র প্রীতির জয় হয়। বিশেষতঃ স্বার্থ প্রবল হইলেও সর্ব্বদা প্রীতির অধীন। স্বার্থই বা কি? যাহা নিজের প্রিয়, তাহাই স্বার্থ। সুতরাং মানবজীবন প্রীতির অধীন বলিলেও নিরর্থক বাক্য হয় না। স্বার্থাদি জীবনের তাৎপর্য্য হইলেও প্রীতিই জীবনের মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়া উঠে।

পরমার্থ-তত্ত্বেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যাঁহারা ঐহিক জগতের সুখকে অনিত্য মনে করিয়া পারমার্থিক সুখের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা হয় স্বীয় ভোগবাঞ্ছার পরবশ বা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত। যাঁহারা ভোগবাঞ্ছার বশীভূত, তাঁহারা ইহকালে ধন-ধান্য, রাজ্য-সম্পদ, পুত্র-কলত্রের অন্বেষণে ব্যস্ত, অথবা স্বর্গে ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, ব্রহ্মলোকাদিতে সুখে অবস্থিতি করিবার বাসনায় বিব্রত থাকেন। সেই সেই ভোগ তাঁহাদের প্রীতিকর বলিয়া তাহাতে ধাবিত হন। আবার যাঁহারা মুক্তিবাঞ্ছায় উত্তেজিত, তাঁহাদের সেই সেই ভোগ বিষয়ে প্রীতি হয় না। সেই সেই ভোগ হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনাই তাঁহাদের ভাল লাগে। সুতরাং মুক্তিতে তাঁহাদের প্রীতি বলিয়াই তাঁহারা মুক্তি অন্বেষণ করেন। ভোগবাঞ্ছাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগে প্রীতিলাভের আশা করেন। সুতরাং উভয়েরই পক্ষে প্রীতিলাভই শেষ প্রয়োজন। প্রীতিই পারমার্থিক সমস্ত চেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস প্রীতি, সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর এ তিন ভুবনসার।
এই মোর মনে, হয় রাতিদিনে, ইহা বই নাহি আর।।
বিধি একচিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমান কৈল 'পি'।
রসের সাগর, মন্থন করিতে, তাহে উপজিল 'রী'।।
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে ভিয়াঁইল 'তি'।
সকল সুখের, এ তিন আখর, তুলনা দিব সে কি'?
যাহার মরমে পশিল যতনে, এ তিন আখর-সার।
ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতিকূল তার।
এহেন পিরীতি, না জানি কি রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।।"

পদার্থ দুই প্রকার—চিৎ ও জড়। জড়কে চিদ্বস্তুর প্রতিফলন বা ছায়া বলিলেও হয়। মুল বস্তুতে যাহা থাকে, ছায়াতেও তাহার কিয়ৎস্বরূপে বর্ত্তমান হয়। সুতরাং মূলবস্তুরূপ চিত্তত্ত্বে যাহা আছে, জড়েও তাহা অবশ্য থাকিবে।

চিৎ পদার্থে কি ধর্ম্ম আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, প্রীতিই চিদ্বস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিতরূপে জড়বস্তুতেও কিয়ৎ স্বরূপে অবশ্য বর্ত্তমান আছে। জড় যেরূপ চিদ্বস্তুর বিকৃতি, (জড়বিষয়ক) আকর্ষণ ও গতিও তদ্রূপ প্রীতিধর্ম্মের বিকৃতি। সেই বিকৃতিই জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। জড়ীয় পরমাণুমাত্রেই আকর্ষণ ও গতিরূপ প্রীতির বিকৃত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক, প্রীতির স্বরূপ কি?

আকর্ষণ ও গতি বিশুদ্ধভাবে চিদ্বস্তুতে প্রীতিরূপে লক্ষিত হয়। আত্মাই চিদ্বস্তু; আত্মা শব্দে পরমাত্মা অর্থাৎ বিভূচৈতন্য এবং জীবাত্মা অণুচৈতন্য উভয়কেই বুঝিতে হইবে। বিভুচৈতন্য এবং অণুচৈতন্য উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। বিশুদ্ধ প্রীতি ধর্ম্ম আত্মা ব্যতীত আর কিছুতেই নাই। আত্মার ছায়া যে মায়া-প্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃতি মাত্র আছে, ধর্ম্ম স্বয়ং নাই। এই কারণে জড় জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধস্বরূপ নাই; প্রীতির বিকৃত স্বরূপ আকর্ষণ ও গতিমাত্র তাহাতে আছে। সেই বিকৃতধর্ম্মানুসারে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া স্থূল হয়। আবার স্থূল বস্তুসকল পরস্পর

আকর্ষণদ্বারা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। স্বতন্ত্র গতি-শক্তিদ্বারা পৃথক্ হইয়া সূর্য্যাদি মণ্ডল-সকলের ভ্রমণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। প্রতিফলিত বস্তু ও বস্তু-ধর্ম্মে যাহা দেখিতেছি, তাহাই আবার বিশুদ্ধরূপে মূল বস্তুতে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

আত্মাতেও স্বতন্ত্রতা ও আকর্ষণাধীনতা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। আত্মা জগতে বদ্ধজীবরূপে বর্ত্তমান। জীবাত্মা বা অণুচৈতন্য সংখ্যায় অ নন্ত। তাহা প্রীতি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। সেই প্রীতিধর্ম্মের পরিচয় এই যে, প্রত্যেক আত্মা পরস্পর আকর্ষণ করে অথচ প্রত্যেক আত্মা স্বতন্ত্রতাবশতঃ পৃথক্ হইয়া থাকিতে চায়। জড় জগতে অর্থাৎ প্রতিফলিত জগতে এক বস্তুকে অন্য বস্তু টানিয়া লইতে চায় এবং প্রত্যেক বস্তু স্বীয় স্বতন্ত্রগতিক্রমে পৃথক্ হইয়া যাইতে চায়। বৃহজ্জড় ক্ষুদ্রজড়কে টানে; সূর্য্য বৃহদ্বস্তু, সুতরাং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণকে আপনার দিকে টানে, কিন্তু সেই সেই গ্রহ ও উপগ্রহগণ স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্র গতিবলে সূর্য্য হইতে পৃথক্ থাকিতে গিয়া গোলাকারে ভ্রমণ করে। আবার গ্রহদিগের পরস্পর আকর্ষণ ও গতিও সেই কার্য্যের সহায় হইয়াছে। যে রূপ প্রতিফলিত জগতে দেখিতেছি, সেইরূপ চিজ্জগতে দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি (৮।১।১৩) বলিয়াছেন,—

"স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশ-স্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয়।
আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে।।
উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ-সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি।
যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।।"

প্রতিফলিত জগতে পঞ্চভূত চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র প্রভৃতি দেখিতেছ। সেই সমুদয়ই আদর্শরূপ চিজ্জগতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুরে তত্তদ্রূপে বিরাজমান। ভেদ এই যে, চিজ্জগতে সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার সমাহিত অর্থাৎ হেয়-পরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও আনন্দময়। জড়জগতে ঐ সমস্ত হেয়-পরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ সুখ-দুঃখজনক।

এখন দেখুন, চিজ্জগতের মূল ধর্ম্ম—প্রীতি, অতএব কবি চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন, কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যে জন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে।।"

"পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর, পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে, হইবে একই মত।।"

চিন্ময় বৃন্দাবনবিহারীই চিজ্জগতের সূর্য্য। জীবসমূহ তাঁহার লীলাপরিকর। কৃষ্ণ জীবকে প্রেমাকর্ষণ-ধর্ম্মে টানিতেছেন। জীবনিচয় নিজ স্বতন্ত্র গতিক্রমে তাঁহা হইতে পৃথক ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফল এই যে, বলবান্ আকর্ষণ জীবগণকে টানিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগতি পরাভূত হইয়াও জীবগণকে মণ্ডলাকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ফিরাইতেছে। ইহাই কৃষ্ণের নিত্যরাস, তন্মধ্যে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিগত সহচরীগণ বিশেষ নিকটস্থা। সাধন সিদ্ধ সহচরীগণ কিয়দ্দূরে অবস্থিতা। কৃষ্ণের চিন্ময়-লীলাই প্রীতিধর্ম্মের বিশুদ্ধ পরিচয়।

কৃষ্ণ কি সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন? যদি তাহা করেন তবে কেন সকল জীবই কৃষ্ণোন্মুখ নয়?

কৃষ্ণ সত্যই সকল জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জীব দুই প্রকার অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব স্বীয় প্রীতিকে স্পষ্ট অনুভব ও ক্রিয়াপর করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ মুক্তজীবের উপর স্বভাবতঃ বলবান্। বদ্ধজীব দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা একবারে কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ তাঁহাদের প্রীতিধর্ম্ম অত্যন্ত জড়গত হইয়া বিকৃত। সুতরাং বিষয়-প্রীতি ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু জানেন না। ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাঁহারা একান্তভাবে ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত আছেন। আপনাকে আপনি ভুলিয়া জড় সুখের অন্বেষণ করিতেছেন। আবার জড়সুখ সমৃদ্ধিকারী জড় বিজ্ঞানকে বহুমানন দ্বারা জড়পূজায় রত থাকেন। আত্মা কিছু নয়, আত্মচিন্তা কেবল ভ্রম, আত্মোন্নতিচেষ্টা কেবল মানসিক পীড়া—এইরূপ প্রলাপবাক্য আপনাদিগকে নিরন্তর বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বর্গসুখাদির জন্য বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ড প্রচার করতঃ আত্মজগতের সুখ হইতে বঞ্চিত হ'ন। বদ্ধজীবের মধ্যে কেহ কেহ বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া আত্মবিষয়ে শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধাবলে তাঁহারা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধাকর্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করতঃ কৃষ্ণাকৃষ্ট হন। বহুবিধ সাংসারিক, বৈজ্ঞানিক ও পারলৌকিক চেষ্টার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াও কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ ভোগ করেন। তাঁহাদের যেরূপ ভাব, তাহা শ্রীচণ্ডীদাস বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটী নয়নের তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতুলি, নিমিখে নিমিখহারা।।
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, যার মন যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধূ বিনে, আর কেহ মোর নয়।।
কি আর বুঝাও ধরম করম, মন স্বতন্তরী নয়।
কুলবতী হঞা, পিরীতি আরতি, আর কার জানি হয়।।
যে মোর করম কপালে আছিলা, বিধি মিলাওল তায়।
তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি থাক্ ঘরে কুল লই।।
গুরু দুরজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে, এ তনু বেচিনু তিল তুলসী দিয়া।।
পড়শী দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোকপাড়া।
চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি, জাতি কুল শীল ছাড়া।।"

জীব এ জগতে জড়াভিমানে আপনার স্বরূপ ভুলিয়াছেন। এই সংসারে অনেক প্রকার সম্বন্ধ পাতাইয়া অনেক লোকের সহিত নানাবিধ ব্যবহার করিতেছেন। লিঙ্গ শরীরকে 'আমি' করিয়া নিজে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-গঠিত একটী নতুন শরীর কল্পনা করিয়াছেন। সেই লিঙ্গ-শরীর-সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে সম্মান করতঃ নিজসম্পত্তি বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছেন। আবার ভূতময় স্থূলদেহে অহংজ্ঞানপ্রযুক্ত 'আমি অমুক ভট্টাচার্য্য' বা 'অমুক সাহেব' মনে করিয়া কতই রঙ্গ করিতেছেন। কখন মরেন, কখন জন্মগ্রহণ করেন, কখন সুখে ফুলিয়া উঠেন, কখন বা দুঃখে শুকাইয়া যান। ধন্য পরিবর্ত্তন। ধন্য মায়ার খেলা! পুরুষ হইয়া একটী মহিলাকে বিবাহ করিতেছেন, আবার স্ত্রীলোক হইয়া একটী পুরুষের হস্ত ধারণ করতঃ একটী প্রকাণ্ড, সংসার পত্তন করিতেছেন; সংসারে গুরুজনের সেবা, পাল্যজনকে পালন, রাজাকে ভয় এবং শত্রুকে ঘৃণা করিতেছেন। কুলবধূ হইয়া কতই লজ্জা ও লোকনিন্দার ভয় করিতেছেন। এই ছায়াবাজীর সংসারে মিথ্যাসম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া আপনার নিজ পরিচয় হইতে কত দূরে পড়িয়াছেন। এবম্বিধ আরোপিত সংসারে অবস্থিত জীবের কি দূর্দ্দশা! কতকগুলি সংসারের আরোপিত বিধিকে স্বীয় স্বামী জ্ঞান করিয়া নিত্যপতি কৃষ্ণকে একবারে ভুলিয়া

গিয়াছেন। এস্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধে একটা ভাব উদয় হয়। মহাপ্রভু নিজ শ্লোকে এ ভাবটি এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদত্যর্ন্তনবসঙ্গ-রসায়নম্।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১।২১১)

পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

সংসার-বিধি বদ্ধ জীবের শ্রীকৃষ্ণে বিশুদ্ধ প্রীতি উদয় হইবার পূর্ব্বেই এইপ্রকার পূর্ব্বরাগ হয়। ক্রমে অভিসার ও মিলন ঘটিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ কীর্ত্তিত হইলে শ্রবণ, সেই বিচিত্র সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির চিত্র-দর্শন এবং তাঁহার আকর্ষণীশক্তি-স্মরণ, বংশীনাদ-শ্রবণ হইতেই পূর্ব্বরাগ উদিত হয়। উদিত পূর্ব্বরাগ ব্যক্তির স্বজাতীয়া আশ্রয়যুক্ত সহচরীদিগের সহায়তায় মিলন হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ পুরুষের সহিত প্রীতি বদ্ধ মূল হইয়া উঠে।

চিজ্জগৎরূপ ব্রজধামে সচ্চিদানন্দ-লীলা নিত্য। জীব চিৎকণ, অতএব সেই লীলার অধিকারী। মায়াবদ্ধ হইয়া জীবের চিৎস্বরূপের পরিচয় যেমন লিঙ্গ-শরীরে ও স্থূলদেহে ভ্রান্তরূপে উদিত হইয়াছে—সেই চিৎস্বভাব যে বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-প্রীতি, তাহা জড় বিজ্ঞান-প্রীতি বা স্থূল-বিষয়-প্রীতিরূপে ভ্রান্তভাবে উদিত হইয়াছে। সুতরাং মাংস-গত প্রীতি বা মানস-ভাব-গত প্রীতি শুদ্ধ প্রীতির বিকৃতি মাত্র। ইহারা প্রীতি নয়। স্বীয়-স্বরূপ-ভ্রম ক্রমে ইহদিগকে প্রীতি বলিয়া উক্তি করা যায়। এক আত্মার অন্য আত্মাতে যে অনুরক্তি, তাহাই 'শুদ্ধ-প্রীতি'—শব্দের অর্থ; যথা বৃহদারণ্যকে (৪।৫।৬)—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যুপক্রম্যন বা অরে সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মানস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ঈদং সর্বং বিদিতমিতি।

যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী জড়জগতে ও লিঙ্গজগতে বিরাগ লাভ করতঃ স্বীয় পতির নিকট গমন পূর্ব্বক সদুপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—"হে মৈত্রেয়ী, স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বতঃ পতিকামনায় পতি প্রিয় হন না; কিন্তু

সকলের প্রিয় যে আত্মা, তাঁহার কামনায় পতি প্রিয় হন। সমস্ত বিষয়ই আত্মকামনায় প্রিয় হয়, সুতরাং জড়জগতে ও লিঙ্গশরীরে বিরাগপ্রাপ্ত জীব পরম প্রিয়বস্তু যে আত্মা, তাহাকে দর্শন মনন তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ করিবে, তাহা হইলে সমস্ত পরিজ্ঞাত হইবে। পরম প্রামাণিক এই বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্থূল ও লিঙ্গময় এই জড়ে প্রেম নাই। যে কিছু প্রেমের আভাস দেখা যায়, তাহা কেবল আত্মসম্বন্ধে অনুভূত হয়। শুদ্ধজীব চিন্ময়, অতএব আত্মা। আত্মারই আত্মা-প্রতি যে প্রেম, তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি। সেই প্রীতিই একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তু। বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে ও মানুষে প্রেম কেবল আত্মপ্রেমের বিকার মাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আদর্শ। শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন এই যে,—

"কৃষ্ণমেনবমবেহি ত্বমাত্মানং মখিলাত্মনাম্।"

অখিল আত্মার আত্মা সেই চতুঃষষ্টি মহাগুণ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। সকল জীবের কৃষ্ণপ্রতি যে প্রেম, তাহাই নিরুপাধিক ও চরম। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ও প্রীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিতেছেন। দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র, জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গল সৃজন করিয়াছেন। ভাইসকল! দাম্ভিক লোকদিগের বাগাড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া নিরুপাধিক প্রীতি-তত্ত্ব অনুভব করতঃ জীব-স্বভাবকে উজ্জ্বল করুন।

প্রীতিই চরম প্রয়োজন

বেদ বলিয়াছেন, (মুণ্ডক ৩।১৪),---

"প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবানেব ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।।"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদদিগের বরিষ্ঠ ব্যক্তি আত্মরতি ও আত্মক্রীড় হইয়া প্রেমের ক্রিয়াদ্বারা লক্ষিত হন; সেই রতিই প্রীতি।

"ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি"

(বৃঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬)

---এই বৃহদারণ্যক-বাক্যে প্রীতিই যে জীবের মুখ্য প্রয়োজন, তাহা জানিতে পারা যায়। এরূপ বেদ ও ভাগবতপুরাণ-প্রমাণ বহুতর আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ স্পষ্ট বলিয়াছেন (আঃ ৭ ম অনু)---

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।।"

আনন্দ প্রীতি-পর্যায়। সকল জীবই আনন্দের জন্য চেষ্টা করেন---মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মোক্ষকেই আনন্দ মনে করেন, এই জন্যই তাঁহারা 'মোক্ষ' 'মোক্ষ' করিয়া উন্মত্ত; বুভুক্ষু ব্যক্তিরা বিষয়ভোগকেই 'আনন্দ, বলেন। এই জন্যই তাঁহারা ভুক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত---আনন্দ-লাভের আশাই তাঁহাদিগকে সেই সেই কার্যে প্রবৃত্তি দেয়। ভক্তগণ কৃষ্ণসেবানন্দের জন্য চেষ্টাবান্, অতএব সর্বপ্রকার লোকেই প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন; এমন কি, প্রীতির জন্য দেহ-পরিত্যাগেও প্রস্তুত। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রীতিই সকলের মুখ্য প্রয়োজন---ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। নাস্তিকই হউন বা আস্তিকই হউন, কর্মবাদীই হউন বা জ্ঞানবাদীই হউন, কর্মীই হউন বা নিষ্কামই হউন---সকলেই একমাত্র প্রীতিকে অন্বেষণ করিতেছেন। অন্বেষণ করিলেই যে প্রীতিকে পাওয়া যায়, এমন নয়। কর্মবাদী স্বর্গলাভকে প্রীতিপ্রদ মনে করেন, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি" (গীঃ ৯।২১) এই ন্যায়ানুসারে যখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হন, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। মনুষ্যলোকে ধন, পুত্র, যশঃ ও বল লাভ করিয়াও তাহাতে প্রীতি না

পাইয়া স্বর্গসুখ কল্পনা করেন; স্বর্গচ্যুতিসময়ে তদুত্তর-লোক-সকলের সুখকে বহু সম্মান করিয়া থাকেন। যখন জানিতে পারেন যে, মর্ত্যলোকে, স্বর্গে বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুখ অস্থায়ী ও অনিত্য, তখন বিরাগ লাভ করিয়া ব্রহ্ম-নির্বাণকে অনুসন্ধান করেন, ব্রহ্ম নির্বৃত্তি লাভ করিয়া যখন আর সুখসম্ভোগ হয় না, তখন তটস্থ হইয়া পন্থান্তর অন্বেষণ করেন। নির্ভেদ ব্রহ্মনির্বাণে আনন্দ বা প্রীতি কিরূপে সম্ভব হয়? যখন আমিত্বের একেবারে লোপ হইল, তখন আনন্দের ভোক্তা কে? আবার যখন সমস্ত বস্তু এক হইয়া গেল, তখন আনন্দই বা কোথায়? আনন্দের অনুভবই বা কে করিবে? আমার আমিত্ব গেলে ব্রহ্মকেই বা কে অনুভব করিবে? ব্রহ্ম আনন্দ হইলেও ভোক্তার অভাবে নিরর্থক; তখন আনন্দ আছে কি না, এ বিষয়ের সিদ্ধান্তই বা কি? আমিত্বনাশের সহিত আমার সর্বনাশ; আমার আর তখন কি রহিল যে, আমার প্রয়োজন-লাভের অনুভব হইবে? আমি নাই ত' কিছুই নাই। যদি বল, ব্রহ্মরূপ আমি রহিলাম, তাহাও অকিঞ্চিৎকর, কেন না, ব্রহ্মরূপ আমি ত' নিত্য আছি, তাহার সাধন ও সিদ্ধি অকর্মণ্য ও অযুক্ত; অতএব ব্রহ্মনির্বাণটা প্রীতিসিদ্ধি নয়---জীবের পক্ষে একটা ভাণ মাত্র; সত্য হইলেও খ-পুষ্পের ন্যায় অনুভূত। ভক্তিতেই কেবল প্রয়োজন-সিদ্ধি দেখা যায়, ভক্তির চরম অবস্থাই প্রীতি; সেই প্রীতিই নিত্য। শুদ্ধকৃষ্ণও নিত্য, শুদ্ধপ্রীতিও নিত্য; অতএব অচিন্ত্যভেদাভেদ-অঙ্গীকারে প্রেমের নিত্যতাই সিদ্ধ হয়, নতুবা জীবের চরম প্রয়োজন যে প্রীতি, তাহাতে অনিত্যতা আসিয়া তাহার সত্তাকে নাশ করে, এতন্নিবন্ধন সর্বশাস্ত্রই অচিন্ত্যভেদাভেদ-রূপ সত্য-সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিতেছেন; আর সমস্ত বাদই মতবাদ।

রাগাত্মিকা ভক্তি

রাগাত্মিকা ভক্তি দুইপ্রকার---কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে (১।৩০-৩১) লিখিত আছে---

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ।।
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।।

ইহার তাৎপর্য কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহক্রমে ঈশ্বরে মনকে ভক্ত্যাবিষ্ট করিয়া তত্তদ্ভাবগত দোষ পরিত্যাগপূর্বক অনেকেই ভগবদগতি লাভ করিয়াছেন---কামদ্বারা গোপীসকল, ভয়দ্বারা কংস, দ্বেষ দ্বারা শিশুপালাদি নৃপগণ, সম্বন্ধ দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মাগণ, স্নেহদ্বারা তোমরা পাণ্ডবাদি এবং আমরা ঋষিগণ ভক্তিদ্বারা তদ্গতি লাভ করিয়াছি। কাম, ভয়, দ্বেষ, সম্বন্ধ, স্নেহ ও ভক্তি---এই ছয়টার মধ্যে আনুকূল্য-ভাবের বিপরীত হওয়ায় ভয় ও দ্বেষ অনুকরণ যোগ্য হয় না। স্নেহ একাংশে সখ্যভাবযুক্ত হওয়ায় বৈধভক্তির অনুবর্তী; অপরাংশে প্রেমভাবযুক্ত হওয়ায় সাধন পর্বে তাহার উপযোগিতা নাই; অতএব স্নেহ, রাগমার্গীয় সাধন ভক্তিতে স্থান পায় না। "ভক্ত্যা বয়ং" (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব ২য় ল-১৩৫) এই ভক্তি শব্দে বৈধী ভক্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ 'ভক্তি' শব্দে কোন স্থলে ঋষিগণের অবলম্বিত বৈধী ভক্তি, কোন স্থলে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি বুঝিতে হইবে। 'অনেকে তদগতি লাভ করিয়াছেন', এই বাক্যদ্বারা কিরণ ও অর্কস্থলীয় ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের একতানিবন্ধন জ্ঞানিভক্তগণ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন, কৃষ্ণশত্রুগণও ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় তন্মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্যাভাসপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসুখে মগ্ন থাকে---ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের মতে, মায়া-পারে সিদ্ধলোকে বাস করেন। সিদ্ধলোক দুই প্রকার-জ্ঞান সিদ্ধ লোক ব্রহ্মসুখে মগ্ন, হরি কর্তৃক বিনষ্ট অসুর সকলও সেই সিদ্ধলোকে বাস করে। জ্ঞানসিদ্ধের মধ্যে কেহ কেহ রাগবন্ধক্রমে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করিয়া তাঁহার প্রিয়জনরূপে প্রেম লাভ করেন। কিরণ ও সূর্য যে রূপ একই বস্তু, সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ ব্রহ্ম ও কৃষ্ণে বস্তুতঃ ভেদ নাই। 'তদগতি'---শব্দে কৃষ্ণগতি। সাযুজ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানী ও কৃষ্ণহস্তে নিহত অসুরগণ

সেই বস্তুর কিরণরূপ ব্রহ্মকে লাভ করে, প্রেমপ্রাপ্ত ভক্তগণ সেই বস্তুর মূলসূর্যরূপ কৃষ্ণের পরিচর্যা লাভ করেন। ভয়, দ্বেষ, স্নেহ ও ভক্তি---এই চারিটীকে পৃথক করিয়া দিলে কাম ও সম্বন্ধ অবশিষ্ট থাকে, অতএব রাগমার্গে কাম ও সম্বন্ধ--- এই দুইটী পৃথক্‌রূপে বলবান। রাগময়ী ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা।

'কাম'-শব্দে সম্ভোগতৃষ্ণাকে বুঝায়; কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি স্বরূপে সম্ভোগতৃষ্ণার স্বরূপে পরিণত হইয়া অহৈতুকী প্রীতির স্বভাবে নীত হয় অর্থাৎ সম্ভোগপ্রীতি কৃষ্ণআজ্ঞামরী হয় কৃষ্ণের সুখসমৃদ্ধির জন্য সমস্ত চেষ্টার উদয় হয়---নিজ সুখ চেষ্টা রহিত হয়; তবে যদি নিজ সুখ চেষ্টা থাকে, তাহাও কৃষ্ণসুখ-সমৃদ্ধির জন্যই স্বীকৃত হয়। এই অপূর্ব প্রেম ব্রজদেবীগণেই সুপ্রসিদ্ধরূপে বিরাজমান; ব্রজগোপীদের এই প্রেম বিশেষ কোন একটি আশ্চর্য মাধুরী লাভ করিয়া, সেই সেই ক্রীড়াকে উৎপন্ন করে, তৎপ্রযুক্ত সেই প্রেম বিশেষতত্ত্বকে পণ্ডিতগণ 'কাম' বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রজগোপীদিগের কাম অপ্রাকৃত ও দোষগন্ধরহিত, বদ্ধজীবের কাম সদোষ ও তুচ্ছ। এই ব্রজগোপীদিগের কাম দর্শন করিয়া ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদি তাহা পাইবার জন্য বাঞ্ছা করেন, ব্রজ-গোপীদিগের কামের অন্য তুলনার স্থল নাই---সেই কামই নিজ তুলনাস্থল। সেই কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজব্যতীত অন্য কোন স্থলে নাই; মথুরায় কুব্জার যে কাম দেখা যায়, তাহা কামপ্রায় রতিমাত্র---যে কামের উল্লেখ করা হইল, সে কাম নয়।

শ্রীকৃষ্ণের পিতৃত্বাদি অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপা রাগময়ী ভক্তি---'আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের মাতা' ইত্যাদি অভিমান হইতে সম্বন্ধরূপা ভক্তি। বৃষ্ণি বংশে মাতা-পিতার এইরূপ ভাব; উপলক্ষণে ব্রজে যশোদাদিরও সম্বন্ধরূপা ভক্তি। যাহা হউক, কাম ও সম্বন্ধভাবে শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ পাওয়া যায়, অতএব তাহা নিত্যসিদ্ধগণের আশ্রয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রণালী জানিতে হইলে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হই। মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখেন নাই। শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক ব্যতীত আর তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। দুই একটী আরও শ্লোক পদ্যাবলী-গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সকল শ্লোকে আমরা কোন আনুপূর্বিক উপদেশ পাই না। এতদ্ব্যতীত আর এক আধখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ কেহ কেহ প্রভুর রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা অনেক বিচার করিয়া স্থির করিয়াছি যে, ঐসকল গ্রন্থ আরোপিত বলিয়া মনে হয়। গোস্বামিমহোদয়গণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচুররূপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ রচনা বলিয়া তন্মধ্যে কিছুই লেখা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত---প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে প্রভুর চরিত্র ও উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত উপদেশ গোস্বামি-মহোদয়দিগের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শ্রীচরিতামৃতের এত অধিক আদর সর্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরেই উদিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই কবিরাজ গোস্বামিকে চরিতামৃতরচনে সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে শ্রীকবিকর্ণপূর "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক" এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যভাগবত" লিপিবদ্ধ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। সকল দিক্ বিচারপূর্বক আমরা চরিতামৃতকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীমহাপ্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থধর্মে ছিলেন, তৎকালেও শ্রীবাসঅঙ্গনে, গঙ্গাতীরে, চতুষ্পাঠীতে এবং পথে পথে জীবসকলকে হরিনাম-মাহাত্ম্য ও হরিকীর্তনের কর্তব্যতা প্রচার করিয়াছিলেন, পরে সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে, বিদ্যানগরে শ্রীরায় রামানন্দকে, দক্ষিণদেশে বেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতিকে প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে এবং ভঙ্গীক্রমে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়কে ও বল্লভ ভট্ট মহোদয়কে, বারাণসীতে শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপ্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে যে সকল উপদেশ

দিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীমহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষা যথাযথ লাভ করা যায়। ঐ সমস্ত শিক্ষা বিচারপূর্বক আমরা প্রভুর শিক্ষাপ্রণালী সংগ্রহ করিয়াছি।

জগজ্জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশপূর্বক শ্রীমহাপ্রভু সমস্ত ভারতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম বা জৈবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন দেশে স্বয়ং গিয়া প্রচার কার্য করেন। কোন কোন দেশে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ কার্য সম্পন্ন করেন। প্রচারকগণকে অসীম শক্তিসঞ্চারপূর্বক দেশে দেশে পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য করিতেন। তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধচরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্যই অন্যান্য ধর্মে আজকাল বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ যথেষ্ট ফল হয় না। যথা, চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন; —

"এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য।।
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ।।
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাল গৌড়দেশে।
তিহোঁ ভক্তি প্রচারিলা অশেষ বিশেষে।।
আপনে দক্ষিণদেশে করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ।।
সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।।"

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-মূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম। সেই ধর্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম গুপ্ত প্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসারদুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্যঘটনাক্রমে জীব যদি "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস"—এই কথাটি স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই করিবে।

এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। বিশ্বাস দুই প্রকারে উদিত হয় অর্থাৎ কোন কোন লোকের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে বহুজন্মের সুকৃতিক্রমে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উদয় হয়। যথা চরিতামৃতে মধ্যে ২৩শ অধ্যায় ৯ সংখ্যা,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।।

শ্রদ্ধার অন্য নাম বিশ্বাস, চরিতামৃত মধ্য ২২শ ৬২ সংখ্যা---

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়।।"

কৃষ্ণভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কর্ম কৃত হইল, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়ের নাম শ্রদ্ধা। সুকৃতিজনিত আত্মপ্রসন্নতাক্রমে আত্মার নিত্য ধর্ম হইতে স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার উদয় হয়। উদিত--শ্রদ্ধ পুরুষ উপযুক্ত সাধুসঙ্গে ভজনপ্রণালী অবলম্বনপূর্বক স্বীয় অনর্থ বিনাশ করিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ও ভাব পর্যন্ত উন্নতি লাভ করেন।

স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা প্রবলরূপে উদিত হইলে স্বয়ং রাগমার্গে বিচরণ করে। আর শাস্ত্রযুক্তি বিধি ইত্যাদি অপেক্ষা না করিয়াই কৃষ্ণরতিরূপ ভাবপথে নির্ভয়ে আত্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ উদিতশ্রদ্ধা যদি কোমল অবস্থায় থাকে, তখন সদ্‌গুরুর নিকট বিচার সাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস লক্ষণই যখন শ্রদ্ধার পরিচয়, তখন সাধারণতঃ শাস্ত্রবিচার নিতান্ত প্রয়োজন।

যথা---প্রভুবাক্যে চরিতামৃতে আদি সপ্তমে; ---

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিল শাসন।।
মুর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ নাম জপ সদা এই মন্ত্রসার।।
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব মন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম।।
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে।।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন।।
ধৈর্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাঁসি কাঁদি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত।।
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার।।
পাগল হইলাঙ্ আমি ধৈর্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে।।
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।।
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন।।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।।
কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম-পুরুষার্থ।

এই প্রভু-বাক্যে আমরা একটি কথা গ্রহণ করি। ''কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করহ বিচারে''--এই কথায় জানা গেল যে, শাস্ত্রবিচারদ্বারা শ্রদ্ধা পুষ্ট হইয়া উন্নতিলাভ করে। প্রভুর মতে শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। যথা সন্ন্যাসিশিক্ষায় আদি সপ্তমে ১৩২ সংখ্যায়; ---

''স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণশিরোমণি।''

পুনরায় মধ্য বিংশ অধ্যায়ে ১২২শ সংখ্যায় সনাতন গোস্বামিশিক্ষায়; ---

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ।।"

স্পষ্ট বোধ হয় যে, শ্রদ্ধা দুই প্রকার অর্থাৎ---কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। দৃঢ় শ্রদ্ধা হইতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবতী ও স্বভাবতঃ ভাবরূপা। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ সম্পূর্ণরূপে শ্রীশিক্ষাষ্টকে আছে। কোমলশ্রদ্ধা-সম্বন্ধে প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩ শ অধ্যায় ৯-১৩); —

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়।।
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্বানর্থনিবর্তন'।।
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়।।
রুচি হৈতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর।।
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্বানন্দধাম।।"

দৃঢ়শ্রদ্ধায় শাস্ত্রযুক্তির কার্য নাই। কোমলশ্রদ্ধদিগের শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত গতি নাই। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে দীক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর নিকট শাস্ত্র সিদ্ধান্ত লাভ, মন্ত্রগ্রহণ ও গুরূপদিষ্ট মতে অর্চনাদি, সাধন করিতে করিতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতি হয়। ইঁহাদের জন্য দশমূলশিক্ষা। প্রমাণ একটী মূল ও প্রমেয় অর্থাৎ যে বিষয়গুলি প্রমাণিত হইবে, তাহা নয় প্রকার।

দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসজনিত হরিনামমাত্র সাধনে সকল প্রমেয়গুলি নামের কৃপায় আপনা হইতে উদিত হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষদিগের প্রমাণ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

সুতরাং কোমলশ্রদ্ধ পুরুষগণের সম্বন্ধে প্রমাণ অবলম্বন ব্যতীত তাঁহারা দুষ্ট সঙ্গে সত্বরই স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মবিস্তারস্বরূপ বেদই তাঁহাদের একমাত্র

প্রমাণ। বেদ বিপুল এবং কর্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারীদের জন্য অনেক ব্যবস্থা বেদে থাকায় শুদ্ধভক্তদিগের প্রতি উপদেশ সহজে সংগৃহীত হয় না। বেদের মূল তাৎপর্য স্থানে স্থানে বেদ শাস্ত্রে অভিধেয়রূপে বর্ণিত আছে, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিবার জন্য সাত্ত্বিক পুরাণসকলে প্রদত্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিকপুরাণগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বেদের সাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বিশারদ। সুতরাং ভাগবত শাস্ত্র এবং তদনুগত পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রও প্রমাণ মধ্যে গণিত।

সনাতন শিক্ষায় প্রভু কহিলেন, (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৫)---

"বেদ শাস্ত্র কহে 'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়' 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য--'সম্বন্ধ' 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন।।
অভিধেয় নাম--'ভক্তি' 'প্রেম'--প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।।"

সম্বন্ধ। চিৎ (জীব), অচিৎ ও ঈশ্বর---এই তিনটী বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ তাহাই সম্বন্ধ-শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তুর দুই শক্তি; অচিৎ ও জীব। অচিচ্ছক্তির পরিণামে অচিৎ জগৎ এবং জীবশক্তির পরিণামে জৈবজগৎ। সম্বন্ধ বিচার করিলে জীবের কৃষ্ণদাস্য পুনঃপ্রাপ্তির নাম--সম্বন্ধ-স্থাপন।

যথা সার্বভৌম শিক্ষায়,---

"স্বরূপ-ঐশ্বর্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ।।"

পুনঃ চরিতামৃত (মধ্য) ২০।১২৪ সনাতন-শিক্ষায়,---

"কৃষ্ণ প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি প্রাপ্যের সাধন।"

এই সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে সাতটী বিষয় প্রমেয়স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ ১। কৃষ্ণবিচার, ২। কৃষ্ণশক্তি বিচার, ৩। রসতত্ত্ববিচার, ৪। জীবতত্ত্ববিচার, ৫। জীবের সংসারবিচার, ৬। জীবের নিস্তারবিচার এবং ৭। অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার। এই সাতটী প্রমেয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞান লব্ধ হয়।

অভিধেয়। শব্দসকল বিন্যস্ত হইয়া একটী রচনা হয়। সহজ শব্দার্থ যে শক্তিদ্বারা বোধ হয়, তাহার নাম--শব্দের অভিধা শক্তি। 'দশটী' হাতী বলিলে

সহজে দশসংখ্যক হাতীকে অনুভব করা যায়। এই সহজ অর্থকে অভিধেয় বলা যায়। 'লক্ষণা'-নামক শব্দের আর একটী শক্তি আছে, যেমত ‘‘গঙ্গায় ঘোষ পল্লী’’। জলে ঘোষ পল্লী হয় না বলিয়া লক্ষণা-শক্তি দ্বারা জলের ধারে ঘোষপল্লী বুঝা যায়। যে স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন, সেখানে অভিধাশক্তির কার্য চলে না। সহজে স্বাভাবিক অর্থ হয়, এরূপ স্থলে কেবল অভিধাই কার্য করে।

বেদশাস্ত্রে অভিধা দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রাহ্য, বেদশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ---বেদ শাস্ত্রের অভিধেয়। তাহাই আমাদের জানা কর্তব্য। সর্ব বেদ বিচার করিলে দেখা যায় যে; ভগবদ্ভক্তিই বেদ শাস্ত্রের অভিধেয়। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অভিধেয়ের অবান্তর সম্বন্ধ, মুখ্যসম্বন্ধ নয়। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তির যে মুখ্য উপায় ঐ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সাধনভক্তি। এই একটী প্রমেয়।

প্রয়োজন। যাহার উদ্দেশ্যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই প্রয়োজন। জীবের প্রেমসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন একটী প্রমেয়। একত্রে নয়টী প্রমেয় উপস্থিত হইল। অতএব সনাতন শিক্ষায়; ---

‘‘এই ত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে-কৃষ্ণ এক সার।।
এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন।।

এই প্রণালীতে মহাপ্রভু জৈবধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন।